C. M. Mason প্রণীত

HOME EDUCATION-এর বঙ্গানুবাদ

Translated by

B. R. SEN, I. C. S.

REVISED BY

Prof. J. K. CHAUDHURY

B.A. (Oxon), M.A., B.L. (Cal).

THE ORIENTAL BUSINESS SYNDICATE

Municipal Market, Sylhet.

প্রকাশকের নিবেদন

Charlotte M. Mason প্রণীত Home Education (গৃহ-শিক্ষা) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। এই লেখিকা শিক্ষা-বিষয়ক ছয়খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; সেইগুলি 'গৃহ-শিক্ষা গ্রন্থমালা' ('Home Education' Series) নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম গ্রন্থই 'গৃহ-শিক্ষা'; দ্বিতীয় গ্রন্থ— 'পিতামাতা ও শিশু' (Parents and Children).

'গৃহ-শিক্ষা' গ্রন্থে লেখিকা আট-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগকে কি করিয়া বাড়ীতেই শিক্ষা-দান করিতে হইবে, সেই শিক্ষার মূল ভিত্তি কি হইবে, এবং কিভাবে সেই শিক্ষার ভিতর দিয়া শিশুকে আত্ম-বিশ্বাসী, স্বাবলম্বী, ব্যক্তিত্বশালী ও দৃঢ়-চরিত্র করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে— তাহারই অতি পরিষ্কার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব আসাম-লাট-পত্নী লেডি রীড্ এই পুস্তকদ্বয়ের কার্য্য-কারিতা নিজ সন্তানপালনে অনুভব করিয়া বাঙ্গালী পিতামাতা ও শিক্ষকদের উপকারার্থে ইহাদের বঙ্গানুবাদ করাইতে উৎসুক হন। তিনি বহুদিনই বঙ্গদেশে ছিলেন। সেখানে, মেদিনীপুরের তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস্. মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত করেন। মিঃ সেন অনুবাদ করিয়া দিলে পর, আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, (লণ্ডন) মহাশয় এই পুস্তকদ্বয় প্রকাশ করিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়া অবশেষে মাননীয়া লেডি রীড্-এর প্রচেষ্টা সার্থক করেন। বাস্তবিক,

মিঃ রায়ের উৎসাহ ও উদ্যোগ পশ্চাতে না থাকিলে এই বই সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইত কি না সন্দেহ।

লাট-পত্নী তাঁহার ভূমিকায় (Foreword) মিঃ সেন ও মিঃ রায় এর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ; তদুপরি, রায়-সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ও তাহার পরিবারের লোকেরা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া, এবং শ্রীযুক্ত প্রমোদা বানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার (শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ) অনুবাদের বাদ-বাকী পূরণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের সকলকেও ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। এই ভূমিকাও নিম্নে মুদ্রিত হইল। সর্ব্বশেষ, মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, বি. এ. (অক্সন্), এম্. এ., বি. এল্., মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীহট্ট
১লা জানুয়ারী, ১৯৪৩।

শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ওরিয়েণ্ট্যাল্ বিজনেস্ সিণ্ডিকেট্।

FOREWORD.

It has been my dream for a very long time to have "Home Education" and "Parents and Children" by Miss Mason translated into the vernacular for the benefit of Indian mothers and fathers. These books made all the difference to me with my young family, for how often do the storms of childhood arise and we look helplessly for the reason? In these books we are led to a realisation of the personality of the child and with infinite wisdom we are shown how to bring up the child in a way of life which will enable him to develop his individuality, his character and initiative, and help him over inherent weaknesses by the forming of such good habits as are in direct opposition to these weaknesses.

It was a very kindly offer by an exceedingly busy Indian friend, Mr. B. R. Sen, I. C. S., then District Magistrate of Midnapore, which is known to be one of the heaviest charges in Bengal, which led to the translation by him of the first one and then the other book into Bengali. For this wonderful act of kindness I offer him not only my own warmest thanks but, in anticipation, those of all the school teachers and the mothers and fathers who by reading these books in their own language will be led into the great delight which comes from the companionship and confidence of the child who is understood, and who

develops steadily the three great attributes of self-esteem, self-help and self-reliance. Who can doubt the value of future citizens brought up on these lines ?

Besides our debt of gratitude to Mr. Sen we owe our thanks to others who have helped in the final translations of these books :— Rai Sahib Dwijendra Nath Sen, who with the members of his family made copies of both of the mss , Babu Promoda Banerjee, Babu Monomohan Majumdar, Superintendent, Normal School, Silchar, who filled up the omissions in the original translation ; but, above all, to Mr. S. C. Roy, Director of Public Instruction in Assam, for it is he who has made my dreams come true.

India will have need of children who will have been brought up to live for all men, and this more than ever in the years to come when her destinies will lie in her own hands. If the wisdom in these books can be absorbed by those who are guiding the young, the dawn of India's freedom may well be the glorious dawn of a splendid day. In that hope I and those who have laboured for this end send forth these translations on their way with our deep acknowledgements to the late authoress and our grateful thanks to the trustees for their generous permission to translate and publish these books.

Amy. H. Reid.

গৃহ-শিক্ষা

প্রথম ভাগ

প্রাথমিক বিচার্য্য বিষয়

মেয়েরা এখন শিক্ষিতা হইতেছেন। শিক্ষার ফলে কৃষ্টি ও মনের দিক্ দিয়া তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছে। সেই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের 'কাজ করিবার' ইচ্ছার মধ্যে। তাঁহারা এখন অলস জীবনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মময় জীবন চাহেন। পৃথিবীতে ইঁহাদের কাজের প্রয়োজন আছে। আর কিছুদিন পরে, শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেখা যাইবে, যাঁহাদের কাজ করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা সকলেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন—নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কাজ করিতেছেন; আর, অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকিলে, লোকহিতকর কাজ করিবার যে গৌরব ও আনন্দ, তাহাকেই চরম পুরস্কার মনে করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন।

শিশু সমাজের সম্পত্তি—

সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ— শিশুদের পালন ও শিক্ষা। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সত্য; কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় শিক্ষার স্থান—গৃহ। গৃহের প্রভাব শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন ও চরিত্র গঠনকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্য কিছুতেই তাহা সম্ভব হয় না। সন্তানের পিতা

বা মাতা হওয়াই একটা মস্ত সৌভাগ্য। ইহার সহিত সংসারের কোন পদোন্নতি বা মানসম্ভ্রমের তুলনা হয় না। একটিমাত্র সন্তানের পিতামাতাও এমন এক বস্তুর অধিকারী যাহা হয়ত একদিন সমগ্র জগতে বিধাতার বিশেষ দান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যিনি এমন সম্পদের অধিকারী তাঁহার দায়িত্বও যথেষ্ট। 'আমার ছেলে আমারই নিজের, তাহাকে লইয়া আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি'—এমন কথা বলার অধিকার তাঁহার নাই। বস্তুতঃ, সন্তান পিতামাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। তাহারা সমস্ত সমাজের সম্পদ্ হিসাবেই পিতামাতার উপর ন্যস্ত। পিতামাতার দায়িত্ব—তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার, যাহাতে তাহারা জগতের কাজে আসে। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়ের উপরই এই দায়িত্ব থাকিলেও, দায়িত্বের ভাগ দুই জনের সমান নহে। পিতার অপেক্ষা মাতারই দায়িত্ব বেশী। জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে সন্তানের জননীর উপর। ইহার কারণ, শিশুর প্রথম বয়সে যখন তাহার মন খুব কোমল থাকে, তখন একমাত্র জননীর হাতেই তাহার চরিত্র গঠনের ভার থাকে। এই জন্যই জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহাদের মায়েরা আদর্শ জননী ছিলেন বলিয়া প্রায়ই শোনা যায়। সন্তানদের তাঁহারা নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; সন্তান-পালনের এই গুরুতর দায়িত্ব তাঁহারা যার-তার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই।

শিশুর দাবী—মাতার বিচারশীল স্নেহ—

পেস্তালৎসি বলেন, "শিশুর জীবনবিকাশে প্রধান সহায়ক হওয়ার যোগ্যতা মায়েরই সবচেয়ে বেশী; স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাহাকে এই যোগ্যতা দিয়াছেন। সেই জন্য মায়ের দিক্ হইতে চাই বিচারশীল ভালবাসা, অন্ধ স্নেহ নয়। মানুষের শরীরের, মানুষের প্রকৃতির, সকল ক্ষমতাই শিশুকে

ঈশ্বর দিয়াছেন। কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি স্থির করিয়া দেন নাই; সে প্রশ্নটি হইতেছে— শিশুর এই হৃদয়, এই মস্তিষ্ক, এই হাত-পা কাহার এবং কি-প্রকারের কাজে নিযুক্ত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শিশুর ভবিষ্যতের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। এই প্রশ্নের উত্তর মা'কেই স্থির করিতে হইবে, কারণ মায়ের স্নেহ শিশুকে যাহা শিখাইতে পারিবে, তেমন শিক্ষা সে আর কোথাও পাইবে না।

আজকাল আমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। মায়েরা যতই শিক্ষিত ও কর্ম্মদক্ষ হইবেন, ততই তাহারা বুঝিবেন যে ছ'বছর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের শিক্ষা অন্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না, সে শিক্ষার ভার তাঁহাদিগকে নিজের হাতেই লইতে হইবে। তখন এই শিক্ষা-দেওয়ার ব্যাপারটি তাঁহাদের বৃত্তির মতই হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ, মানুষ নিজ নিজ ব্যবসায়ে কৃতিত্বের জন্য যেরূপ অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্ত্তিতা দেখাইতে বাধ্য হয়, জননীরাও ঠিক সেইরূপ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে দেখাইবেন।

শিশুশিক্ষার ভার হাতে নিয়া মা'কে ঠিক কি কি করিতে হইবে জানিতে হইলে, এবং নিজেকে সেই কাজের উপযোগী করিতে হইলে, জননীকেও শিক্ষার মূলতত্ত্বগুলি বিশেষভাবে জানিতে হইবে। শুধু লোকের মুখে শুনিয়া এ কাজ করা চলে না। শিশুর প্রকৃতি ও মনের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষার যে ধারা ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ভালরূপ না জানিয়া সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব লওয়া যায় না।

শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটি-পূর্ণ—

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, "শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে ভীষণ ত্রুটি রহিয়া

গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে যে জ্ঞান থাকা আবশুক, সেই জ্ঞান পিতামাতার নাই। শিশুদের শিক্ষা জগতে অন্যতম কঠিন সমস্যা; সেই সমস্যা সমাধানের ভার দেওয়া হয় এমন লোকের উপর যাহারা এই সমাধান খুঁজিবার চিন্তায় এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করেন নাই। জুতা শেলাই করিতে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, জাহাজ বা রেলগাড়ী চালাইতে হইলে মানুষকে বহুদিন ধরিয়া শিক্ষানবিশী করিতে হয়। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, তাহার দেহ ও মনের সমস্তগুলি বৃত্তিকে উন্মেষিত করিয়া তোলা। সেটা কি জুতা শেলাই বা ঘর তৈরীর চেয়েও এতই সহজ বস্তু যে, যে-খুশি ইহার ভার লইতে পারে বা তত্বাবধান করিতে পারে—এঁর জন্য কোন প্রকার শিক্ষা, কোন প্রকার দক্ষতা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয় না? তাহা ত নয়। শিক্ষা দেওয়া শক্ত কাজ, পৃথিবীতে যত কাজ আছে তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল কাজ। ইহার ভার লওয়ার অর্থ অত্যন্ত কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এই কাজ যাহারা করিবে তাহাদেরে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না রাখা কি নিছক্ বাতুলতা নয়? এই শিক্ষা মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন, ইহা ছাড়া চলিবে না। সময়ে বা সুযোগে যদি না কুলায়, বরং অন্যদিকে গুণ অর্জ্জনের মাত্রা কমাও, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবু এই শিক্ষা দিতে এবং পাইতে কার্পণ্য করিও না। ....শিশুকে যিনি ঠিকমত পালন করিতে চান, শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্বের মোটামুটি খানিকটা না জানিলে তাঁহার চলিবে না। ......শিশুর দেহ ও মনের বৃদ্ধি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়াই হইয়া থাকে। পিতামাতা যদি এই নিয়ম কিছুই না জানেন এবং না মানিয়া চলেন তাহা হইলে শিশুকে বাঁচাইয়া রাখাই সম্ভব হয় না। এই নিয়মগুলি যতই ঠিক ঠিক ভাবে পালিত হইবে ততই শিশু সুস্থ ও সবল হইয়া বাড়িয়া উঠিবে, অন্যথা হইলে তাহার শারীরিক ও

মানসিক দুর্ব্বলতা ও বিকলতা জন্মিবে। শিশুর বৃদ্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে—শিশু একেবারে পূর্ণ পরিণতি ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে তখনই, যখন পিতামাতা সমগ্রভাবে এই সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলেন। এই কথা-গুলি অতি সত্য, ইহাতে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন, একদিন যাঁহারা সন্তানের মাতা ও পিতা হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটু যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও শিখিয়া নেওয়া উচিত কিনা, এই নিয়মগুলি কি।"

সাধারণত পিতামাতারা কিভাবে চলেন—

পিতা ও মাতা স্বভাবতই ধরিয়া নেন যে শিশুর দেহ ও মন একেবারে শাদা কাগজের মত পরিষ্কার, সেখানে যাহা কিছু লিখিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। সেই কাগজে কি লিখিবেন সে সম্বন্ধে বড় বড় কল্পনা তাঁহাদের মাথায় তখন ঘুরিতে থাকে। কিছুদিন যায়, ক্রমে শিশুর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে; সে নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভা খাটাইয়া এটা-ওটা করিতে শেখে। শিশুর ব্যক্তিত্বের এই প্রথম প্রকাশ, ইহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পিতামাতাকে পুলকিত করে, বিস্মিত করে। বাবাকে দেখিয়া খোকা উল্লাসে চেঁচাইয়া উঠে, মায়ের মুখ ভার দেখিলে তাহারও মুখের হাসি মিলাইয়া যায়—এই দৃশ্য সকলের কাছেই এবং সকল সময়েই বিস্ময়কর। কিন্তু এই বিস্ময় ক্রমে পুরাণো হইয়া আসে। শিশু যখন আর একটু বড় হইল, তখন লোককে ভালবাসিয়া, বস্তু-বিশেষের উপর লোভ প্রকাশ করিয়া, ছোটখাট কাজ করিয়া, বই পড়িতে শিখিয়া বা খেলাধুলা শিখিয়া প্রমাণিত করিল যে পিতামাতার মতই সেও একজন পুরাপুরি মানুষ। পিতামাতার চক্ষে ততদিনে সে পুরাণো হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আর তাহার মধ্যে অপরূপ বিস্ময় খুঁজিয়া পান

না। তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল শিশুর গঠনের 'সমস্তখানি' তাঁহারা নিজের হাতে করিবেন ; এই সঙ্কল্প ক্রমে ভাসিয়া যায়। শিশু যেমনি দেখাইল যে তাহার চলিবার বা কাজ করিবার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে, পিতামাতা তেমনি আর তাহাকে টানিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করেন না। তাহার নিজের ধরণেই চলিতে উৎসাহ দেন। ফুলের মত একটি একটি করিয়া পাঁপ্‌ড়ি মেলিয়া সন্তানের প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, এই উন্মীলনকে চাহিয়া দেখার চেয়ে বড় আনন্দ পিতামাতার আর নাই। নাই সত্য, কিন্তু ইহা দেখিতে গিয়াই তাঁহারা প্রায় অজ্ঞাতসারেই আর একটি কাজও করিয়া বসেন— সন্তানের প্রকৃতি গঠনের ব্যাপার হইতে নিজেদের হাত গুটাইয়া আনেন। শিশু যতই স্বাবলম্বী হয়, নিজের কাজটুকু নিজে করিয়া লইতে শেখে, পিতামাতার ততই মনে হয় তাঁহাদের করিবার আর কিছু নাই। তাঁহারা তখন শুধু শিশুকে তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাইয়াই নিশ্চিন্ত হন— শরীরের খাদ্য ডালভাত এবং মনের খাদ্য ভালবাসা ও চিন্তা-করিবার বস্তু যোগাইয়া দিয়া তাঁহারা সরিয়া দাঁড়ান। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে, পিতামাতাকে সেই খাদ্য শুধু তাহার কাছে পৌঁছাইয়াই দিতে হয় ; কিভাবে তাহা খাইয়া হজম করিতে হইবে সে কথা শিশু নিজেই বেশ ভাল করিয়া জানে। পিতামাতার তখন বড় চিন্তা থাকে, যে খাদ্য শিশুর সম্মুখে তাঁহারা ধরিয়া দিতেছেন— সেটা ভাতডালই হউক, আর ছবি, পড়ার বই, খেলার সাথী, মায়ের স্নেহ, যাহাই হউক— সেটা যেন খাঁটি এবং সত্যই পুষ্টিকর বস্তু হয়। এইটার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সারা হইল। বেশীর ভাগ পিতামাতাই শিশুর শিক্ষা বলিতে এই রকমের একটা কিছু বোঝেন। সমাজ ও পরিবারের চালচলন-প্রথা-

অনুযায়ী খাদ্য, স্নেহ ও রুচি সন্তানকে দান করিয়া তাঁহারা তাহার পাশ হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে চান। সন্তানের উপর তাঁহারা অকারণে হস্তক্ষেপ করেন না, তাহাদের স্বাধীনতা দিয়া দেন, যেন তাহার মধ্যে যে মানুষের সহজাত প্রকৃতি আছে, তাহা আপনার পথে আপনি সম্পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। সেই বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিবে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও বংশের ধারা, জোর করিয়া সেখানে কোন মনগড়া নীতি না খাটানোই ভাল, এই কথা মনে করিয়া পিতামাতা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন।

একদিক্ হইতে বলা যায়, এই রকম নিষ্ক্রিয়তা খুবই ভাল জিনিষ; শিশুর পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল জিনিষ আর হইতে পারে না। তাহার নিজের প্রকৃতি অনুসারে সে বাড়িয়া উঠুক, পিতামাতা সেইভাবে বাড়িতেই তাহাকে উৎসাহ দিবেন, সাহায্য করিবেন, এটা খুব ভাল কথা। এই ভাবে তাহাকে বাড়িবার স্বাধীনতা দিলে তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং প্রচুর ইষ্টই হইবার সম্ভাবনা। তবে একটি কথা আছে, ছাড়িয়া দিলে তাহাকে ছাড়িয়াই দিতে হইবে, পিতামাতার যখন-তখন মাঝখান হইতে আসিয়া তাহাকে বিগ্‌ড়াইয়া তুলিলে চলিবে না।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। 'ছেলেকে নিজের ভাবে গড়িয়া উঠিতে দাও' এই কথাটায় পিতামাতার কর্ত্তব্যের খানিকটা ইঙ্গিত থাকিলেও সেই কর্ত্তব্যের গুরুতর একটা দিক্ ইহাতে দেখানো হইল না। একজন চরম উৎকর্ষযুক্ত পরিপূর্ণ মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার মধ্যে সমাজশৃঙ্খলার অনেকখানি বোধ জন্মাইয়া দিতে হয়; সেইজন্য যথেষ্ট কঠোর ও অনলস পরিশ্রমের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের কথা 'ছেলেকে নিজের উপর ছাড়িয়া দাও' এই নীতি বাক্যের মধ্যে মিলে না। শিশুকে একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াও সেইজন্যই চলে না।

শিশুর সম্বন্ধে যা-কিছু প্রয়োজন তার কিছুই তুচ্ছ নয়। তাহার যে-সকল কথা ও আচরণ হঠাৎ দেখিলে বোকামি বলিয়া মনে হয়, লক্ষ্য করিতে জানিলে তাহার মধ্যেও প্রচুর অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। অতি বৃহৎকে সত্যই জানিতে হইলে তাহার সন্ধান করিতে হইবে অতি ক্ষুদ্রের মধ্যে। ভবিষ্যতে শিশু কোন্ বিরাট্ কাজের যোগ্য হইবে, তাহার শিক্ষাকে ঠিক কোন্ পথে চালাইয়া নেওয়া দরকার, সেই সুদূর সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার শিশুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের ও কাজের মধ্যে। সেই ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে, বুঝিতে শিখিতে হইবে।

আমাদের এক পুরুষ আগে মানব জাতির একজন অতি প্রবীণ জ্ঞান-গুরু জন্মিয়াছিলেন ;— একটা কথা তিনি অক্লান্ত ভাবে কেবলই বলিতেন— "জাতির মূল হইল পরিবার।" পরিবারের সমষ্টিতেই জাতি গড়িয়া উঠে, ব্যক্তির সমষ্টিতে নয়। এই কথাটার মধ্যে অনেকখানি শিখিবার বস্তু আছে ; ভিতরের গূঢ় অর্থ ছাড়িয়া দিলেও, বাহির হইতেই যাহা চোখে পড়ে, সে কথাটি ভুলিলে চলিবে না। একটি অংশের বা একটি অঙ্গের তুলনায় সম্পূর্ণ দেহটা বৃহত্তর বস্তু ; সম্পূর্ণ দেহের মধ্যেই অংশের স্থান, তাহার অধীনেই ইহার স্থিতি, তাহার ইচ্ছাতেই ইহার গতি। কিন্তু তাই যদি হয়, শিশুওত সমগ্র জাতির অংশ মাত্র, জাতির সম্পত্তি। সে যে-ভাবে বড় হইলে জাতির পক্ষে লাভ সেইভাবেই তাহাকে বড় হইতে হইবে ; তাহার পিতা বা মাতা যিনিই হউন, তাঁহার ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। অন্যায় যে করে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই যেমন আইনের ব্যবস্থা আছে, ভাল কাজ যে করে তাহাকে পুরস্কার দিবারও তেমনি ব্যবস্থা আছে। পিতামাতা নিজের উৎসাহেই সন্তানকে ভালপথে চালান, মানুষ করিয়া গড়েন ; তাঁহাদের সেই শুভবুদ্ধি আছে বলিয়াই দেশের

আইন শিশু-পালনের ব্যাপারে তাঁহাদের অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়াছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে চলিবে না। আইন তাহা সহ্য করিবে না। একথা মনে রাখিতে হইবে যে শিশুরা জাতির সম্পত্তি। শিশুদের পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব জাতির সকলের উপরে—যাঁহারা নিজেরা অবিবাহিত বা নিঃসন্তান, শিশুপালনে যাঁহাদের কাজ শুধু দূর হইতে চাহিয়া দেখা, তাঁহারাও সম্পূর্ণভাবে এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত নহেন।

১। শিক্ষার পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতি—

শিক্ষার পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত এই সমস্যা লইয়া পিতামাতার নিজেদেরই মাথা ঘামাইতে হইবে। ইহার প্রয়োজন আগেও ছিল, এখন সেই প্রয়োজন আরো তীব্র হইয়াছে। এতকাল শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটা প্রধানত ছাড়িয়া দেওয়া হইত গতানুগতিক ধারার উপরে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া গড়া কতগুলি নীতি পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সকল পরিবারেই শিশুদের শিক্ষার সম্বন্ধে অল্প-বেশী এই নীতিগুলিকে মানিয়া চলা হইতেছে।

কিন্তু এখন আর এই ব্যবস্থায় চলিবে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, শিক্ষার রীতি-পদ্ধতিও

বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। প্রাচীনেরা যে রীতিনীতি গড়িয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে এখন আর কাজ চলে না। অথচ আধুনিক যুগের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে যে সব রীতি-নীতির আবিষ্কার করিতেছেন, সেগুলিও মুখে মুখে ছড়াইয়া প্রতি পরিবারে প্রবেশ করিতে সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে পিতামাতার নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে চলা ছাড়া গতি নাই। আপাততঃ তাঁহাদেরই একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে; সমস্ত রীতি-পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টার মূল্য ও কার্য্যকারিতা কি রকম, তাহা বিচার করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মত 'রীতি-পদ্ধতি' ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আগের দিনে মা দরকার মত ছেলেকে প্রহার করিতেন। তাহাতে কাজও হইত, কেহ নিন্দাও করিত না। এখন আমরা বলি, শিশুর গায়ে হাত তোলা অত্যন্ত অন্যায়। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সেকথা উঠিতেছে না; কথাটায় আমরা বিশ্বাস করি এবং শিশুর মস্তকে সুবুদ্ধি ও সুনীতি প্রবেশ করাইবার জন্য পৃষ্ঠে আঘাত করাকে নিষেধ করিয়া থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে 'পুরাণোনীতি' পুরাণো বলিয়াই সম্মান পায় না। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। আগে ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সৌখীনতা বর্জ্জনের একটা ধুয়া ছিল। বলা হইত, শিশুর খাদ্য যত সাদাসিধা হয় ততই ভাল, ক্ষুধা পাইলেই খাদ্য মুখে রুচিবে। অযথা তাহার জিহ্বার মেজাজ বাড়াইও না। আমরা এখনকার লোকেরা বলি, বড়দের মতই শিশুদের খাদ্যও পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়া চাই। আগে ধারণা ছিল—শিশুদের লোভ বা বিশেষ কোন প্রকার খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ একটা বড় পাপ, সেটাকে দমন করাই চাই। এখন বলা হয়, শিশুর পক্ষে কোন্ খাদ্যটা ঠিক খাটিবে তাহা এই লোভ দেখিয়াই স্থির করা উচিত; পিতামাতার পক্ষে এই হিসাব ধরিয়া চলাই

সবচেয়ে নির্ভুল ও সরল পথ। শিশুদের খাদ্যে সংযম ও নিয়ম এখনও আছে, সকল বস্তু নির্ব্বিচারে তাহাদের এখনও খাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তবুও তাহাদের পছন্দ-অপছন্দটা আমরা ভুলিয়া যাই না।

প্রাচীন কালের কথা ছিল, ছেলেদের যথাসম্ভব কষ্ট সহিতে শিখানো উচিত। পাঁচ বছরের এক খোকা দুর্য্যোগের রাত্রিতে এক মিছিল দেখিতে গেল; বুক ফুলাইয়া বলিল. "বাতাস বৃষ্টি সহিতে ত হইবেই, নইলে নাবিক হইব কি করিয়া?" শীতে কাঁপিতে থাকিলেও সে কিছুতেই চালের নীচে আশ্রয় লইতে রাজি হইল না। কিন্তু এইযুগে চালের আশ্রয়টাই বড় বস্তু; শিশুদের অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অতিরিক্ত রৌদ্র-শীত সহিতে দেওয়া আমরা অনুচিত মনে করি। পুরাণো যুগের নীতিকথা ছিল, ছেলেদের আবার স্বাধীন ইচ্ছা কি? গুরুজন তাহাকে যা বলিবেন সে তাই করিবে, লেখাপড়া লইয়া থাকিবে এবং নেহাৎ যদি কোথাও কোন বাধা-নিষেধ না থাকে তবে সময়-সময় একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবে। এখন আমরা ছেলেদের পক্ষে বাঁধা-ধরা কর্ত্তব্যের চেয়ে আনন্দ-কোলাহলটাকেই বেশী দরকারী মনে করি; বিশ্বাস করি—খেলার মধ্য দিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে তাহারা লেখাপড়া কাজকর্ম্ম শিখিবে।

আগে সর্ব্বতোভাবে গুরুজনের আজ্ঞাধীন থাকিয়াই ছেলেরা বড় হইত। এখন গুরুজনেরা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ছেলেরা পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছামতই বাড়িতে পায়। অবশ্য শিশুদেরে এই যে বড় করিয়া দেখা, তারও একটা সীমা আছে। এই সম্বন্ধে 'ফরাসী গার্হস্থ্যজীবন' * বইখানিতে একটি মজার গল্প আছে। এক জায়গায় নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ। এক ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যথাসময়ের ঠিক এক ঘণ্টা পরে

* "French Home Life."

আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্যাপার কি? তাঁহাদের তিন বছরের মেয়ে আবদার ধরিয়াছিল, সে যখন শুইতে যায় বাবা-মাকেও তখনই কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। অতএব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সন্ধ্যা হইতেই শয্যা লইয়াছিলেন। মেয়ে ঘুমাইয়া পড়ার পর তবেই তাঁহারা পলাইয়া আসিতে পারিলেন। এটাও বাড়াবাড়ি। ভারতবর্ষ শিশুপূজায় এখন পর্য্যন্ত অতটা অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাহারও গতি এই দিকেই। শিশু-শিক্ষার নূতন পদ্ধতিগুলির কতটা ক্রম-বর্দ্ধমান দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর কতটাইবা এই অন্ধ শিশুপূজার ফল, হঠাৎ করিয়া তাহা বলা শক্ত। সেটা স্থির করিতে গেলে ধীরচিত্তে অনেক কিছুই বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। তবুও একথাটা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে সন্তানের প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির সম্বন্ধে পিতামাতা একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। তাহাদের কি প্রয়োজন তাই বুঝিয়া বেশ ধীরে সুস্থে চিন্তা করিয়া তবেই তাহারা শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি স্থির করিবেন। তাহা না হইলে শিশুদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটী ঘটিবে। আগের যুগেও হয়ত এই ত্রুটী ঘটিত, কিন্তু এ যুগে ইহার কুফল হইবে অনেক বেশী।

পদ্ধতি অর্থ উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার পথ—

'পদ্ধতি' (Method) কথাটায় দুটা জিনিষ বুঝায়: কোন একটা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথের নির্দ্দেশ ইহাতে আছে এবং সেই পথে অগ্রসর হইবার ধাপগুলি ঠিক করা আছে। একটা পদ্ধতি অনুসারে কেহ চলিতেছে বলিলেই, সে যে-লক্ষ্যের উদ্দেশ্য করিয়া চলিতেছে সেই লক্ষ্যের নাম এবং স্বরূপটাও মনে হয়। আপনি আপনার শিশুকে শিক্ষা দিবার একটা ভাল পদ্ধতি খুঁজিতেছেন; শিক্ষার ফলে তাহার

কিরূপ উৎকর্ষ আপনি চান, সেইটা বিচার করিয়া তবেই আপনাকে পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি কতকটা প্রাকৃতিক পদ্ধতির মত। 'প্রকৃতি' আমাদের দিয়া যাহা করাইতে চায়, করাইয়া নেয়; অথচ এমনই সহজ সরল অগোচর ভাবে আমাদের উপর সে আপন প্রভুত্ব খাটাইয়া থাকে, সে কথা আমরা জানিতেই পারি না। আমাদের উপর সে জোর করে না। অথচ তাহার দৃষ্টি, তাহার কর্ম্মচেষ্টা, সদাজাগ্রত। আমাদের সত্তার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে সে আমাদেরে চালাইয়া বেড়ায়, তাহার সেই শক্তিকে এড়ানো অসম্ভব। সত্যকার শিক্ষার পদ্ধতিও হইবে সেইরূপ। সে পদ্ধতি লক্ষ্যের অগোচরে আপনার শক্তি বিস্তার করিবে। তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা; তাই সে প্রয়োজন ও অবসর মত পৃথিবীর সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারকেই কাজে লাগায়, সকল রকম ঘটনা ও সকল রকম বস্তুর মধ্য দিয়া শিক্ষাকে মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেয়। শিক্ষা হইবে অনায়াসসিদ্ধ। যে পিতা বা মাতা শিক্ষা দিবার সত্য কৌশলটি জানেন তাঁহার কাছে শিক্ষা দেওয়া প্রাকৃতিক ঘটনার মতই সহজ সরল। হাঁটিতে, চলিতে, খাইতে, শুইতে শিশুর জীবনে যা কিছু ঘটে, তাহাকেই তিনি কাজে লাগান, তাহারই মধ্য দিয়া যে-শিক্ষা তাহাকে দেওয়া দরকার তাহাই দেন। শিশু শিখে, অথচ বুঝিতেই পারে না যে সে শিখিতেছে। এবং অভ্যাস করিলে এই শিক্ষা-দেওয়ার স্বভাবটাও এতই সহজ হইয়া যায় যে শেষে পিতা-মাতা নিজেও সবসময় টের পান না যে তাঁহারা শিক্ষা দিতেছেন। বিচার করিয়া দেখুন, আপনার শিশু কি নাইতে খাইতে শুইতে হাঁটিতে চলিতে নিজের অজ্ঞাতসারে এমন সহজে শিক্ষা পাইতেছে যে সেটা সে জানিতেই পারিতেছে না, ঠিক যেমন সে সারাক্ষণ নিঃশ্বাস লয়, কিন্তু সেটা লক্ষ্যই করে না। যদি তাই হয়, তবেই শিক্ষা দেওয়ার ঠিক পদ্ধতিটির আপনি

সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে একটি বিপদ্ আছে ; এই সহজ পদ্ধতি অনেক সময় শুধু একটা মুখস্থ করা 'রীতি'তে (System) পরিণত হয়। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিটার অবস্থাই দেখুন। জীবনের বিচিত্র এবং জটিল গতির মধ্য দিয়া শিশুদের সহজ সুন্দর ভাবে শিক্ষা দিবার এই পদ্ধতি বাহির করিয়াছিলেন কয়েকজন মহাপ্রাণ শিক্ষক। কিন্তু মূর্খ ও অপটু শিক্ষকের হাতে এমন সুন্দর পদ্ধতিও কিরূপ প্রাণহীন 'রীতি'-মাত্র হইয়া উঠিয়াছে !

পদ্ধতি ও রীতি—

শিক্ষার 'রীতি' বা নিয়ম কথাটা অনেককে মুগ্ধ করে। পদ্ধতির চেয়েও এই নামটার মোহ বেশী, কারণ এখানে ফল কতটুকু হইবে তাহার একটা আনুমানিক অঙ্ক হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। রীতি যেখানে থাকে, সেখানে কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম বা পাঠ আছে। এই পাঠ গুলি অভ্যাস করিয়া সকল কিছুই খানিকটা শেখা যায়, সেটা শর্টহ্যাণ্ড-শেখা, নৃত্য পরীক্ষায় পাশ করা, হিসাব রক্ষক হওয়া বা 'সোসাইটি-মহিলা' হওয়া,— যাই হোক। এখানে রীতি কথাটার অর্থ কয়েকটি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলা, যেন বিশেষ কতকগুলি কাজ করিতে করিতে, বিশেষ কোন ধরণে চলিতে, চলিতে ক্রমে সেটা কতকটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায় ; এবং অভ্যাস হইয়া গেলেই ত বিদ্যা অর্জ্জন করা হইয়া গেল ! বাঁধা হিসাবমত ফল পাইবার পক্ষে পন্থাটা মন্দ নয়। নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় বলিয়াই রীতির আদর ; সেই জন্যই শিক্ষার ব্যাপারটাকেও ভাঙ্গিয়া সহজ করিয়া কতগুলি মোটামুটি বাঁধা রীতির মধ্যে ফেলিতে অনেকে চেষ্টা করেন। করা স্বাভাবিকও বটে। যে কোন একটা ব্যাপার, তাহার মধ্যে যে কয়টা প্রক্রিয়া বা গতি আছে, তাহাদেরে ভাঙ্গিয়া

আলাদা করা, তারপর সেই খণ্ড-প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকের পুনরাবৃত্তি করাইয়া ফল আদায় করা— এটা অনেকটা যান্ত্রিক ব্যাপার। কল তৈরি করার ও চালাইবার মূলমন্ত্র এইটাই বটে। মানুষ যদি কল হইত, তবে এই পন্থাটা অতি চমৎকার কাজ করিত। শিক্ষায় তখন আর কোন সমস্যা থাকিত না; নির্দিষ্ট রকমে নির্দিষ্ট কতগুলি কাজ শিশুকে অভ্যাস করাইয়া দিলেই শিক্ষার কাজ শেষ। শিক্ষকেরও তখন কাজ হইত শুধু সুবিধামত কয়েকটা প্রক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে অভ্যাস করাইয়া দেওয়া। তারপর কল নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকিত, আর তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইতে হইত না। ইহাতে শ্রম কমিত সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ সত্যই কল নয়। সে প্রাণবান্ জীব, তাহার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, উন্নতি প্রগতির সম্ভাবনা ও চেষ্টা আছে। তাহার মধ্যে যেমন অফুরন্ত উন্নতি ও মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, তেমনি অগাধ পাপ এবং অমঙ্গলেরও আশঙ্কা আছে। শিক্ষকের কাজ তাই বিরাট। শিশুর সুপ্ত কার্য্যক্ষমতাকে তিনি জাগ্রত করিবেন। তাহার ভিতরে যে মঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া এবং অমঙ্গলকে দমন করিয়া সে যাহাতে চরম উৎকর্ষলাভ করিয়া জগতে দশজনের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার পক্ষে যতখানি উন্নত হওয়া সম্ভব তাহা হইতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহাকে চালাইবার গুরু-দায়িত্ব হইল শিক্ষকের। শিক্ষক কল চালাইতে আসেন নাই, হাতল টানিয়া দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন হয় না। তিনি আসিয়াছেন মানুষকে চালাইতে, সেই মানুষের দেহ ও মনের উৎকর্ষ-প্রকর্ষ ঘটাইবার ভার লইয়া। তাঁহার কল চালাইবার ফাঁকি খুঁজিলে চলিবে না, বাঁধা রীতি ও পাঠের সন্ধান করিলে চলিবে না। রীতির উপকারিতা নাই এমন নয়; দেহ ও মনকে শিক্ষিত

করিয়া তুলিবার কাজে, অভ্যাসের জোরে উৎকর্ষ আনিবার ক্ষমতা রীতির আছে। কিন্তু তবুও 'শিক্ষার রীতি' কথাটাই আপত্তিকর। রীতি খাটাইয়া শিক্ষা দিতে গেলে সত্যকার শিক্ষা দেওয়া হইবে না। সে-শিক্ষা কলের মত মুখস্থ কাজই শিখাইতে পারে, জীবন্ত মানুষের পক্ষে যে বুদ্ধি ও গতির প্রয়োজন, তাহার সন্ধান সে রাখে না।

রীতি ও সত্যকার শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এই প্রভেদটা জানিয়া রাখা দরকার। অনেক সময়ই দেখা যায় পিতামাতা একটা কোন বিশেষ রীতির আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এই রীতির ফল হয়ত বিশেষ কোন একটা দিকে উন্নতি ঘটানো। রীতি মানিবার ফলে শিশুর সেই একটা দিকই সমৃদ্ধ হইতেছে— তাহার শুধুই পেশীর বল বা স্মৃতিশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িতেছে, অন্য দিক্‌গুলি অবহেলিতই থাকিয়া যাইতেছে। পিতামাতার সেদিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই খালাস। যেন সেই একটা দিকে ছেলে বড় হইলেই সব হইল, আর তাহার কিছুর দরকার নাই। পিতামাতা যে এত সহজে নিশ্চিন্ত হন এবং শিশুর সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন থাকেন তাহার মূলে আছে মানুষের স্বভাবগত আলস্য ও উদাসীনতা; সারাক্ষণ যক্ষের মত সতর্ক হইয়া আগ্‌লানোর চেয়ে, একটা কিছু বাঁধা ব্যবস্থা খাঁড়া করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই আমরা সুখী হই। অথচ শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন করিতে হইলে সেই যক্ষের মত অক্লান্ত পাহারারই প্রয়োজন হয়। তাহার জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এর সাহায্যেই তাহার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। অবশ্য পিতামাতার স্বপক্ষেও যুক্তি নাই এমন নহে। শিশুর সকল ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, বুঝিলাম। কিন্তু সর্বক্ষণ সকলবিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য যে অফুরন্ত উদ্যম ও অক্লান্ত যত্ন লাগে, কয়জনে তাহা দিতে পারেন? শিশুর জন্য যে-কোন রকমের

পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়ত পিতা ও মাতা রাজি আছেন। সেই পরিশ্রম নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে করিতে তাঁহাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু শিশুর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখা, সেই খুঁটিনাটি ঘটনার কোন্‌টি তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে কতটুকু কাজে আসিবে তাহা নখদর্পণে রাখিয়া তাহাকে সেইমত শিক্ষা দেওয়া, এবং যে ঘটনাটি যেভাবে ঘটিলে তাহার পক্ষে শুভ হইতে পারে সেইভাবে তাহা ঘটিতে দেওয়া,—এ কাজ মানুষের সাধ্য নহে, অতি-মানবেরাই শুধু ইহা পারেন। যুক্তিটা শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু যাঁহারা এই যুক্তির আশ্রয় নিতে চান তাঁহাদের ধারণা, শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা একটা অফুরন্ত পরিশ্রমের কাজ। শিশুর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে আলাদা আলাদাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তারই মধ্য দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে ; সেই ঘটনাগুলির কোনটার কাহারও সহিত সম্পর্ক নাই, সংশ্রব নাই— প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ঘটনা— এবং তাহাদেরে লইয়া শিক্ষা দেওয়ার যে পরিশ্রম তাহাও প্রতিক্ষেত্রেই আলাদা ভাবে করিতে হইবে, প্রত্যেক স্থলেই উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। সত্যই তাহা হইলে পরিশ্রমের অবধি থাকিত না এবং সে পরিশ্রম মানুষের সাধ্যে কুলাইত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে না। জীবনের ও শিক্ষার গোটাকতক মূলনীতি প্রথমে শিখিয়া লইতে হইবে। এইগুলি একবার আয়ত্ত হইয়া গেলেই শিক্ষা-দিবার পরিশ্রম অনেক কমিয়া যায়, এবং পরে যে সকল খুঁটিনাটি ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে, সেগুলিকে এই মূল নীতি গুলির সহিত খাপ খাওয়াইয়া সহজেই শিক্ষার পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়। এই অধ্যায় ও ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমি এই মূলনীতিগুলি লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার আগে আরো দুই একটা প্রাথমিক কথার আলোচনা সারিয়া লওয়া দরকার।

২। শিশুর জগৎ

প্রথমেই দেখা যাক্, সংসারে শিশুর স্থান কোথায়, এবং সে কোন্ জগতে বাস করে। শিশুর সত্যকার রূপটি কি? সে কি একখণ্ড সাদা কাগজের মত, যার উপর আমরা যা-খুসী লিখিতে পারি? সে কি একটি কচি শাখা যাকে যে-ভাবে ইচ্ছা নোয়াইবার বাঁকাইবার ভার আমাদের? সে কি মূর্ত্তি গড়িবার কাদামাটি যা-দ্বারা আমরা যাহা খুসী গড়িতে পারি? হয়ত বা তা-ই; কিন্তু তাহা ছাড়াও সে আরো অনেক কিছু। আমাদের তুলনায় তাহার জগৎ অনেক ঊর্দ্ধে; সে যেন রাজপুত্র, যার পালনের ভার পড়িয়াছে দরিদ্র কৃষকদের হাতে।

নিম্নে ইংরেজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ শৈশবাবস্থার যে ধারণা করিয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইল :—

"আমাদের জন্ম ত জন্ম নয়; সে এক ধরণের নিদ্রা ও বিস্মৃতি। আমাদের আত্মা আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, যা আমাদের জীবনের সঙ্গেই উঠে। সে অস্ত গিয়াছিল অজানা এক দেশে এবং আবার উদিতও হইয়াছে অনেক দূর হইতে। সম্পূর্ণ বিস্মৃতিতে মগ্ন হইয়াও নয়, অথবা সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়ও নয়— আমরা বরং আমাদের চিরনিকেতন পরমেশ্বরের নিকট হইতে অফুরন্ত মহিমার আবরণে বেষ্টিত হইয়াই আসি, এবং আমাদের শৈশবে স্বর্গই আমাদিগকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া রাখে।

"হে শিশু, তোমার বাহ্য আকার দেখিয়া কিন্তু তোমার আত্মা যে অসীম তাহা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। হে দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বর্গ হইতে পাওয়া উত্তরাধিকার এখনো বজায় রাখিয়াছ। হে অন্ধদের মধ্যে চক্ষুষ্মান্, তুমি মূক ও বধিরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও শাশ্বত আত্মার অবিরাম প্রেরণায় সেই তল-হীন অসীমের বুকে কি লেখা

আছে তাহা পাঠ করিতেছ। হে শক্তিমান্ যোগী, ভাগ্যবান্ ঋষি! আমরা যে সত্য লাভ করিবার জন্য জীবন ব্যাপিয়া সাধনা করিতেছি তাহা তোমাতেই নিহিত আছে। তোমার অমৃতত্ব, দিনের আলোর ন্যায়, কিংবা দাসের মনে প্রভুর অস্তিত্বের ন্যায়, নিরন্তর তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। সেই অমৃতত্বকে কিছুতেই তোমা হইতে পৃথক করা যায় না। হে শিশু, তুমি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার উচ্চতম সত্তায় তুমি স্বর্গীয় মুক্তির শক্তিতে মহিমান্বিত"। এইভাবে কবি তাঁর গাথার সকল স্থানেই শিশুদের প্রকৃতি ও অবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে গভীরতম পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাইবেলের পরে শুধু এইখানেই দেখা যায়।

৩। শিশুর প্রতি অন্যায়

অন্যায় কি ?—

শিশুদের প্রতি অন্যায় করা হয় তখনই যখন তাহাদের দিয়া যেটা করানো অনুচিত তাহাই করানো হয়। শিশুদের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হয় তখনই যখন তাহাদের জন্য আমাদের যাহা করা উচিত সেটা আমরা না করিয়া ফেলিয়া রাখি। "Offence" কথাটার ভাষাগত অর্থ পথের বাধা, যাহাতে ঠেকিয়া চলার সময় আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যায় অর্থ সেই বাধা। মা জানেন, শিশু যখন প্রথম হাঁটিতে শিখে, টলিতে টলিতে পা ফেলিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে, একজনের কোল হইতে আর একজনের কোলে ছুটিয়া যায়, তখন যাহাতে পথে কিছুতে আটকাইয়া পড়িয়া না যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার দরকার কতখানি। মা ব্যস্ত হইয়া তাহার সম্মুখের সমস্ত জিনিষ সরাইয়া নেন, যেন সে হোঁচট না খায়। টেবিলের পায়ায়, খোকারই

পুতুলটায় বাধিয়া সে আছাড় খাইলে মা চটিয়া উঠেন। খোকা আছাড় খাইল, চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িল— কেন? এই আছাড় সে খায় কেন? ঘরের মধ্যে রাজ্যের বাজে জিনিষ ছড়াইয়া আছে, সেগুলি কেহ একটু কষ্ট করিয়া সরাইয়া তুলিয়া রাখিতে পারিত না? পারিত ত রাখে নাই কেন?

সামান্য পুতুলে বাধিয়া খোকা আছাড় খাইলে মা অস্থির হইয়া পড়েন। সেই খোকা যখন জীবনের পথে চলিতে শিখিবে— সে পথে ত আরও কত বড় বড় বাধা বিঘ্ন আছে, পায়ে পায়ে সেখানে বিপদের সম্ভাবনা। খোকার পা এখনও অসামাল, জীবনের উপলবন্ধুর পথে টলিতে টলিতে সে সদ্য চলিতে আরম্ভ করিল; এই পথের বাধা পুতুলের মত বা জল-চৌকির মত নয় যে ইচ্ছা করিলেই সরাইয়া ফেলা যাইবে। এবং যাইবে না বলিয়াই মা সুস্থির হইতে পারেন না— পারা স্বাভাবিকও নয়। খোকাকে ঠিকমত হাঁটিতে, বিঘ্ন এড়াইয়া চলিতে শিখাইয়া তবে তাঁর ছুটী, তার আগে নয়।

অবাধ্যতা শিশুর জন্মগত প্রবৃত্তি নয়—

'দুষ্টু ছেলে'!

মার মুখে এই কথাটা শুনিলেই খোকার চোখের পাতা নামিয়া পড়ে, মুখ ও কান লাল হইয়া উঠে; ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার, না? ভারি মজার। অনেকেই ইহাতে মজা পান; ছেলে যখন অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত শিষ্ট, তখনও তাঁহারা কারণে অকারণে তাহাকে সকৌতুক খোঁচা দিয়া বলেন, 'দুষ্টু ছেলে'। কথাটা শুনিয়া খোকা লজ্জা পাইবে, সঙ্কুচিত হইবে, সেই লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্য দিয়া তাহার মধ্যে যে বিবেক ও ভাবপ্রবণতার চেতনা আছে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহাকে খোঁচা দিয়া সেই আত্মপ্রকাশটুকু দেখিতেই তাঁহাদের আনন্দ।

কিন্তু একটা কথা ইহারা ভাবিয়া দেখেন না। শিশুর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির ও চেতনার এই যে আত্মপ্রকাশ, ইহা তাহাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। তবুও সেই চেতনা তাহার মধ্যে জাগে। ইহার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নহে, ইহার অর্থ শিশুর মনে নিয়ম মানিবার, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া চলিবার একটা সহজাত সংস্কার আছে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সে করিতে পারে, কোন্‌টা তাহার করা বারণ, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা শিশুর মনে থাকে, এবং উচিত অনুচিত মানিয়াও সে চলিতে চায়। এই জন্যই শিশুকে পৃথিবীতে পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ সকলকে সতর্ক করিয়া দেন— 'ইহার প্রতি অপরাধ করিও না, ইহাকে দিয়া অন্যায় কাজ করাইও না।'

কিন্তু সেই আদেশ আমরা মানি কি? বড় বড় ছেলেমেয়ে যাহারা, তাহাদের মধ্যেও ত অন্যায় আচরণ আমরা দেখিতে পাই। পিতা ও মাতা দুইজনেই অতি সচ্চরিত্র, অতি ভদ্রলোক, অথচ তাঁহাদেরই বড় বড় ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র নাই; জ্ঞান হইয়াছে, তবু কোন্‌টা তাহাদের করা উচিত বা অনুচিত সে চেতনাই তাহাদের মধ্যে জাগে নাই। তাহাদের চাওয়া না-চাওয়া, তাহাদের ভাল-লাগা না-লাগা, তাহাদের খুসী অ-খুসী, ইহাই হইল একমাত্র বিচার্য্য! তাহা ছাড়া আর কোন যুক্তি মানিয়াই তারা চলিতে চায় না— এমন দৃষ্টান্ত ত মোটেই বিরল নয়। এ অবস্থাটা যখন দাঁড়ায়, তখন সেটা পিতা-মাতার দুর্ভাগ্য! কিন্তু কেন এমন হয়? কেন ভদ্র পিতামাতার সন্তানেরা তাঁহাদের ভদ্রতার অনুকরণ শেখে না, অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে?

শিশুকালে তাহার মনে সহজাত উচিত অনুচিতের বোধ ছিল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর তাহার মধ্যে সে বোধ বা চেতনা নাই, তাহার মনে কেবলই উচ্ছৃঙ্খলতা। কি করিয়া এই পরিবর্তন আসে?

আসে দিনের পর দিন ধরিয়া, অতি ধীরে ধীরে, প্রায় অলক্ষ্যগতিতে। দিনের পর দিন খুঁটিনাটি ভাল ও মন্দ জিনিষ তাহার সামনে পড়ে, চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, কোন্‌টাকে সে বাছিয়া গ্রহণ করিবে বা বর্জ্জন করিবে সেইটুকুই তাহাকে কেহ শিখায় না।

ছোট খোকা চুপিচুপি গিয়া চিনির ভাণ্ডে হাত পুরিয়াছে, তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষে দুষ্টহাসি, চিনি চুরি করিতে করিতে সে মিটিমিটি মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া নির্ভুল আন্দাজ করিয়া লইতেছে, চুরিটা ঠিক হজমকরা যাইবে কিনা। মা হাসিয়া সকৌতুক ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন, 'দুষ্টু'! খোকার কাণ্ড! তাহার চুপিচুপি আসা, আবার মিটমিটু করিয়া দেখা, তাহার দিকে কেঁহ চাহিলেই অমনি মুখ গম্ভীর করা যেন কিছুই হয় নাই— সবশুদ্ধ এ একটা ভারি মজার ব্যাপার! মা মজা পান, কাণ্ড দেখিয়া না হাসিয়া পারেন না ; খোকা নির্ব্বিঘ্নে এবং সোৎসাহে কার্য্য সমাধা করে। কিন্তু মা লক্ষ্য করিলেন না, ইহারই মধ্যে তিনি একটি অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার সেই দু'বছরের খোকাকে চিনি চুরি করিতে প্রকারান্তরে উৎসাহ দিয়াছেন। তাহার জীবনের পথে একটা হোঁচট খাইবার জায়গা ইহারই মধ্যে তৈরি হইয়া গেল। সে শিখিয়া নিল, মা যেটার জন্য মুখে 'দুষ্টু' বলেন কাজে তার জন্য শাস্তি দেন না। অতএব এই দুষ্টুমিটুকু নির্ভয়ে করা যাইতে পারে। পরের বারে এই জ্ঞানটুকুকে সে কাজে লাগায়, এবার আর একটু বেশী অগ্রসর হয়, মা-ও বারণ করেন না।

দৃষ্টান্ত টানিয়া বাড়াইবার দরকার নাই। যা ঘটে সে ইতিহাস সকলেই জানেন। এই ভাবে ক্রমে শিশু জানিয়া নেয়, মা "না" বলিলেও সে-কাজটা নির্ভয়ে করা যায়, তাহার নিষেধের দাম খুব বেশী নয়।

মা যেটাতে আপত্তি করেন একটু জোর করিয়া আবদার করিতে পারিলেই আবার সেটায় তাহার সম্মতিও পাওয়া যায়। ততদিনে সে ইহাও জানিয়া গিয়াছে, মার নিষেধে বা অমতে কিছু যায় আসে না, মার আপত্তি বা অপছন্দটাকে কোনরকমে ঘুরাইয়া দিতে পারিলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি। মা ইচ্ছা করিলেই তাহাকে কাজটা করিতে দিতে পারেন, তাই যদি হয়, মা কেন তাহাকে সে কাজ করিতে দিবেন না ? যেটা আপাততঃ নিষিদ্ধ সেটা করিবার সম্মতি তাঁহার কাছে আদায় করা যায়, একবার পাকেপ্রকারে তাঁহাকে 'হাঁ' বলাইতে পারিলেই আর সেটা করার কোন বাধা থাকিবে না। 'হাঁ' বলানোই বা কি এমন শক্ত কাজ ?

ইহা হইতেই শিশুর মনে আরো একটা ধারণা জন্মায়। শিশুর পক্ষেও সেই ধারণাটা করিয়া নিতে অতি-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মা যদি তাঁর যা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন, সেইবা পারিবে না কেন ? তাহার যা ইচ্ছা সেও তাই করিবে, যদি অবশ্য শক্তিতে কুলায়। ইহার পরই শিশু তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া লাগিয়া যায়, স্বাধীন ভাবে চলার চেষ্টা করিতে। পিতামাতা যতই তাহাকে বাধা দেন, সংযত করিতে চান, সেও ততই ঘাড় বাঁকাইয়া গোঁ ধরে। শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে হার হয় পিতামাতারই। তাঁহাদের নানা কাজ আছে, নানা চিন্তা আছে, এই একটা ব্যাপার লইয়া তাঁহারা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে পারেন না। ছেলের অন্য কাজ বা চিন্তা নাই, সে তাহার তরুণ মনের সবখানি শক্তি ও জিদ্ লইয়া ইহারই জন্য লড়িতে থাকে।

ব্যাপারটা হয়ত কিছুই নয়, তবু আপাততঃ ইহারই উপর তাহার ঝোঁক পড়িয়াছে, সেইটাই তাহার চাই। ক্লান্ত হইয়া শেষে পিতামাতা হাল ছাড়িয়া দেন, শিশুরই জয় হয়। কিন্তু সে জয় যে-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহা উচ্ছন্নে যাইবার পথ।

শিশু দেখিতে চায়, তাহার শাসকরাও আইন মানিতে বাধ্য—

ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লইয়া সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে এই যে জটিল অলক্ষিত সংগ্রাম, ইহার মূল কোথায়? ইহার মূলে থাকে মাতার মনে দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব। তাঁহার মনের ধারণা, তিনি কেবল নিজের খেয়াল মতই শিশুর উপর হুকুম চালাইতে পারেন; কোন্‌টা সে করিবে বা না-করিবে, বলিবে বা না-বলিবে, তাহা স্থির হইবে শুধু তাঁহার নিজের খেয়াল দিয়া। শিশু ত তাঁহারই সন্তান, তাঁহারই সম্পত্তি। তাহার নিজের আবার একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ কি? তিনি নিজে যা খুসী তাই করেন,সে কাজের মধ্যে তিনি যে কোন আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য, সেই খোঁজ শিশু পায় না। দিদির পুতুল বা হাঁড়িকুড়ি ভাঙ্গিলে, ভরাপেটে অতিরিক্ত খাইলে, বড়দের কাজের সময় গোলমাল করিলে, সে ধমক খায়। কিন্তু এগুলো অন্যায় কাজ, তাই সে যাতে এগুলি না করে সেটা দেখা মার কর্ত্তব্যের অঙ্গ; এবং তিনিও কর্ত্তব্য হিসাবেই তাহাকে ধমক দেন— এই কথাটা শিশু ধারণা করিতে পারে না। মা তাহাকে কারণে অকারণে ধমকান বলিয়াই, শেষে ধমকাইবার কারণ কিছু থাকিলেও সেটা তাহার চক্ষে পড়ে না। ধমকানোটা মা'র স্বভাবদোষ মনে করিয়া ধমক খাইলেই তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, কথা মানিবার ইচ্ছা থাকে না। এইটা যদি না হয়, শিশু যদি একথাটা বোঝে যে তাহার মত তাহার বাবা-মারও কতগুলি কর্ত্তব্য আছে, এবং সে যাতে নিষিদ্ধ কাজ না করে সেটা না দেখিয়া তাঁহাদের উপায় নাই, কারণ কাজটা মন্দ বলিয়াই নিষিদ্ধ, তবে সে কখনই কথা শুনিতে আপত্তি করিবে না; তাহার বয়স-সুলভ মধুর নম্রতা ও আনন্দের সহিতই সে সেই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে। অবশ্য, কোন কাজ সে কেন

করিবে বা করিবে না, এই 'কেন'টা বুঝিয়া লইবার ইচ্ছা শিশুর মনেও হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই 'কেন'র উত্তর দিতে অনেক পিতামাতাই রাজি হন না। শিশুদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়াটাকে তাঁহারা সম্মান-হানিকর বলিয়া মনে করেন। অথচ মুখে কৈফিয়ৎ না দিয়াও তাহাকে এটা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। শিশুর চক্ষু অতি তীক্ষ্ণ। মায়ের মুখের ভাব হইতেই সে বুঝিয়া নিতে পারে, তাঁহাকেও কতখানি কর্ত্তব্যের চাপে পড়িয়া শিশুর জন্ত এই সব বিধি-নিষেধের প্রয়োগ করিতে হইতেছে। সে যদি দেখে যে উচিত-অনুচিত বিষয়ক কোন আদেশ দিবার পর কোন-ক্রমেই আর মা-বাবা সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না, তবে সেও বুঝিতে পারে ইহার মধ্যে সত্যই ন্তায়-অন্তায়ের ব্যাপার কিছু আছে। তখন সেই আদেশ মানিতেও তাহার আপত্তি হয় না। মায়ের কথায় শ্রদ্ধা হারায় সে তখনই, যখন সে দেখে মার কথার স্থিরতা নাই, কথা বলিয়া আবার তাহা পাল্টাইতেও তিনি রাজি আছেন। এই ধারণা একবার হইলে সে আর কথা শুনিবে কেন?

শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও তাহার প্রতি অপরাধ—

শিশুর প্রতি স্নেহ সত্বেও মা যে-যে রকমে শিশুর প্রতি অন্তায় করিতে পারেন তাহার একটা হইতেছে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা। এখানে অজ্ঞতা বা খামখেয়ালির ফলে মা শিশুর অত্যন্ত ক্ষতি করিতে পারেন। সে ক্ষতি শুধু উপকার না-করার ক্ষতি নয়; হয়ত শিশুকে দিয়াই তিনি অন্তায় করাইয়া নেন। তাহাকে যদি তিনি অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দেন; যে ঘরে বায়ুর অবাধ গতি নাই এমন ঘরে তাহাকে থাকিতে শুইতে দেন; অথবা সাধারণ স্বাস্থ্যনীতির নিয়মগুলি পালন না করেন;

তাহার ফলে তাহার সমস্ত জীবনটারই গতি ঘুরিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। এই অপরাধ মার্জ্জনা করাও শক্ত। স্বাস্থ্যনীতির প্রয়োজনীয় কথাগুলি যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, সকলে জানিতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা এমন করিয়াই তাহা প্রচার করিতেছেন। ইহার পরও তাহা না জানিয়া, বা জানিয়াও না মানিয়া, শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্যকে বিকৃত করিলে, মা তাহার জন্য মার্জ্জনা পাইবেন কি বলিয়া ?

বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে অবহেলা—

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের ব্যাপারেও এই কথাই খাটে। পিতামাতা যদি নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে প্রথম দিনই তাহার ঘাড়ে এমন একগাদা অতি কঠিন রসহীন পাঠ চাপাইয়া দেন যে তাহার চাপে তাহার দম বন্ধ হইয়া যায়, তবে উন্নতি করা ত দূরের কথা, তাহার মন সেই অস্বাভাবিক কঠিন পড়ার চাপে পড়িয়া বাড়িতেও পারে না। সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই। অথচ ইহা সচরাচরই ঘটিতেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পাঠ-পরিচয়ের পরই শিশুর মনে পড়াশুনা ব্যাপারটার উপরে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, সারা জীবনে আর সে পড়ার উপরে মন বসাইতে পারে না। পড়ার মধ্যে যে অসীম আনন্দ আছে তাহার সন্ধান সে কোনদিন পায় না। তার জীবনে তার পরিচয় হয় বড়জোর হাল্‌কা উপন্যাসের সঙ্গে। বুদ্ধি লাগে, এমন পড়ার সঙ্গে আর তাহার পরিচয় হয় না। ইহার মূলে থাকে প্রথমদিকে তাহার উপর অতিমাত্রায় কঠিন পড়া চাপানো, সেই দুষ্পাচ্য পড়ার মধ্যে রস না পাইয়া সে পড়া কাজটার উপরেই বিরক্ত হইয়া উঠে। পড়ার নামেই সে ভয় পায়। এই রকমটা মেয়েদের বেলায়ই ঘটে আরো বেশী।

নৈতিক জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য—

শিশুর মন লইয়াও এই অপরাধ আমরা অনেক সময় করি। শিশুর মন কোমল। যাহাকে দেখে তাহারই প্রতি সে স্নেহের বাঁধনে আবদ্ধ হয়। পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই স্নেহ থাকে; বাড়ীর লোকদের ভালবাসার ব্যাপারে হয়ত মায়েরা বাধা দেন না। কিন্তু শিশু যেই একটু বড় হইল, বাড়ীর গণ্ডি ছাড়াইয়া বাহিরের লোকের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিল, অমনি তাহার উপর বাধানিষেধ আরম্ভ হইল। তাহার যাহাকে ভাল লাগে, দেখা গেল তাহার সহিত মেশার বিঘ্ন অনেক—সেখানে সামাজিক রীতিনীতি, সংসারী যুক্তিযুক্তির অনেক খেলা আছে যাহার অর্থই সে বুঝিয়া উঠে না। অথচ সেই রীতিনীতির চাপে তাহার বন্ধুত্ব তাহার স্নেহ কেবলই বাধা পায়, কেবলই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে যাহার সহিত মিশিতে চায় সে হয়ত জাতে বা পদমর্য্যাদায় ছোট; কিম্বা হয়ত তাহার পরিবারের সহিত শিশুর নিজের পরিবারের সদ্ভাব নাই; অমনি আদেশ হইল—উহার সহিত মিশিতে পাইবে না। ইহার ফলে ক্রমে তাহার মনের স্নেহ-প্রবৃত্তিই শুকাইয়া উঠে, সে আর ক্ষোভে দুঃখে কাহারও সহিত বন্ধুত্বই করিতে চায় না। ইহার অর্থ—তাহার মনের মৃত্যু।

এর চেয়েও বেশী অনিষ্ট ঘটে যখন শিশু আপন পরিবারের মধ্যে কাহাকেও ভালবাসিতে পায় না। সে হয়ত বাড়ীর মধ্যে 'বোকা' ছেলে বা হাবা মেয়ে—বাবা মা তাহার দিকে মোটেই নজর দেন না, তাহারও মন যে স্নেহ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতে পারে একথা তাঁহাদের মনেই হয় না। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সম্মুখেই তাঁহারা সবখানি স্নেহ ঢালিয়া দেন তাহার অন্য ভাই বোনদের উপর। সে দূরে থাকিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ইহার পর তাহার মনের ভাব

কি হওয়া স্বাভাবিক? ভাইবোনদের স্বভাবতই সে ভালবাসিবে না। তাহার ভাগের স্নেহটুকুও তাহারা একচেটে করিয়া ভোগ করিতেছে, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। তাহারা চোর। তাহারা দস্যু। বাবাকে মাকেও সে ভালবাসিতে পারে না। বাসিবে কি করিয়া? তাঁহারা তাহাকে ভালবাসেন না ত।

পিতামাতার এই পক্ষপাতের ফলে কতশত শিশু যে মনে মনে গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরে, স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তির এই মৃত্যুর ফলে কত জীবন যে শুষ্ক বিকৃত তিক্ত হইয়া উঠে, তারপর চিরতরে ছন্নছাড়া, নষ্ট হইয়া যায়, তাহার সন্ধান কেহই রাখে না। কিছুদিন আগে আমাকেই একটী মহিলা বলিয়াছিলেন:—"শিশুবয়সটা আমি বড় দুঃখে কাটাইয়াছি। মা আমার ছোট ভাইটিকে খুব বেশী ভালবাসিতেন। প্রত্যহ আমার চক্ষের সম্মুখে তাহাকে তিনি আদর করিতেন, খেলা দিতেন, আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিতেন না, একটুকরা হাসি একটি স্নেহের কথা কোনদিন আমার ভাগ্যে জুটে নাই। আমি যেন সেখানে উপস্থিতই নাই এমনই ভাব তিনি দেখাইতেন। ইহার ফলে আমার সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিত। সেই আঘাত, সেই বিষের প্রভাব আমি এখনও পুরাপুরি কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। মা এখন আমাকে খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু আমি এখনও তাঁহাকে মন খুলিয়া ভালবাসিতে পারি না। তাঁহার সহিত মন খুলিয়া মিশিতে পারি না। আমাদের দুই ভাই বোনের মধ্যেও সহজ স্নেহের সম্পর্ক নাই। থাকিবে কি করিয়া? একসঙ্গে একই মায়ের স্নেহ সমানভাগে পাইয়া ত আমরা বড় হই নাই! পরস্পরকে ভালবাসিতে ত আমরা শিখি নাই!"

৪। শিশুর প্রতি অবহেলা

মা জানিয়া বা না-জানিয়া ছেলের প্রতি অন্যায় করিতে পারেন ইহা না হয় ধরিয়া নিলাম। কিন্তু তাহাকে তিনি জ্ঞাতসারে অবহেলা করিবেন, ইহা কি সম্ভব? অবহেলা করা মানে ছোট বলিয়া মনে করা, ন্যায্য সম্মান না দেওয়া। সে অপরাধটা আমরা বড়রা করি, একথা অস্বীকার করা যায় না। শিশুদের লইয়া আনন্দিত আমরা হই বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতি যতটুকু লক্ষ্য রাখিতে হয়, যে পরিমাণে তাহাদের স্নেহ দিতে হয় তাহা তাহাদের দিই না। কথাটা রূঢ় হইলেও সত্য। মা তাঁহার ছেলেকে পালনের ভার ধাত্রীর (nurse) হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। সেই ধাত্রী মোটেই শিক্ষিত নয়, হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে ভদ্রও নয়। তবু তাহার হাতেই থাকে শিশুর ভার, এবং ঠিক সেই বয়সে, যখন তাহার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, মন সকলই থাকে ফটোগ্রাফের প্লেটের মত স্পর্শপ্রবণ—যাহা সে দেখিবে তাহারই ছাপ তাহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, জীবনে আর সে ছাপ মুছিবে না। শিশুর মূল্য ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নাই বলিয়াই মা এটা করিতে পারেন। অবশ্য ধাত্রী রাখার উপকারিতা নাই এমন নহে। পিতামাতা যদি যথেষ্ট শিক্ষিত ও কর্ম্মব্যস্ত লোক হন, তবে সকল সময় শিশুকে তাঁহাদের কাছে থাকিতে দিলে চলিবে না।

তাঁহাদের জীবন, সামাজিক-জীবন; পিতা-মাতার সঙ্গে সঙ্গে সকল সময়ে এই ভাবের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া থাকিলে শিশুর মন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্য দিয়াই চলিতে থাকে। উহাতে সে অকালপক্ক হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া, মা যদি মাঝে মাঝে একান্ত

গৃহস্থালির বাহিরে অন্য বস্তু লইয়াও একটু ভাবেন, ঘরের বাহিরের লোকের সঙ্গে একটু মেশেন, তবে তাঁহার মনও সতেজ থাকিবে, এবং তাহার কিছু সুফল শিশুও ভোগ করিতে পাইবে। আপত্তি সেখানে নয়; কথাটা হইতেছে মায়েরা শিশুকে উপেক্ষা করিলে, তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। তাঁহার নিজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সর্ব্বাপেক্ষা মধুর যাহা কিছু আছে তাহারই স্পর্শ যেন তিনি শিশুকে দেন। তাঁহার অন্য কাজের সময় শিশুকে সাম্‌লাইবার জন্য তিনি ধাত্রী রাখিতে পারেন; কিন্তু সে-ধাত্রীকে যেন বেশ দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া নেওয়া হয়, তাহাকে যেন তিনি আবশ্যকমত শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া দেন এবং তাহার হাতে শিশু কেমন থাকে সে বিষয়ে যেন সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ধাত্রী (nurse)—

আর কিছু না হোক, ধাত্রী যদি অমার্জ্জিত ও অভদ্র হয়, তাহাতেই শিশুর প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। ধাত্রীর দোষেই অনেক শিশুর নীতিজ্ঞান ঠিক সময়ে জাগে না এবং সেই ত্রুটি তাহার সমস্ত জীবনে আর সংশোধিত হয় না। নীতি শিখিবার এবং অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা শিশুর অত্যন্ত বেশী; দেখিবামাত্র সে শিখিয়া নেয়। মিথ্যা, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজির এতটুকু নমুনা চক্ষে পড়িলেই সে চট করিয়া সেটুকু মুখস্থ করিয়া ফেলে। ধাত্রী হয়ত বলিল, "আচ্ছা আর করিও না, তাহা হইলে মাকে বলিব না।" শিশু তৎক্ষণাৎ শিখিয়া রাখিল, মাকে তবে সকল কথা না বলিয়াও পারা যায়। তাহার কাছে মা হইবেন দেবতা, তাহার ভাল-মন্দ কোন কিছুই মায়ের অজানা থাকিবে না। সেই মাকে সে ফাঁকি দিতে শিখিল। বড়দের দোষত্রুটিও শিশু লক্ষ্য করে,

কিন্তু সব সময়ে সেই দোষত্রুটিকে সে পরিহার করে না। ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার আছে, কিন্তু নিজের উপর তাহার প্রভাব কম। বড়দের যাহা করিতে দেখে, নিজের মনে অন্যায় বলিয়া জানিলেও অনেক সময় সে তাহার অনুকরণ করে। ন্যায় হইতে অন্যায় করিবার মোহ মানুষের মনে বেশী, এই সর্ব্বনাশা বুদ্ধির হাত শিশুও এড়াইতে পারে না। তাই, দেখিয়া শিখিতে গিয়া সে ভালর চেয়ে মন্দটাই শেখে সহজে। ধাত্রী যদি অসভ্য হয়, বদরাগী হয়, মিথ্যাবাদী বা দুষ্ট-স্বভাব হয়, শিশু ভাল করিয়া কথা শিখিবার আগেই তাহার এই দোষগুলি শিখিয়া বসিবে এবং তারপর আর সেই দোষ সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

শিশুর দোষত্রুটি উপেক্ষা করিবার বস্তু নয়—

যত রকমে শিশুর প্রতি পিতামাতার ঔদাসীন্য প্রকাশ পায় তাহার একটি হইতেছে শিশুর দোষ ও অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া। শিশু অন্যায় করিলে অনেক সময় পিতামাতা সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। শিশুর মধ্যে একটা কুৎসিত প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যাইতেছে, সে হয়ত অতিরিক্ত লোভী, নিজের সন্দেশটা খাইয়া আবার দিদিরটাতেও ভাগ বসায়; বা সে হয়ত হিংস্রপ্রকৃতির, একটুতেই চটিয়া মানুষকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া অস্থির করে; বা হয়ত সে অম্লানবদনে দু'টা মিথ্যা কথা বলিয়া বসে, "চিনির ভাণ্ডে বা আচারের বোতলে আমি হাত দিই নাই।" তাহার স্বভাব খারাপ হইয়া যাইতেছে। তাহাকে শোধরানো দরকার। মা বোঝেন সবই, তবু চুপ করিয়া থাকেন। মনে জানেন, এই অন্যায়ের জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া দরকার; না হইলে তাহার স্বভাব সারিবে না। তবু ভাবেন, "আহা, আজ থাক, কিই বা

এমন করিয়াছে? এতটুকু ছেলে, কিই বা বোঝে? বড় হইয়া যখন বুঝিবে তখন আর করিবে না।” বড় হইয়া খোকা বোঝে না, তখনও সেই অন্যায় করে এবং তখন আর তাহাকে শাস্তি দিয়া শোধরাইবার সময় থাকে না। তার চেয়ে যদি মা প্রথমদিনেই তাহাকে সেই ধমকটা দিতেন, কত সহজে ও সুন্দর ভাবে কাজটা হইত। তিনি ও খোকা দু'জনেরই পক্ষে কত ভাল সেটা হইত! শিশু যখনই অন্যায় করে, সে যে অন্যায় করিতেছে এ চেতনাটাও তাহার মনে থাকে। এইটুকু শুধু যদি মা মনে রাখিতেন, তবে তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহাকে শোধরাইবার "সময় হয় নাই” বলার কোন অর্থই হয় না। অন্যায় করার, অন্যায় বুঝিবার বয়স যাহার হইয়াছে, সে-শিশুর প্রয়োজন মত অন্যায় শোধরাইবার বয়সও হইয়াছে। প্রথম অপরাধের সময়ই তাহাকে বাধা দেওয়া ভাল। তখন শুধু একটুখানি মুখ গম্ভীর করিয়া তাহার দিকে তাকাইলেই কাজ হয়। আর গ্রাহ্য না করার ফলে ক্রমে যদি তাহার সেই অন্যায় করাটাই স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় তখন সে অভ্যাস দূর করা কঠিন। তখন তাহাকে শোধরাইতে হইলে উল্টা সদভ্যাস তাহার মধ্যে জন্মাইতে হইবে; সেটা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। “আহা, ছোট ছেলে” বলিয়া তাহার অন্যায় ও বদমেজাজিপনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার অর্থ তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া।

৫। শিশুকে বাধা দেওয়া

শিশু ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক—

শিশু ও ভগবানের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও মৈত্রী সেটাকেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করাই শিশুর প্রতি সবচেয়ে গুরুতর অবহেলা দেখানো। বড়রা যদি শিশুকে বাধা না দেয়, তাহা হইলে সে নিজের বুদ্ধিতেই ভগবানের দিকে, পুণ্যের পথে, চলিবে। মায়ের নাম শিশু জানে না, তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে না, তবু সে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে। ফুল নিজে হইতেই সূর্য্যের দিকে, আলোর দিকে, মুখ করিয়া থাকে। শিশুর মনও সেইরূপ সহজাত সংস্কারের বশেই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ সে বোঝে না, তবু সে আনন্দ পায়, তবু সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে। এর চেয়ে সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে! ঈশ্বরের দিকেই সে চলুক, সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দরতর করিয়া তুলুক। তাহাকে বাধা দিও না।

ধাত্রীর কাছে শিশু ঈশ্বরের নামে কি শিখে?

ধাত্রীদের ভাষার নমুনা দিতেছি; "এই দুষ্টু বাঁদর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে একটুও ভালবাসেন না।" "ঈশ্বর তোমাকে খুব খারাপ জায়গায় (নরকে) পাঠাইয়া দিবেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমেশ্বর সম্বন্ধে ইহা ছাড়া অন্য ধরণের কথা শিশু ধাত্রীর মুখে শোনে না। চমৎকার বর্ণনা ঈশ্বরের! ঈশ্বর যেন বিশ্বজগতের হেডমাষ্টার, চক্ষু পাকাইয়া বেত হাতে করিয়াই আছেন, সকলকে ধরিয়া ধরিয়া শাস্তি দেওয়াই তাঁহার কাজ। তিনি যে ভালও বাসেন, মানুষের হৃদয়ে আলোক ও আনন্দ ছড়াইয়া দেওয়াই যে তাঁহার সত্যকার পরিচয়, সেকথা শিশু কখনও শুনিতে পায় না।

৬। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবার উপায়

শিশুর সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কাজ করা নিষেধ আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাক্ তাহার প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য কি; শিক্ষার নামে কি কি বস্তু তাহাকে দিতে হইবে।

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের শ্রান্তি ও ক্ষয়—

একটা কথা প্রথম হইতেই মনে রাখা দরকার; শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির — বুদ্ধি, ইচ্ছা, নীতিজ্ঞান— সকলেরই স্থান তাহার মস্তিষ্কে। চক্ষুরূপ যন্ত্রটা দিয়া যেমন আমরা দেখি, মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটা দিয়াও তেমনি চিন্তা করি, ইচ্ছা করি, ভালবাসি, পূজা করি। মস্তিষ্কের কাজ বলিতে যতগুলি ক্রিয়া বুঝায় তাহার কোন্‌টুকু ঠিক্ কোন্ খানে ঘটে তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতের প্রভেদ আছে; তবু একথাটা আমরা জানি, মানসিক বৃত্তির সকল কাজই কোন না কোন প্রকারে মাথার ভিতরকার শাদা ও ধূসর স্নায়ুপিণ্ডটার মধ্যেই ঘটে। এই শাদা পিণ্ডটাই 'মস্তিষ্ক'। মস্তিষ্কের সন্ধান রাখেন দেহতত্ত্ববিদ্; কিন্তু শুধু তাঁহাকে সে সন্ধান রাখিলে চলিবে না। পিতা এবং মাতাকেও মস্তিষ্কের খবর জানিতে হইবে। মস্তিষ্ক দিয়া আমরা চিন্তা করি। দেহের অন্য যন্ত্র, অন্য ইন্দ্রিয়, পরিশ্রমে অবসন্ন হয়, ক্ষীণ হয়; যথাযোগ্য বিশ্রাম, ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি দিয়া আবার তাহাকে তাজা করিয়া তুলিতে হয়। মস্তিষ্কও এই নিয়মের বাহিরে নয়। অতএব মস্তিষ্ক সুস্থ এবং সবল থাকিয়া দেহের অন্যান্য অংশ ও অঙ্গের সহিত সমান তালে কাজ করিতে থাকিবে, ইহাই যদি চাই, তবে মস্তিষ্ককেও যথাযোগ্য বিশ্রাম, ব্যায়াম ও খাদ্য দিতে হইবে। সন্তানের মস্তিষ্ককে সেইটা দিতে চাহিলে মস্তিষ্কের কর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে পিতা ও মাতাকে অনেক কিছু কথা জানিতে হইবে।

ব্যায়াম—

বাতিক-গ্রস্ত লোক, বা হাবা লোক দু'চারজন— আমরা সকলেই দেখিয়াছি। ইহাদেরে দেখিলেই একটা প্রশ্ন মনে উঠে, ইহারা কি দুর্বল মস্তিষ্ক লইয়া জন্মিয়াছিল? অনেক স্থলেই ইহার উত্তর সম্ভবত "না"। সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়াই ইহারা জন্মিয়া ছিল; কিন্তু তারপর সেই মস্তিষ্ককে সুস্থ ও সবল রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। হয়ত বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ককে তাহারা নিয়মিত ভাবে ও উপযুক্ত পরিমাণে খাটায় নাই; ইহাদের দেহই বাড়িয়াছে, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি বাড়ে নাই। কিম্বা হয়ত মস্তিষ্ককে ইহারা মোটেই খাটায় নাই, অলস থাকিবার ফলে ক্রমে মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল অঙ্গেরই এরূপ হয়। একটা সুস্থ হাতকে যদি বছরের পর বছর ধরিয়া সারাক্ষণ দড়ি বাঁধিয়া গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখা হয়, হাতটা ক্রমে শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এইভাবে অলস হইয়া থাকিতে সুস্থ মস্তিষ্ক চায় না; জোর করিয়া অলস করিয়া রাখিলে তখন সে নিজের সুবিধামত যা-খুসি লইয়া ভাবিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে অন্য চিন্তার অভাবে সেই একটা চিন্তা লইয়াই প্রাণপণে বিতণ্ডা করিতে থাকে। ইহার ফলে তাহার মতি ক্রমশ একপেশে হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা বলি 'বাতিক' বা 'ছিট'। এই বাতিক না জন্মিয়াও পাবে না; কারণ দেহের মত, নীতিজ্ঞানের মত, মস্তিষ্ককেও ধরাবাঁধা নিয়ম ও ব্যায়ামের মধ্যদিয়াই বাড়াইতে হয়; সেই নিয়মের ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে তাহার বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘটিবার আশঙ্কা বেশি। কবি কূপার কবিতা লিখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিষণ্ণতায় ভুগিতেন, এমন কি উন্মাদও হইয়া যাইতেন। একজন বিচক্ষণ লেখক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতা ছিল প্রচণ্ড; কবিতা লিখিতে যেটুকু পরিশ্রম হয়, তাহাতে

তাঁহার মস্তিষ্কের কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ নিয়োজিত হইত না; কাজের অভাবে বিভ্রান্ত হইয়া সেই অতিরিক্ত চিন্তাশক্তি দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত; এবং ইহারই ফলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। এই অনুমান একেবারে মিথ্যা না-ও হইতে পারে।

তাহা হইলে মোট কথাটা দাঁড়াইল এই, শিশুকে একেবারে কিছু না করিয়া একটি দিন কাটাইতেও পিতামাতা যেন না দেন। বুদ্ধি, নীতি, বা ইচ্ছার কিছুটা ব্যবহার তাহার প্রত্যহ করিতে হইবে। একটু কঠিন জিনিষ সে বুঝিতে চেষ্টা করুক; কাজ করিতে এবং শ্রম সহিতে শিখুক; সৎকাজ করিবার খাতিরে নিজের সুখ-সুবিধার মায়া একটু কাটাইতে শিখুক।

এই সকল শিক্ষার উচ্চতর এবং দূরতর সুফল ত আছেই; কিন্তু তাহা যদি না-ও থাকে, শুধু মস্তিষ্কটাকে সুস্থ, সবল ও তাহার কর্ম্মশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্দ্ধিত করিবার জন্যই এই প্রাত্যহিক ও নিয়মিত ব্যায়াম তাহার না করিলে চলিবে না।

বিশ্রাম—

মস্তিষ্কের পক্ষে পরিশ্রম যেমন দরকার, উপযুক্ত বিশ্রামও তেমনি দরকার। খানিক পরিশ্রম, তারপর খানিক বিশ্রাম, আবার পরিশ্রম, আবার বিশ্রাম, এইরূপে মস্তিষ্ককে ক্রমান্বয়ে ব্যায়াম ও বিশ্রামের মধ্যে রাখিতে হইবে।

এইখানে একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কাজ করার সময় মস্তিষ্কের অবস্থা অন্য অঙ্গের চেয়ে পৃথক নহে। মস্তিষ্কের যে অংশ পরিশ্রম করিতেছে, পরিশ্রমের ফলে তাহার সেই অংশ ক্ষয়ও হইতেছে; এই ক্ষয় পূরণ করিয়া তাহাকে সতেজ রাখিবার জন্য কতকটা অতিরিক্ত পরিমাণ

রক্ত সেখানে যাইয়া সঞ্চালিত হইতেছে। ইহার জন্য কেবল শরীরকে বাঁচাইয়া রাখিতেই শিরা-ধমনীতে যে-টুকু রক্ত থাকা দরকার, তাহার উপরেও খানিকটা বাড়্‌তি রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই বাড়্‌তি রক্ত মানুষের শরীরে থাকেও। কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব বেশী নয়। যখন যে অঙ্গটা কাজ করিতে থাকে, তখন সেখানে গিয়া বাড়্‌তি রক্তটুকু সাহায্য করে। এইরূপে একবার হাতে, একবার মস্তিষ্কে, একবার পাকস্থলীতে, সেই রক্ত যায়। ইহার অর্থ বোঝা সহজ। কাজেই, একই সময়ে দু'টি অঙ্গকে কাজ করাইতে গেলে এই রক্ত দুই জায়গায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে, ফলে কোন জায়গাতেই ইহার পরিমাণ যথেষ্ট হইবে না, ইহার ফলে আসিবে ক্ষয়, শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা।

খাওয়ার পরে বিশ্রাম—

শিশু পেট ভরিয়া খাইয়া উঠিল; সেই খাদ্য হজম করার জন্য তাহার পাকস্থলীকে অন্তত দুই তিন ঘণ্টা বেশ কঠিন শ্রম করিতে হইবে। শরীরের সেখানে যতটুকু বাড়্‌তি রক্ত আছে, সেইটুকু তখন যাইয়া তাহার পাকস্থলীতে জড়ো হইবে। খাইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহাকে খুব খানিকটা হাঁটিয়া আসিতে পাঠান হয় তাহার ফল কি হইবে? পায়ের কাজ সুরু হইতেই রক্তটা পাকস্থলী ছাড়িয়া পায়ে গিয়া হাজির হইল। পাকস্থলীর খাদ্যটা অর্দ্ধজীর্ণ হইয়াই পড়িয়া রহিল। রোজ রোজ যদি তাহাকে এইভাবে খাওয়ার পরই ছুটিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অজীর্ণ হইবেই। ভরপেট খাইয়া উঠিয়াই যদি তাহাকে পড়িতে বসিতে হয়, একই প্রকারের কুফল দাঁড়াইবে। যে রক্তটা তাহার হজমের জন্য সাহায্য করিত সেটা যাইবে মস্তিষ্ককে সাহায্য করিতে; খাদ্য ঠিকমত হজম হইবে না।

এই জন্যই বিশেষ বিবেচনা করিয়া পড়ার সময় ঠিক করা উচিত। মন যখন বেশ বিশ্রাম পাইয়াছে, তাহার ঠিক পরে— যেমন, ঘুম হইতে উঠিবার পরে বা খানিকটা খেলাধূলার পরে— পড়ার পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর সময়; সেই সময়ে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আর কোন অংশের ভিতরে যেন কঠিন কোন শ্রমের কাজ না চলিতে থাকে।

এই হিসাবে পড়ার ও মানসিক শ্রমের সবচেয়ে ভালসময় সকাল বেলা— অল্প কিছু খাওয়ার পরে, যে খাবার হজম করিতে পাকস্থলীকে বিশেষ শ্রম করিতে হয় না। বিকাল বেলাটা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত শুধুই খেলাধূলার জন্য। সেটা যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তবে ঐ সময়টাতে সেলাই, ছবি আঁকা, মিস্ত্রির কাজ প্রভৃতি টুকিটাকি হাতের কাজ শিশু করিতে পারে। দিনে রাত্রে সবসময়ে মানুষের শরীর ও মস্তিষ্কের কার্য্যে ক্ষমতা ও উৎসাহ সমান থাকে না। বিকাল এবং সন্ধ্যার দিক্‌টায়ও শিশুর বুদ্ধি মোটামুটি প্রখরই থাকে; তাই এই সব কাজ তখন সে ভাল করিতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যারাত্রে বেশী কাজ করাব একটা দোষ আছে। এই সময়ে মস্তিষ্কে কোন চিন্তার চাপ পড়িলে তাহা সহজে শান্ত হইতে চায় না। ফলে সন্ধ্যায় যে কাজ লইয়া সে বসিল, রাত্রে ঘুমাইতে যাইবার সময়ও মস্তিষ্কে তাহার রেশ থাকিয়া যায়। তাই শুইতে যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পড়িলে শুইবার পরও শিশুর মাথা গরম থাকে। তাহার ভাল ঘুম হয় না, ঘুমের মধ্যেও সে স্বপ্ন দেখে, তাই ঘুমাইয়াও বিশ্রাম পায় না। ছোট ছেলেদের ত সন্ধ্যায় ও রাত্রে কাজ করানো অন্যায়ই; বড় ছেলে-মেয়েদের যদি তখন একান্তই কাজ করিতে হয়, তবে ঘুমাইবার আগে অন্তত কিছু সময় গল্পগুজব হাসিতামাসা করিয়া তবে যেন তাহারা ঘুমাইতে যায়। আসলে রাত্রে পড়ার রীতিটা তুলিয়া দেওয়াই সবচেয়ে ভাল।

কাজ বদলাইয়া লওয়া—

শিরতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, মস্তিষ্কের মধ্যেও এক একটা অংশ এক একটা কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। হাক্স্‌লি কিন্তু বলেন, মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশের সহিত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি বা বৃত্তির সংশ্রব আছে, এরকম মনে করার মত প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নাই। শিরতত্ত্ববিদ্‌দের মতের সহিত কথাটা মিলে না। তবুও হাক্স্‌লির মত একজন বড় বৈজ্ঞানিকের কথায় অবিশ্বাস করা শক্ত। মস্তিষ্কের মধ্যে বৃত্তিগুলির যার যার ঘর স্থির করিয়া দেওয়া হয়ত সত্যই সম্ভব নয়; মস্তিষ্কের এই জায়গাটা দিয়া লোকে সতর্ক থাকে, আর এই জায়গাটা দিয়া গান ভালবাসে, এরকম বলা চলে না। কিন্তু হাক্স্‌লির কথাই সত্য কি শির-তত্ত্ববিদ্‌দের কথাই সত্য, এই তর্ক না তুলিলেও একথা অবিশ্বাস করার উপায় নাই যে, একই কাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া করিলে ক্রমে মস্তিষ্ক, বা তাহার বিশেষ কোন অংশ, শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কথাটা শিক্ষককেও মনে না রাখিলে চলিবে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া অঙ্ক কষার পর শিশুর মাথা গুলাইয়া যায়, অঙ্ক আর মেলে না। তখন শ্লেট রাখিয়া দিয়া ইতিহাস পড়িতে বল, দেখিবে তাহার মাথা আবার বেশ খেলিতেছে। অঙ্ক কষার সময় তাহার কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয় না; সে শক্তিটা তাহার ঘুমন্তই ছিল। ইতিহাস পড়ার সময় সেই ঘুমন্ত কল্পনাশক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার কল্পনা পরিশ্রান্ত নয়; অতএব ইতিহাস পড়িতে তাহার কষ্ট হইল না। শিশুর মন যাহাতে একই কাজ লইয়া অনেকক্ষণ না খাটে, একরকমের কাজ খানিকক্ষণ করিয়া আবার আর এক রকমের কাজে চলিয়া যাইতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই স্কুলের 'রুটিন' তৈরি করা হয়। বাড়ীতে পড়ার 'রুটিন' করার সময় এই দিকে অনেক সময়ই হিসাব করা হয় না। এই জন্যই বাড়ীর পড়ায় শিশু

বৈচিত্র্য কম পায়, স্কুলের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

পুষ্টি—

মস্তিষ্কের ক্ষতি যদি যথাযথরূপ পূরণ না হয়, তবে মস্তিষ্ক কাজ করিতে পারে না। কাজ করিতে মস্তিষ্কের ক্ষয় হয় ঠিকই। এক ভদ্রলোক একবার একটা হিসাব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বিশেষ কোন একটা কাজে কতটা মস্তিষ্ক ব্যয় হয়—'প্যারাডাইস্ লষ্ট' খানা লিখিতে কয় আউন্স ঘিলু খরচ হইয়াছিল, ঐ রকম আর কোন একখানা বই লিখিতেই বা কতটা ঘিলু লাগিয়াছিল, ইত্যাদি। এ-রকমের অদ্ভুত হিসাবের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; তবু একথাটা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, বুদ্ধি খেলাইবার যে কোন প্রকার কাজের ফলেই মস্তিষ্কের খানিকটা পদার্থ ক্ষয় হইবে। মস্তিষ্কের সর্ব্বত্র অগণিত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা ছড়াইয়া আছে; এই শিরা বহিয়া বহুল পরিমাণ রক্ত সর্ব্বদা মস্তিষ্কের মধ্যে চলাচল করে, এবং সেই ক্ষতিকে পূরণ করিয়া তোলে। এই রক্তের প্রকার ও পরিমাণের উপরই নির্ভর করে মস্তিষ্কের ক্ষয় ঠিক পূরণ হইতেছে কি না, মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ ও সতেজ থাকিতে পারিতেছে কিনা।

রক্তের প্রকার স্থির কি ভাবে হয়—

রক্তটার কি প্রকার হইবে সেটা ঠিক হয় কয়েকটা বস্তু দিয়া।

খাদ্য জীর্ণ হইয়া ক্রমে রক্তে পরিণত হয়। খাদ্য যত পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য হইবে, রক্তের মধ্যে ততই বেশী তেজ ও গুণ দেখা যাইবে। শরীরের যা দৈনন্দিন অপচয় হয় তাহার মধ্যে বহু প্রকারের কোষ থাকে; এই সকল-প্রকার কোষই নূতন করিয়া গড়িয়া ওটা দরকার, তাই খাদ্য

শুধু এক রকমের জিনিষ না হইয়া বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ মিশাইয়া হওয়া চাই। শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় করিতে শিশুর জুড়ি নাই। কাজ কর্ম্মের জন্য যেটুকু দরকার তারচেয়ে ঢের বেশী শরীরের ক্ষয় তাহারা করে, অকারণ ছুটাছুটি লাফালাফি করিয়া, অবিশ্রান্ত হাত পা চালাইয়া। সুস্থির বসিয়া থাকা তাহাদের নিয়ম নাই; এবং নড়াচড়া ছট্‌ফট্ করার অর্থই দেহের ক্ষয়। এই ক্ষয় হয়ত বিশেষ করিয়া চক্ষে পড়ে না; কিন্তু তবুও এটা ক্ষয়ই। অবশ্য এই ক্ষয় শুধুই লোকসান নয়; নড়াচড়ার ফলে তাহাদের ব্যায়াম হয়, কাজের ক্ষমতা বাড়ে; এবং এই লাভে দৈহিক ক্ষয়ের প্রায় সমস্তটাই উশুল হইয়া যায়। তবু সেই ক্ষয়ের জন্য দেহের যে শক্তি হ্রাস হইল তাহার ত পূরণ করিতে হইবে।

বয়স্ক লোকের তুলনায় শিশুর দেহই শুধু বেশী চলে না, তাহাদের মস্তিষ্কও বেশী নড়াচড়া করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন তাহার দেহের ওজনের চল্লিশভাগের একভাগ মাত্র; বরং ইহার কম, তবু বেশী নয়। অথচ তাহার শরীরে মোট যা রক্ত আছে তাহার পাঁচভাগের একভাগ হইতে ছ'ভাগের একভাগ রক্ত ব্যস্ত থাকে শুধু তাহার মস্তিষ্ককেই তাজা রাখিতে। শিশুর বেলায় এই অঙ্ক আরও বেশী; আরও বেশী রক্ত লাগে তাহার মস্তিষ্ককে তাজা রাখিতে। তাহার কতটা খাদ্য লাগিবার কথা তাহা একবার ভাবুন। আর ইহারও উপরে আরও বড় একটা কথা ত রহিয়াই গিয়াছে— শিশুকে খালি টিকিয়া থাকিলে হইবে না; বাড়িতেও হইবে। বাড়িবার অর্থ নূতন কোষ সৃষ্টি। তাই তাহার খাদ্য প্রচুর ও পুষ্টিকর হওয়া দরকার। খাদ্য শুধু দেহের ক্ষয়ই পূরণ করিবে না; দেহের ও মস্তিষ্কের নূতন কোষ সৃষ্টির সংস্থানও করিবে।

খাবার ও খাওয়া—

অতএব শিশুর খাওয়ার সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। যত কৃশকায় নির্জীব লোক আমরা দেখি তাহার অর্দ্ধেকের বেশী লোকের এই দশা হইয়াছে শিশুকালে যথেষ্ট আহার তাহারা পায় নাই বলিয়া। অধিকাংশ স্থলেই আবার ইহার মূলে থাকে মনোযোগের অভাব। সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়াই যে পিতামাতা সন্তানদেরে যথেষ্ট পরিমাণ খাইতে দেন না, সব সময়ে তাহা নয়। অনেক সময়েই তাঁহারা একথাটা খেয়ালই করেন না। তাই ঘরে ভাত থাকিয়াও শিশু না খাইয়া রোগা হয়। বেশীর ভাগ সুনিয়ন্ত্রিত গৃহস্থালীতেই দেখা যায় খাওয়ার একটা বেশ বাঁধা সময় ও নিয়ম আছে। এই নিয়ম ভাঙ্গা খুবই অনুচিত। মোটামুটি বলা যায়, সকালে উঠিয়া কিছু লঘু খাদ্য; তারপর তিন চার ঘণ্টা পরে একবার পেট ভরিয়া খাওয়া; বিকালে একবার জলযোগ; রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে লঘু অথচ পুষ্টিকর শেষবারের খাওয়া। এই চারবারের মধ্যে সাধারণতঃ কিছু মাছ, অন্ততঃ একবার মাংস অথবা ডিম—এই রকমের একটা খাদ্যতালিকা থাকিলেই চলিয়া যায়।

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের শরীর পুষ্ট করে, যে খাদ্যটুকু খাই তাহা নহে, যে-টুকু খাদ্য আমরা হজম করিতে পারি সেইটুকু। হজম করা সম্ভব নয় এমন প্রকারের বা পরিমাণের খাদ্য কেবল উদরস্থ করিলেই লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়।

এই সম্পর্কে অনেকগুলি কথাই আসিয়া পড়ে, মোটামুটি দুই চারটা কথার আলোচনাই এখানে করিব। এটা সকলেই মানেন, শিশুদের পক্ষে অতিরিক্ত গুরুপাক পিঠা, মাংস বা বেশী মসলা-দেওয়া খাদ্য না খাওয়াই ভাল। অতিরিক্ত লঙ্কা, ঝাল বা সরিষা জাতীয় জিনিষও তাহাদের দিতে নাই। নূতন চাল বা গম প্রভৃতিও না দেওয়া উচিত।

অল্প গরম দুধ তাহাদের পক্ষে চমৎকার খাদ্য। তাহাদের শিখাইতে হইবে, খাওয়া সারিয়া তবেই তাহারা জল বা দুধ খাইবে, খাওয়ার মধ্যে নয়। সকাল বেলায় কিংবা বিকালে কিছু তাজা ফল খাওয়া উচিত। রাত্রে শুইবার সময় এক গ্লাস ও ভোরে উঠিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া খুব উপকারী।

খাইতে বসিয়া গল্প করা—

খাদ্যের রকম সম্বন্ধে এমন বহু কথাই বলা যায়। কিন্তু একটা কথা আবার বলিতেছি, খাদ্য গিলিলেই হয় না, খাদ্য হজম করিতে হইবে, তবেই দেহের পুষ্টি। খাওয়ার সময় মনের যে অবস্থা থাকে তাহার উপর অনেক অংশেই হজমের ব্যাপারটা নির্ভর করে। মুখ ও পাকস্থলী হইতে কতগুলি জারক রস বাহির হইয়া খাদ্যকে জীর্ণ করে। এই রস ভাল করিয়া বাহির হয়, যখন আমাদের মনটাতে বেশ স্ফূর্তি থাকে। শিশুর যদি খাইতে ভাল না লাগে, তবে সে চক্ষু বুজিয়া গিলিয়া যায়। সে খাদ্য হজম হওয়া শক্ত। খাওয়ার সময় যদি একটু কথা বা একটু হাসি দিয়া মনটাকে হাল্কা না রাখা যায়, চুপচাপ বসিয়া যদি তাহাকে গম্ভীর মুখে কেবলি খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে হয়, তবে সেই খাওয়ার ফল অনেকখানিই সে পায় না। কাজেই খাওয়ার সময় যাহাতে শিশুর মনটা প্রসন্ন থাকে, সে বেশ আনন্দের সঙ্গে খাইতে পারে, সেইদিকে নজর রাখিতে হয়। সেটা মোটেই অযথা তাহাকে আদর দেওয়া নয়. সেটা সত্যই দরকারী। অবশ্য তাই বলিয়া খাওয়ার সময় খুব খানিকটা হৈ-চৈ করাও হজমের পক্ষে ভাল নয়, কারণ তাহাতে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, খাওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে না। মোটের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন খাওয়ার সময়টা বেশ স্ফূর্তিতে

কাটে, মনটা প্রসন্ন রাখিয়া যেন শিশু খাইতে পায়। সাধারণতঃ বাবা-মার সঙ্গে একত্রে বসিয়াই শিশুকে খাইতে শিখানো উচিত। তাহা হইলে বাবা-মার দেখাদেখি সেও ঠিক মত খাইতে শিখিতে পারে, সে কি খাইতেছে বা খাইতেছে না, সেদিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতে পারেন এবং ভাল রকম চিবাইয়া খাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাওয়া প্রভৃতি যাহাতে তাহার অভ্যাস হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে পারেন। তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উপকার হয়, ভদ্রতা এবং ভব্যতাও শেখা হয়।

খাদ্য বৈচিত্র্য—

শিশুদেরে ভাল খাদ্য দিতে হইবে এবং শান্তিতে খাইতে দিতে হইবে। তার উপর, তাহাদের খাদ্য অনাড়ম্বর হইবে; কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য থাকা চাই। ধরাবাঁধা এক রকমের খাদ্য রোজ রোজ তাহাকে দেওয়া উচিত নয়। সে খাদ্যের হয়ত পুষ্টিকারিতা আছে, তবু তাহার তাহা ভাল লাগিবে না; একঘেয়ে লাগিলেই সে-খাদ্য খাইয়া সে আরাম পাইবে না, তাহার হজম কম হইবে, পুষ্টিও কম হইবে। এইখানে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তিনি সব সময়েই লক্ষ্য রাখিবেন, যেন খাবারটা কখনই একঘেয়ে হইয়া না উঠে। কতগুলি বস্তু অবশ্য তাহাকে খাইতেই হইবে। তবু তাহার মধ্যেও বৈচিত্র্য রাখা দরকার। নিত্য নূতন খাদ্য দিলে তাহাদের 'জিভ বাড়িয়া যাইবে', এমন আশঙ্কা করার কারণ নাই। যাহারা পেট-ভরা খাবার পায়, তাহারা হ্যাংলা হয় না। হ্যাংলা হয় সেই ছেলেরাই, যাহারা খাদ্যের অভাবে বা খাদ্যে বৈচিত্র্যের অভাবে দেহে ও মনে শুকাইয়া থাকে; খাদ্য ভাল হইলেই বরং তাহাদের স্বভাব ভাল থাকিবে।

খাদ্যের মতই বাতাসও প্রয়োজন—

রক্ত তাজা রাখিবার জন্য ভাল খাদ্য যেমন দরকার, ভাল বায়ুও তেমনি দরকার। প্রতি দুই হইতে তিন মিনিটের মধ্যে শরীরের সমস্তটা রক্ত একবার করিয়া ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া যায়। শ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু আমরা লইয়া থাকি ফুস্‌ফুসের মধ্যে রক্তের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। বায়ুর ভিতরে যে অক্সিজেন আছে তাহা সেই রক্তের ময়লা সমস্ত পুড়াইয়া সাফ করিয়া দেয়। রক্তটা ফুস্‌ফুসে যখন ঢোকে তখন সে কালো ময়লায় ভরা এবং শরীরকে সুস্থ রাখিবার অযোগ্য থাকে। যখন বাহির হইয়া যায় তখন সে আবার টুকটুকে লাল ও তাজা হইয়া গিয়াছে।

রক্ত এইরকম পরিষ্কার হইতে পারে না, যদি শ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু লওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন না থাকে। নিঃশ্বাসে, আগুনের শিখায় এবং আরও অনেক প্রকারে বাতাসের অক্সিজেন নষ্ট হয়। এইজন্যই ছেলেদের প্রত্যহ অনেকটা সময় বাড়ীর বাহিরে খোলা জায়গায় বেড়াইতে ও খেলিতে দেওয়া দরকার; সেখানে তাহারা প্রচুর পরিমাণে অঙ্গচালনা করিতে পারিবে এবং প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু পাইবে।

ছেলেরা রোজ বেড়ায়—

অনেকে বলেন, "ছেলেরা রোজই বেড়ায়, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দিনে অন্ততঃ একঘণ্টা করিয়া তাহারা বেড়ায়ই।" মোটেই না-বাহির হওয়ার চেয়ে অবশ্য অল্পক্ষণ বেড়ানোও ভালো; যেমন, কিছুই না খাওয়ার চেয়ে একপয়সার ঘুঘ্‌নিদানা খাওয়াও ভাল। কিন্তু পরিপূর্ণ ক্ষুধার সময় এক পয়সার ঘুঘ্‌নিদানা যেমন শিশুর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তেমনি দিনে একঘণ্টা নিয়মিত বেড়ানোও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেন, শুধু হাওয়া খাইয়াই ত আর বাঁচিবে না?

তবে আর এত বেশী হাওয়ার দরকার কি? শুধু হাওয়া খাইয়া বাঁচা যায় না সত্য; কিন্তু খাদ্য, জল ও হাওয়া— এই তিনটার মধ্যে যদি একটাকে মাত্র বাছিয়া লইতে হয়, তবে হাওয়াকেই আমরা বাছিয়া লইব। অন্য দুইটা ছাড়া কিছুক্ষণ বা কিছুদিন তবু বাঁচা যায়, হাওয়া ছাড়া পাঁচ মিনিটও বাঁচা যায় না। কথাটা আমরা জানি, ইহা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। বই পড়িতে পড়িতে 'অক্সিজেন' কথাটা দেখিলেই আমাদের চক্ষু হয়ত অভ্যাস বশেই সে পাতাটা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়— ও ত জানা কথাই, নূতন করিয়া শুনিবার আর কিছু উহাতে নাই। এখন আর 'দেহের উপর বায়ুর কার্য্য কি'— কি রকম করিয়া বায়ু ফুসফুসের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার সমস্ত নালীপ্রণালীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, সেইখানে রক্তের সঙ্গে তাহার দেখা হয়, রক্তের ময়লাটাকে সে পুড়াইয়া দেয়, রক্ত আবার তাজা টকটকে হইয়া ফুসফুস্ হইতে দেহের সর্ব্বত্র চলিয়া যায়— এসব কথা ছেলেদের শিখাইতে হয় না। বায়ুর মধ্যে কোন্ বস্তুটা এই অদ্ভুত ভেল্‌কি ঘটায় তাহারও নাম আমরা জানি— তাহার নাম অক্সিজেন। মিনিটে ক'বার করিয়া আমরা শ্বাস টানি, কতখানি অক্সিজেন আমাদের দরকার হয়— সব খবর আমাদের একেবারে কণ্ঠস্থ।

কিন্তু সে সংবাদ কণ্ঠস্থই থাকে। পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া ছেলে পুরা নম্বর পাইয়া আসে। কাজের বেলায় দেখা যায়, তাহার কণ্ঠের হাড় দিন দিন উঁচুই হইয়া উঠিতেছে।

অক্সিজেনের সীমা—

আমরা অনেক কিছুরই সংবাদ রাখি, কিন্তু এ সংবাদ আমাদের জানা নাই যে সেই অক্সিজেন পৃথিবীতে অফুরন্ত নাই। বাতাসে শতকরা

বড়জোর তেইশ ভাগ অক্সিজেন থাকে। আগুন জ্বলিতে, বাতি জ্বলিতে, নিঃশ্বাস ফেলিতে, সেই অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বাতাসটাও বদ্ধ; এবং নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে, কিংবা আগুন জ্বালিয়া তাহার অক্সিজেনটুকু আমরা শেষ করিতেছি। বড় বড় শহরে কি হয়? অগণিত লোকের এবং জীবজন্তুর বাস; অগণিত কলকারখানার আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। তারপর? ফলটা বোঝা শক্ত নয়। মানুষ পুরা স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তি লইয়া থাকিতে পারে তখনই যখন তাহার দেহের মধ্যে কোন গ্লানি জন্মিতেছে না, অর্থাৎ, যখন শ্বাসের সঙ্গে সে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু টানিতে পারিতেছে, অক্সিজেন পাইতেছে। শহরের বায়ুতে সেই অক্সিজেনের অভাব ঘটে। এইজন্যই খোলা হাওয়ায় যাহারা জীবন কাটায় তাহাদের তুলনায় ঘিঞ্জিতে যাহারা বাস করে তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অনেক কম। এই জন্যই বড় বড় শহরে যাহারা আজীবন বাস করে তাহাদের আকৃতি ছোট হয়, বুক কম চওড়া হয়, আয়ু কম হয়। শীত, রৌদ্র, বৃষ্টির হাতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘরের দরকার আছে, মানি। কিন্তু যতটা স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব তাহা আমরা পাইব তখনই, যখন বুঝিব, ঘর শুধুই আশ্রয়ের স্থল, বিশ্রামের স্থল নয়। 'ঘরে কত বেশীক্ষণ থাকিতে পারি' সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঘরে নরম আসন ও শয্যা বসাইয়া লাভ নাই; তারচেয়ে বরং ঘরে কত বেশীক্ষণ না-থাকিয়া পারি, এই কথাটি মনে রাখিয়া যেন যথাসম্ভব সময় বাহিরে কাটাই। তাহাতেই স্বাস্থ্য, তাহাতেই স্বাচ্ছন্দ্য।

বদ্ধ বায়ু—

পাংশুমুখ, রক্তহীন, স্বাস্থ্যহীন, 'শহুরে' ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা এই কথাটা যেন ভাবিয়া দেখেন। একটু লক্ষ্য করিলেই তাঁহারা দেখিতে

পাইবেন, তাহাদের ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল স্বাস্থ্য হয় গরীব ভিক্ষুকের ছেলেদের। তাহারা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া বাঁচে, তবু তাহাদের স্বাস্থ্য সযত্নে পালিত ভদ্রলোকদের ছেলেদের চেয়ে ভাল। ইহার একমাত্র কারণ, তাহারা খোলা হাওয়ায় দিন কাটায়। শহরেরও খোলা রাস্তায়ই যা-হোক একটু হাওয়া খেলে। যে-শিশু সারাক্ষণ একটা মস্ত বড় ঘরের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় কাটাইতেছে, তাহার তুলনায় বেশী হাওয়া পায় সেই ছেলেটা যে পথে ঘুরিয়া কাটাইতেছে। অবশ্য শিশুর পক্ষে শহরের রাস্তার কদর্য্য বায়ুই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ বস্তু নয়, তাহার জন্য দরকার খোলা হাওয়া—গ্রামের হাওয়া।

বয়স্কের তুলনায় শিশুর দেহের ক্ষয় বেশী। তাহার সারাক্ষণ ছুটাপাটি, সারাক্ষণ নূতন নূতন চিন্তা। এজন্য তাহার দেহের ক্ষয় হয় বেশী; ক্ষতি-পূরণও দরকার হয় বেশী; এবং, সকলের উপরে, তাহার দেহ ও মস্তিষ্ককে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য দেহের মধ্যে নূতন কোষ ও শক্তির সঞ্চয় করিতে হয় বেশী। এই সঞ্চয় আসিবে কোথা হইতে, যদি সে প্রচুর পরিমাণে খোলা হাওয়া না পায়?

'খাওয়াই ত, তবু—'

"খুকীকে কত যে খাওয়াইতেছি—মাংস, দুধ, কড্‌লিভার অয়েল, তাহার আর হিসাব নাই; তবু একটুও ওজন বাড়িতেছে না।"

দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ওজন বাড়ে না কেন, ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দেখুন, সম্ভবতঃ খুকী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই কাটাইতেছে ঘরের মধ্যে, বদ্ধ বায়ুতে। আপনি তাহাকে ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী দিতে পারেন, কিন্তু তবু তাহার দেহ রহিয়াছে উপবাসে।

হাওয়ার অভাবে তাহার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে না; তাহার দেহে তাজা রক্ত তৈরি হইতেছে না। কড্‌লিভার অয়েলে তাহার কি করিবে? আর দেহের উপবাসই যদি তাহার এতখানি হয়, মনের অবস্থা কি? শিশুর মনের উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষুধা, বয়স্কের চেয়ে বেশী। তাহাকে মনের খাদ্য আপনি কি দিতেছেন? আপনি হয়ত বলিবেন, 'দিতেছিইত; রোজইত পড়া করে।'

হয়ত করে। কিন্তু সে পড়ার অর্থ ত শুধুই কথা মুখস্থ করা; কতগুলি বস্তুর নাম-ধামই বসিয়া তাহাকে গিলাইতেছেন; তাহার পক্ষে যা সত্যকার প্রয়োজন তাহা তাহাকে দিতেছেন কি? শিশুর পক্ষে দরকার ভাষাজ্ঞান ততটা নয়, যতটা বস্তুর জ্ঞান; যেখানকার যে জিনিষ সেইখানে সেটা দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা। ঈশ্বরের সৃষ্টি বিচিত্র, এই সৃষ্টিকে চক্ষে দেখিয়া মনে রাখিতে হয়, নাম শুনিয়া চিনিলে হয় না। শিশুকে নাম মুখস্থ করাইলে হইবে না। তাহাকে লইয়া বাহিরে বেড়ান, তাহাকে জিনিষ, জন্তু, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, দেখাইয়া দেখাইয়া চিনাইয়া দিন। তাহার জ্ঞানও বাড়িবে, স্বাস্থ্যও বাড়িবে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ তার 'লুসি'র সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

'রোদ-বৃষ্টি পেয়ে সে তিন বছরের হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন প্রকৃতি বল্লেন "পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর ফুল আর জন্মেনি, আমি নিজের কাছে এই শিশুকে নেবো, সে আমার হবে এবং আমি তাকে আমারই প্রেয়সী করে নেবো। মৃগ-শিশু যেমন আনন্দে মত্ত হয়ে মাঠের বা পাহাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, সেও তেমনি ক্রীড়ামোদী হবে; প্রকৃতির সুগন্ধ বায়ু হবে তার নিঃশ্বাস, এবং যত সব মূক, অচেতন বস্তুর নীরব প্রশান্তিই যোগাবে তার প্রেরণা। দুপুর রাতের তারাগুলি হবে তার প্রিয় এবং যেখানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নেচে নেচে চঞ্চল গতিতে বয়ে যায়,

তার নিভৃত অঞ্চলে সে কান পেতে শুনবে, এবং কুলু কুলু ধ্বনি থেকে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তা-ই তার মুখের উপর ফুটে উঠবে।”

ঘরের বাহিরে খেলা ও বেড়ানো লইয়া পুরাপুরি আলোচনা পরে করিব। এখানে আর একটা কথা বলিয়া নেওয়া দরকার। ঘরের বাহিরে যেমন মুক্ত বায়ু খুঁজিতে যাইব, ঘরের ভিতরের বায়ুও তেমনি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই যদি বদ্ধ বায়ুতে কাটাইতে হয়, তবে খানিকটা করিয়া মাত্র সময় মাঠে বেড়াইলেও কাজ হইবে না। ঘরের মধ্যে আটকা হাওয়ায় আলো জ্বলিতেছে, হয়ত আগুন জ্বলিতেছে—সে বায়ুটুকু দূষিত হইয়া উঠিতে কতক্ষণ? যদি সেই দূষিত বায়ু হইতেই সারাক্ষণ রক্তের খাদ্য যোগাড় করিতে হয়, রক্ত বিষাক্ত হইয়া না উঠিয়াই পারে না। সব চেয়ে বড় বিপদের কথা, ঘরের বদ্ধ বায়ুতে থাকিতে থাকিতে ক্রমে সেটা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন আর তাহার ক্ষতিটা আমরা খেয়াল করি না। খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র ভয়ানক গরম লাগে। কিছুক্ষণ বসিবার পর আর লাগে না। তখন আর টের পাই না, ঘরের বায়ু সেই-রকমই আবদ্ধ ও অপরিষ্কার আছে। এই টের না পাওয়াটাই খারাপ, ইহার ফলেই আমরা বিপদ্ সম্বন্ধে সাবধান হই না।

ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা—

আমরা টের পাই বা না পাই ঘরের বায়ু ঠিকই দূষিত হইতেছে। তাই ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ছাতের ঠিক নীচেই খানিকটা ফাঁক যদি থাকে তবেই ঘরের দূষিত বায়ুটা বাহির হইয়া যাইতে পারে। দূষিত বায়ু হাল্কা, সেটা উপরে উঠিয়া যায়, তাই তাহার বাহির হইয়া যাইবার জন্য ছাতের গায়ে পথ থাকা ভাল। ‘স্কাইলাইট্’

বা চিম্‌নিতেও কাজ চলে। শুইবার সময় চিম্‌নি, 'স্কাইলাইট্' বা ঘুলঘুলি বন্ধ করিয়া শোওয়া অত্যন্ত খারাপ। শীতকালেও জানালার খানিকটা খুলিয়া শুইতে শিশুকে শিখাইবেন। শীত লাগিলে গায়েই যেন সে কাপড় জড়ায়, জানালা যেন বন্ধ না করে।

রাত্রির বাতাস—

অনেকের ধারণা, রাত্রির বাতাসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, কথাটা সত্য বা সম্ভব নয়। 'ভাল' বাতাসের অর্থ, বাতাসে অক্সিজেন বেশি এবং (অক্সিজেন্ পুড়িয়া তৈরি) 'কার্বন ডায়ক্সাইড্' কম। রাত্রে কলকারখানা-উনান-বাতির আগুন অনেক কম জ্বলে। ফলে রাত্রের বাতাসের অক্সিজেন পুড়িয়া যায় অনেক কম। এই জন্যই রাত্রের বাতাসকে ভয় করার কারণ নাই। ছেলেরা সাধারণত যে ঘরে সারাদিন কাটায়, প্রতি রাত্রে সেই ঘরের জানালা-দরজাগুলি খানিকক্ষণের জন্য সব খুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ঘরের সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইয়া নূতন বাতাসে ঘর ভরিয়া যাইবে, ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা হইবে এবং পরদিন শিশুরা আসিয়া ঘরে আগের দিনের দূষিত জমাট্ হাওয়ার বদলে নূতন তাজা হাওয়া পাইবে।

রৌদ্র—

পূর্ণ স্বাস্থ্য পাইবার পক্ষে কেবল খাদ্য ও বাতাসই যথেষ্ট নয়, রৌদ্রও দরকার। ভাল সতেজ রক্তের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল বিন্দুর মত বস্তু থাকে। ইহাকে বলে লাল-রক্ত-কণিকা। রক্ত হইতেই এইগুলির সৃষ্টি। দেখা গিয়াছে যাহারা রৌদ্রে বেশিক্ষণ কাটায় তাহাদের মুখে চোখে লাল আভা থাকে। আর যাহারা বন্ধ হাওয়ায় অন্ধকার ঘুপচির

মধ্যে দিন কাটায় তাহাদের গায়ের রঙ্ সাদা ফ্যাকাশে হয়। ইহা হইতে আন্দাজ করা যায়, রৌদ্রের সহিত রক্ত কণিকার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। অতএব লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শিশুদের ঘরে যেন প্রচুর রৌদ্র আসিতে পায়। সেটা দেখার ভার মায়ের উপর, কারণ কে কোন্ ঘরে থাকিবে সে ব্যবস্থা যিনি বাড়ীর গৃহিণী তিনিই করেন। বাড়ীর যে দিক্‌টাতে ভাল রৌদ্র পড়ে সেইদিকে হইবে ছেলেদের ঘর। যথাসম্ভব দক্ষিণ খোলা রাখিতে হয়। তাহাতে আলো, রৌদ্র ও বায়ু তিনটাই ভাল পাওয়া যায়। বাড়িটাতে যথাসম্ভব আলো-বাতাস যাহাতে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছেলেদের ঘরে রৌদ্র আসিতে বাধা পায় এমন গাছপালা যদি ঘরের কাছে থাকে, বিনা দ্বিধায়, বিনা চিন্তায় সে গাছপালা কাটিয়া উচ্ছেদ করিতে হইবে।

ঘাম—

আর একটা লক্ষ্য রাখিবার বস্তু হইল ঘাম। শরীরের ও মস্তিষ্কের মৃত অংশ ও কোষগুলি রক্তের সঙ্গে মিশিয়া চলিয়া আসে। রক্ত সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার পরিষ্কার হয়। এই ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা পথ ঘামের মধ্যদিয়া; ঘামের সঙ্গে এগুলি শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। শরীরের চর্ম্মে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রগুলি শরীরের মধ্যেকার সরু সরু নলের মুখ। এই নল বহিয়া ময়লা আসে, ঘামের আকারে ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। শরীর ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখিতে হইলে পরিষ্কার তাজা রক্ত দরকার, আগেই বলিয়াছি; এবং রক্ত পরিষ্কার ও তাজা রাখিতে চাহিলেই দেখিতে হইবে, যেন শরীরের ঘাম ঠিকমত বাহির হইতে পারে।

অজ্ঞাতসারেও আমরা ঘামি—

ঘাম যখন প্রচুর পরিমাণে বাহির হয় তখন চামড়া ভিজিয়া যায়। সেটা আমরা টের পাই। কিন্তু আমরা টের পাইতেছি না এমন অবস্থাতেও অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে ঘাম সব সময়েই শরীর হইতে বাহির হইতেছে। এই ঘাম বাহির হওয়ার পথ যদি কোন রকমে বন্ধ হইয়া যায়, কোন রকমে যদি চামড়ার উপরে এমন কোন আচ্ছাদন পড়ে যে চামড়ার ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়, তবে শরীরের খুবই অনিষ্ট হয়, এমন কি মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। শরীরের অনেকখানি জায়গা পুড়িয়া যাওয়ার ফলে যে মৃত্যু হয়, তাহা অনেক সময়ে এই কারণে। আগুনে হয়ত শুধু চামড়াটাই ঝলসাইয়া গিয়াছে, শরীরের মধ্যেকার কোন যন্ত্র আহত হয় নাই। কিন্তু সেই ঝলসানোর ফলে চামড়ার উপরটা লেপ্‌টাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, ঘাম বাহির হইবার নলের মুখগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে রক্তের সঞ্চিত দূষিত পদার্থগুলি ঠিকমত শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। অন্যান্য অঙ্গ, যেখানে চামড়া পুড়ে নাই, সেখানকার চামড়া অবশ্য নিজে হইতেই বেশি পরিমাণে ঘাম বাহির করিয়া কিছুটা সাম্‌লাইয়া নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে কুলায় না; কারণ সেখানকার নলদিয়া যতটুকু ময়লা বাহির হওয়া সম্ভব, তাহার একটা সীমা আছে। সঞ্চিত দূষিত পদার্থগুলি শরীরের মধ্যেই পচিতে থাকে এবং ক্রমে সমস্ত শরীরটাকেই পচাইয়া তোলে। তখন আর শরীরের কোন যন্ত্রই সুস্থ থাকে না; রোগীর মৃত্যু হয়। এই জন্যই চামড়ার ছিদ্র কোন সময়েই কোন কারণে বন্ধ না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; না রাখিলে দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ থাকিবে না।

স্নান ও পরিচ্ছদ—

এইখানে দুইটি কথা আসে, একটি স্নান। প্রত্যহ স্নান করা এবং বেশ রগড়াইয়া চামড়াটাকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা কতখানি তাহা আর ইহার পরে বেশি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

কিন্তু আর একটা কথা অনেকের মনে স্পষ্ট নয়, সেটা পরিচ্ছদের কথা। শিশুকে যতক্ষণ সম্ভব খালি গায়েই রাখা ভাল। পোষাক যদি পরাইতে হয়, তবে ছিদ্র-বহুল বা ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা কাপড় পরাইতে হইবে। অনেকে বলিবেন, তা কেন? কিন্তু ইহার কারণ বোঝা কি এতই শক্ত? ফাঁক-বুনট্ কাপড়ের মধ্য দিয়া হাওয়া চলিতে পারে, চামড়ার উপরের ঘামটা সেই হাওয়ায় শুকাইয়া যায়, জমিয়া চামড়ার ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলিতে পারে না। আগেকার দিনে ইংলণ্ডের সৌখীন মেয়েরা কথায় কথায় মূর্চ্ছিত হইতেন। গির্জ্জায় বসিয়া উপাসনা করিতে করিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সে মূর্চ্ছা কেন হইত জানেন? পরিচ্ছদের দোষে। তখনকার রীতি ছিল, মেয়েরা 'সীল' মাছের চামড়ার কোট পরিতেন। চামড়ার ছিদ্র দিয়া বাতাস চলিত না, তাই কোটের মধ্যে তাঁহারা গুমট গরমে হাঁপাইয়া উঠিতেন। ঘাম বন্ধ হইয়া তাঁহাদের স্নায়ু-কেন্দ্র আক্রান্ত হইত, তার ফলে হইত মূর্চ্ছা। পালকের বা রেশমি কাপড়ের লেপ গায়ে দিয়া শুইলে সকালবেলায় উঠিয়াও মনে হয় যেন বিশ্রাম পূর্ণ হয় নাই, তখনও ক্লান্তি লাগিতেছে। ইহারও কারণ ঐ—পালক ও রেশমের মধ্য দিয়া বাতাস ভাল চলে না। শুধু পরিচ্ছদের দোষে কত লোক যে অস্বাস্থ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে ভোগে তাহার হিসাব শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

শিশুকে ঠিকমত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতে হইলে তাহার মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যবিধি লইয়া আরও অনেক কথাই বলা যাইত, কিন্তু দুই চারটি কথা বলাই যথেষ্ট। সেই কয়টি কথা মনে রাখিলেই স্বাস্থ্যনীতির নিয়ম-ভাঙাটাকে আইন-ভাঙার মতই দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া মনে হইবে; আইনের মতই সেই নীতি পিতামাতা পালন করিয়া চলিবেন।

পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন আমি শারীরিক কতগুলি ব্যাপার লইয়াই বেশীরভাগ কথা বলিতেছি; সেগুলি ত শিক্ষাতত্ত্বের একেবারে প্রথম-পাঠ মাত্র। প্রথম পাঠ, সত্যই। কিন্তু প্রথম পাঠ বলিয়াই এগুলি শিক্ষাতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা, সমস্ত তত্ত্বের মূল ভিত্তি। বুদ্ধি, নীতি জ্ঞান, এমন কি ধর্ম্মজ্ঞান পর্য্যন্ত শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের উপর অনেক অংশে নির্ভর করে, ইহা বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। একথার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে শারীরিক শক্তি থাকিলেই সেই লোক বুদ্ধি, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানে অতি মহান্ হইবে; ইহার অর্থ, বুদ্ধিমান্, নৈতিক ও ধার্ম্মিক চরিত্রশালী ব্যক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নৈতিক দৃঢ়তা, ধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে যে অতিরিক্ত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার ক্ষয় পূরণ হইবে কি করিয়া, যদি তাঁহার দেহ সুস্থ না থাকে? মানুষের সঙ্গে মধুর সরল ব্যবহার করার পক্ষে কোন্ অবস্থাটা সুবিধার, মাথা যখন ধরিয়া থাকে তখন, না মাথায় যখন উদ্বেগ নাই তখন, এটা বোঝা কি এতই শক্ত?

৬। শিক্ষায় 'আইনের শাসন'

কাণ্ডজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি—

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা মস্তিষ্কের শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। কিন্তু ইহা হইতেই শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধেও ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। রীতি-মত নিয়ম মানিয়া সুশৃঙ্খলরূপে মস্তিষ্ককে শিক্ষিত করিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার ফলে শিশুর উৎকর্ষলাভ আশানুরূপ হয় না। ইহার কারণ পিতামাতা তাহাকে ঠিক যতটা দরকার ততটা নিয়ন্ত্রিত করেন না; তাহার নিজের কাণ্ডজ্ঞান ও শুভবুদ্ধির উপরই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। অথচ সেই কাণ্ডজ্ঞানকেও যথারীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া জাগ্রত করিতে হয়; শুভবুদ্ধি জাগাইবার জন্য যে চেতনার আবশ্যক তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বাহির হইতে শিখিতে হয়, জীবনের মধ্য হইতে তাহাকে বাছিয়া নিতে হয়। সেই নীতি বাছিয়া নিতে শিশুকে শিখাইবে কে, যদি পিতামাতাই না শিখান?

'ধার্ম্মিক লোকের চেয়ে অনেক সময় আইন-ভীরু লোকই মহত্তর জীবনযাপন করে'—

ঈশ্বরে ও তাঁহার নীতিতে অনেকে বিশ্বাস করেন। আজকাল অনেকে আবার বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু জানেন না, বোঝেন না, তাই বিশ্বাসও করেন না। অথচ ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁহারা নিষ্কলঙ্ক, সংযতচিত্ত, নিঃস্বার্থপর; এই সব গুণে অনেক সময় তথাকথিত ধার্ম্মিকরাও ইহাদের সমান হইতে পারেন না। ধার্ম্মিকদের পক্ষে লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এইখানেই বিপদেরও কথা। শিশুদের চক্ষেও এ ব্যাপারটা পড়ে, এবং স্বভাবতই তাহারা ইহার কারণ জানিতে চায়। বিশেষ করিয়া তাহাদের পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন কোন লোককে যদি তাহারা দেখে, যিনি ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়াও মহৎ হইতে পারিয়াছেন, তখন 'ঈশ্বরের' নামে তাহাদের মনে সংশয় জাগিবে। ইনি ত ঈশ্বর ছাড়াই ভাল হইতে পারিয়াছেন, তবে ঈশ্বরের অর্থ কি? ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও মুখস্থ উপদেশের চেয়ে চক্ষের সামনের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহাদের বেশী আকৃষ্ট করিবে। 'ধর্ম্ম' বলিতে আমরা বুঝি—ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা। এইখানে আসিয়া সেই ধর্ম্ম একটা জোর ধাক্কা খায়। লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই, এক্ষেত্রে ধর্ম্ম না মানিয়া যে উচ্ছৃঙ্খল পাপাচরণ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত শিশুকে বিগ্‌ড়াইয়া দিতেছে না, তাহা হইলে তাহাকে বুঝানো তবু সহজ হইত। এখানে, ধর্ম্মকে না মানিয়াও একদল লোক অতি সৎ উজ্জ্বল জীবন যাপন করিতেছে, এবং সেই দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিতেছে, ভাল হইবার জন্য ধর্ম্মপরায়ণ না হইলেও চলে। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত খারাপ, বা ইঁহারা মন্দ লোক, একথা বলা চলে না। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত মানিয়া শিশু ধর্ম্ম-বিমুখ হইতে চাহিলে তাহাকে বুঝানো যায় কি দিয়া?

এই বিপদের কথা আমার মনে হইতেছে বলিয়াই আমি শিক্ষার মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার কথা তুলিয়াছি। এই বিপদের কথা আমার মনে হইয়াছে এবং এটাও আমি বিশ্বাস করি, জানি, সে বিপদ্ সত্যকার বড় বিপদ্ কিছু নয়। ইহার প্রতিকার করা সম্ভব এবং সে প্রতিকার করিতে পারেন পিতামাতা— আর কেহ নয়।

মন ও বস্তু দুই-ই আইনের অধীন—

অনেক লোক আছেন যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, অথচ মহৎ লোক ; এমন যদি হয়ও, ইহাতে আমরা কি বুঝিলাম ? বুঝিলাম এই, বিশ্বসংসার জুড়িয়া ঈশ্বরের আইন ছড়াইয়া আছে। সে আইন বইয়ে লেখা থাকে না, মুখে কেহ উচ্চারণ করে না, তবুও অন্তরে তাহা সকলেই মানে। সেই আইন অনুসারে বস্তুজগৎ এবং মনোজগৎ দুই-ই চলিতেছে। খোকা যে খেলার ছলে সাবান জলের বুদ্‌বুদ্ উড়াইতেছে বা যা-খুসী চিন্তা করিতেছে, তাহারও মূলে সেই ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। জীবনে মানুষের সম্পদ্-সমৃদ্ধি যা-ই আসুক, সকলই আসে সেই ইচ্ছা অনুসারে। সেই ইচ্ছা ও আইন নানাবিধ ; শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার আইন, ভদ্র আচরণের আইন, বা পূজা প্রার্থনার আইন (ধর্ম্মের আইন)— সকলই তাহারই অন্তর্গত। যে কোন প্রকারেই হউক সেই আইন আমরা মানিয়া চলি। যে সেই আইনকে শুভবুদ্ধির আইন বলিয়া মানিয়া চলে, তাহারই মঙ্গল হয়। ঈশ্বরের নাম লইয়া উৎসাহ সে দেখাইতে পারে, না-ও দেখাইতে পারে, তাহাতে যায় আসে না ; তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলার অর্থ ই তাহাকে মানিয়া চলা। চক্ষু বুজিয়া রৌদ্রে চলিলেও দেহ গরম হয় ; ঈশ্বরের নাম মুখে না আনিয়া কাজে তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ মানিয়া চলিলেও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছা যে মানিয়া চলিল, শুধু মুখে তাঁহার নাম করিল না, বলিয়াই কি সে তাঁহাকে অস্বীকার বা অমান্য করিতেছে ? আইন-কর্ত্তার কোন খবর না রাখিয়াও আইন মানিয়া চলা যায়, এবং তাহাতে উপকারও হয়।

তেমনি আবার এমন কেহ থাকিতে পারে, যে হয়ত ঈশ্বরের আদেশ ও নীতিগুলি মুখস্থ করে, তাহা লইয়া আলোচনাও করে ; কিন্তু কাজের

সময় তাঁহার সমস্ত নির্দ্দেশ মানিয়া চলে না। আদেশ আলোচনার সামান্য ফল সে পাইতে পারে, কিন্তু সেই আদেশ মানিয়া চলার ফলে যে সমৃদ্ধি আসে তাহা সে পাইবে কোথায়?

এই জন্যই অনেক সময় ধার্ম্মিক ও 'অধার্ম্মিক'দের মধ্যে সমৃদ্ধির তফাৎ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের আইন যে বাজে কথা তাহা প্রমাণ হয় না বরং সেই অলিখিত আইনের মাহাত্ম্য এবং শক্তিরই প্রমাণ ইহাতে আমরা পাই। সে আইন এমনই সর্ব্বব্যাপী, এমনই শক্তিমান্, যে জানি বা না জানি, মুখে মানি বা না মানি, ফলে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এবং মুখে মানি বলিয়া কাজে না মানিলে, তখনও এড়াইবার উপায় নাই; ঈশ্বরের চক্ষে সে ফাঁকি ধরা পড়িবেই।

ধার্ম্মিকেরা অনেক সময় আইনের প্রতি অবজ্ঞা দেখান—

শুধু ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার মধ্যেও একরকমের আনন্দ পাওয়া যায়। অনেকের কাছে এই আনন্দই প্রচুর ও যথেষ্ট, ইহা পাইয়াই তাঁহারা তৃপ্ত। আর কিছু তাঁহারা চান না। ঈশ্বরের সাদাসিধা গুটিকতক আইন তাঁহারা মানেন, নিঃশ্বাস টানার মতই স্বাভাবিকভাবে ও সহজে। তার বাহিরে তাঁহার অন্যান্য আদেশের অনুষ্ঠান করিতে তাঁরা যান না। অনেক সময় এমন ভাব দেখান, যেন সেগুলির তাঁহারা ঘোর বিরোধী। তখন তাহাদের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী না হইলে এমন জিদ্ কেহ দেখাইতে পারে না।

দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া তাহারা মাথা ঘামান না। ঘামান না কেন? ঈশ্বরের উপরে তাহাদের বিশ্বাস অতি প্রচণ্ড— এত গভীর যে ঈশ্বরের কাজের উপরে নজর রাখিতেই তাহারা অনিচ্ছুক। আমার

শরীর টিকাইয়া রাখা, সে ত ঈশ্বরের কাজ, তিনি যেমন ভাল বুঝিবেন করিবেন। তাঁহার কাজ তিনি করিতেছেন, আমি কে যে তাঁহার উপরেও কর্তৃত্ব করিতে যাইব, তাঁহার কাজে মাথা ঢুকাইতে যাইব? এই বলিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া আর কোনদিকে তিনি ফিরিয়াও চাহেন না। যাঁহাদের মনে 'ধর্ম্মবিশ্বাস' এইভাবে নাই, সেই 'অধার্ম্মিক'রা এরকম করিয়া নিশ্চিন্ত হন না; তাঁহারা সমস্ত ব্যাপারের মূলনীতি খুঁজিয়া বাহির করেন, সেই নীতি মানিয়া নিজের চেষ্টায় চলিতে চাহেন। 'ধার্ম্মিক'দল ধর্ম্মনীতি ছাড়া আর কোন নীতি মানেন না, আর এই 'অধার্ম্মিক'রা আবার শুধু সেই 'ধর্ম্মনীতি'টা লইয়াই মাথা ঘামাইতে নারাজ, যদিও ঈশ্বরের অন্য সকল বিধান ইহারা নিজের কাজের মধ্য দিয়া মানিয়া চলেন। আসলে ঈশ্বরকে মানেন দুই দলই— তথাকথিত অধার্ম্মিকরাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সমানই পান; এবং তাহাদের সেই সমৃদ্ধি দেখিয়া ধার্ম্মিকদের সন্তানরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে— ইহারা ত ঈশ্বরের আইনকে স্বীকার করে না, তবু ইহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাইতেছে, আমাদের চেয়ে বেশীই পাইতেছে। এটা হইল কেমন করিয়া?

সে তাহার পিতামাতার মুখে শুনিয়াছে, 'ধর্ম্ম' মানাই ঈশ্বরকে মানা। ধর্ম্মের বাহিরেও যে ঈশ্বরকে মানা যায় সেই কথাটা সে শোনে নাই। তাহাকে সেইটুকু বুঝাইয়া দাও; তবেই আর সে অযথা বিস্মিত হইবে না।

দেহতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র পিতামাতার জানিতে হইবে—

শিশুর মনে সংশয় জাগিলে তাহাকে কি উত্তর দিতে হইবে তাহা বলিলাম। কিন্তু এই সংশয় জাগিবার অবসর পিতামাতা দিবেন কেন?

তাঁহারা নিজেরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তবে সেই বিশ্বাস সন্তানকেও শিখাইতে হইবে। নীতিজ্ঞানের কতগুলি মূলসূত্র জানিলে যে নিজেই সত্যবাদী, নির্ভীক ও স্বাবলম্বী হইবে। সেই সূত্র তাহাকে জানাইবেন না, অথচ চাহিবেন সে সত্যবাদী, নির্ভীক, স্বাবলম্বী হউক, এমন অসঙ্গত প্রার্থনা পিতামাতা করিলে চলিবে কেন? এই সূত্র তাহাকে শিখাইতে হইবে যেন এই গুণগুলি তাহার মধ্যে জাগে, ইহাও ত ঈশ্বরেরই আইন। অবশ্য জীবনের চরম সমৃদ্ধি, পরম ঐশ্বর্য্যের সন্ধান ইহাতেও পাওয়া যায় না; সে পথের সন্ধান ঈশ্বর নিজে ছাড়া আর কেহ রাখে না। কিন্তু তবুও এই গুণগুলি থাকা আবশ্যক, এবং সেইজন্যই এই নীতিজ্ঞান ও বিদ্যা তাহাকে শিখাইতে হইবে। এই শিক্ষা শিশুকে দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য; না দিলে শাস্তিও তাঁহারা এড়াইতে পারিবেন না।

শিশুকে যে-রকম করিয়া শিক্ষা দিলে, সে জীবনের পথে চলিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের সন্ধানও পাইতে শিখিবে, সেইরূপ শিক্ষার পদ্ধতি লইয়াই আমি পুস্তকের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করিব। অবশ্য এতটুকু একখানা বইয়ের মধ্যে সমস্ত কথা সুন্দর করিয়া বলিব, এমন দাবি করিবার দুঃসাহস আমার নাই। তবু যদি পিতামাতারা বুদ্ধিমান্ হন, তাঁহারা ইহার মধ্যে জানিবার মত অনেক কথাই পাইবেন। বুদ্ধিমান্ যিনি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার হয় না; একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত পাইলেই তিনি কথাটা বুঝিয়া লইতে পারেন। এই ভরসায়ই দুঃসাহসে ব্রতী হইয়াছি। আশা করি পিতামাতারা ইহার মধ্যে এমন বস্তুর সন্ধান পাইবেন যাহা তাঁহাদের শিশুদের শিক্ষা দিবার ব্যাপারে কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় ভাগ

১। ঘরের বাহিরে

বাড়ন্ত শিশু—

গ্রামে যাঁহারা থাকেন, খোলা হাওয়ার মর্ম্ম তাঁহারা বুঝেন। তাঁহাদের শিশুরা খাওয়া ও ঘুমাবার সময় ছাড়া দিনের বেশীর ভাগই ঘরের বাহিরে কাটায়। অবশ্য যতটা সময় ঘরের বাহিরে কাটানো সম্ভব তাহার সবটুকুর সদ্ব্যবহার ইঁহারাও সর্ব্বত্র করেন না। নেহাৎ যদি শীত বা বৃষ্টি না থাকে, তবে ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থাটাও ঘরের বাহিরে হইলে ক্ষতি কি? এই কলকারখানার যুগে আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর উপরে যে অস্বাভাবিক চাপ সারাক্ষণই পড়িতেছে, তাহার ঔষধই হইল শরীরকে যথাসম্ভব সতেজ ও স্নিগ্ধ রাখা। খোলা হাওয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করে, মনকে প্রফুল্ল রাখে; এবং মন প্রফুল্ল থাকার ফলে খোলা হাওয়ায় বসিয়া খাইলে সে খাদ্যটাও হজম হয় ভাল। বিশেষ করিয়া যাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতায় ভোগেন, তাঁহাদের নিয়মই করা উচিত,—'ঘরের বাহিরে কাটাইতে পারিলে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিব না।'

খোলা জায়গায় বসিয়া খাইবার আরও একটা বিশেষ সুফল শিশুদের পক্ষে আছে। শিশুর মন সৌন্দর্য্যপ্রিয়। বাহিরে বসিয়া খাইবার সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। তাহার থালার উপরে গাছের ছায়া পড়িতেছে, থালার পাশে আলো ও ছায়ার জাল ছড়ানো; পাখীর ডাক, ফুলের গন্ধ, গাছপালার হাওয়া, সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে

অপরূপ একটা সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন রচনা করে এবং এই স্বপ্নের ছবি সমস্ত জীবন তাহার মনে বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে আনন্দ দেয়।

অবশ্য গ্রামের বাসিন্দারাই বাগানে বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সহরবাসীরা বাধ্য হইয়াই এই সুযোগে বঞ্চিত। কিন্তু নিজের বাগান যদি না-ও থাকে, তবু তাহারা যেন চেষ্টা করেন ছেলেদের যথাসাধ্য বেশী সময় বাহিরে রাখিতে। খোলা হাওয়ায় বসিয়া খাইতে তাহারা যদি নাও পায়, অন্ততঃ খোলা হাওয়ায় তাহারা খেলিতে পায় যেন। মায়েরা মনে রাখিবেন, শিশুর পক্ষে বাড়িবার জন্ত সবচেয়ে বেশী দরকার দুইটি বস্তুর,— সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। ঘরের মধ্যে অন্ত সকলের সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া থাকিতে হয়, নিজের স্ফূর্ত্তিতে সে বাড়িতে পায় না; অপরের সঙ্গ তাহার উপর চাপিয়া বসে। বাহিরে সে অনেকটা "একাকী" হইতে পারে। এবং সেই অবসরেই তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়।

বুদ্ধিমতী মা বলেন "ছেলেদের বেড়াবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা আমি করি। নেহাৎ যদি দুর্য্যোগ না থাকে, তবে গ্রীষ্মকালে কম পক্ষেও প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং শীতকালে প্রত্যহ এক ঘণ্টা তাহাদেরে আমি বেড়াইতে পাঠাই।"

ব্যবস্থাটা ভাল, কিন্তু যথেষ্ট নয়। প্রথম কথা, শিশুদেরে বেড়াইতে 'পাঠাইলে'ই হইবে না। বেড়াইতে 'লইয়া যাইতে' হইবে। যতক্ষণ তাহারা বাহিরে থাকিবে, তাহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা দরকার। ঘরের বাহিরে অনেক কিছুই তাহাদের চক্ষে পড়িবে। তাহার কোন্‌টুকু তাহাদের গ্রহণ করা উচিত, কোন্‌টুকুই বা বর্জ্জন করা উচিত, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের চালাই-বার জন্যই অভিভাবকের দরকার, এবং সবচেয়ে ভাল অভিভাবক মা ও বাবা।

দ্বিতীয় কথা, এই বেড়ানোটা মাপা একঘণ্টা হইলে চলিবে না, ইহাকে যথাসম্ভব বাড়াইতে হইবে। গরমের দিনে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, চারঘণ্টা, ছ' ঘণ্টা কি আটঘণ্টা ধরিয়া তাহারা বাহিরেই থাকুক না।

অনেকে বলিবেন, "তাও কি সম্ভব?" শিশুর মা'র ত আরও কাজকর্ম আছে। অবসরে, সামর্থ্যে, সঙ্গতিতে কুলানো চাইত?

হইতে পারে, কিন্তু আমি বিশেষ কোনো ব্যক্তির কথা বলিতেছিনা। ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকিতে পারেই। আমি বলিতেছি, সাধারণভাবে যেটা করিতে পারিলে ভাল হয়। শহরে ভাল বেড়াইবার জায়গা মেলে না, এই অজুহাতে অনেকে বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তায় শিশুকে একটু ঘুরাইয়া আনিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু শহরে যদি খোলা জায়গার এতই অভাব থাকে, আজকাল শহর হইতে গ্রাম তো বেশীক্ষণের পথ নয়। এক ঘণ্টা ছ' ঘণ্টা সময় করিয়া রেলে, বাস্-এ চড়িয়া শহরের দশ মাইল দূরে কোথাও একটু ঘুরিয়া আসা শক্ত নয়, এবং একদিন যিনি এটা করিতে পারেন, তিনি ক্রমে এটাকে নিত্যকার না হোক অন্ততঃ প্রতি ছুটির দিনকার অভ্যাস করিয়া লইতে পারেন।

কিন্তু বেড়াইবার সময় এবং সঙ্গতি যেন পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন উঠিবে— এই সময়টাকে কি ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। ইহার উত্তর, শিশুদের যথাসম্ভব নিজের খুসিতে চলিতে দিতে হইবে। তাহারা নিজের ইচ্ছামত হাত পা মেলিয়া ছুটাছুটী করুক; জিনিষ ও দৃশ্য দেখুক, বাবা বা মা যিনি সঙ্গে থাকিবেন তিনি শুধু লক্ষ্য রাখিবেন তাহারা বিপথে না যায়, বিপদে না পড়ে। খালি 'আমার হাত ধরিয়া চল' করিয়া তাহাদের লইয়া গেলে, বা সারাক্ষণ ধরিয়া অশ্রান্ত বকুনি বা বক্তৃতার জোরে তাহাদের উদ্ব্যস্ত রাখিলে বেড়াইতে নেওয়ার কোন

সার্থকতাই থাকিবে না। শিশুরা খেলার সময়ে নিরিবিলি আপনার মনেই খেলিতে চায়। বাড়ীতে সারাক্ষণ বড়দের সাহচর্য্য তাহাদের মনের উপর চাপিয়া বসে, মনকে স্বচ্ছন্দগতিতে বাড়িতে দেয় না। তাই বেড়াইবার সময়টা তাহাদের স্বাধীনতা দিতে হইবে। মা শুধু, তাহারা এই সময়টা যা কিছু দেখিতেছে, শুনিতেছে, তাহার জ্ঞান যাহাতে পূরা হয়, সেইজন্য তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন, দরকার মত তাহাদিগকে বস্তু ও কথা বুঝাইয়া দিবেন। ইহাতে খেলা ও শিক্ষা একসঙ্গে হইবে।

এই সময়ের খানিকটা অন্ততঃ খুব ছুটাছুটি করিয়া খেলায় কাটাইতে হইবে, যেন ব্যায়াম হয়। 'গাছে চড়া' প্রভৃতি বেশ ভাল খেলা। ইহাতে ব্যায়ামও হয়, মজাও আছে। মা লক্ষ্য রাখিবেন যেন খেলার মধ্য দিয়াও দিনে অন্ততঃ একটা নূতন জিনিষ সে শিখিতে পারে।

খোলা মাঠে পৌঁছিয়া মা ও শিশুরা কি করিবেন? বেশ নিরিবিলি গাছের ছায়ায় পা মেলিয়া বসিয়া গল্পের বই খুলিয়া বসিবেন? কখনও না। গল্পের বই লইয়া যাওয়া বা মাঠে বসিয়া গল্প বলা একেবারেই বারণ। সার্কাসে বা থিয়েটারে যাইয়া ত আমরা ছেলেদেরে গল্প বলি না। খেলার মাঠে সার্কাস থিয়েটারের চেয়েও ঢের বেশী দেখার বস্তু আছে। "গল্প" শুনিলে তাহা দেখা হইবে না।

মাঠে পৌঁছিয়াই মা ছেলেদেরে ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা খুব খানিক ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া—যেটা ঘরের নিয়মবাঁধা জীবনে অসম্ভব—মনটাকে হালকা করুক। এখানে বড় ও ছোটর তফাৎ নাই—প্রকৃতির কোলে বসিয়া শিশুর মত অর্থহীন চেঁচামেচি করার নেশা বড়দেরও পায়। শিশুরা বড়দেরে দেখিয়া শেখে। অতএব অভিভাবক যেন সেখানে মুখ গম্ভীর করিয়া না-থাকেন। তাহাদের স্ফূর্ত্তিতে যোগ

দিয়া তাহাদের যেন বুঝাইয়া দেন, ইহাতে পাপ নাই। দেখিবেন, অতি ছোট শিশুও যদি কেহ থাকে, সেও উহার মধ্যে আনন্দ পাইতেছে—ঘাস ছিঁড়িয়া, ফুল ধরিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ঠাণ্ডা বা ময়লা লাগিবার ভয়ে তাহাকে কোলে ঠাসিয়া রাখিবেন না। তাহাকে ঘাসের শয্যায় গড়াইয়া খেলিতে দিন। ঠাণ্ডা লাগার, ময়লা লাগার, যদি এতই ভয় থাকে, তাহাকে পাতলা জামা একটা পরাইয়া দিতে পারেন। নতুবা খালি গায়েই থাকিতে দিবেন।

২। দেখা ও শেখা

খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া শিশুরা মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিবে। তখনও তাহাদের উৎসাহ ও বুদ্ধি অক্লান্ত, কেবল দেখিবার বস্তু আর তাহারা পাইতেছে না। তাহাদের নূতন খেলার সন্ধান দিন। 'ঐ যে খালটা, গাছটা বা টিলাটা দেখা যায়, ঐটাকে দেখে এস, যাও! দেখব কে এসে কতখানি খবর আমাকে বলতে পার'।

হৈ হৈ করিয়া তাহারা মহা আনন্দে দেখিতে ছুটিবে। খেলা ও পড়ার এমন সুন্দর মিশ্রণ আর হয় না।

ছেলেদেরে বলিবেন, 'ঐ যে দূরে বাড়ীটা আছে, যাও তো, ওখানে কি কি আছে সব দেখে এস। বেশী কিন্তু উঁকি ঝুঁকি মেরো না। দূরে থেকে দেখবে'।

ছেলেরা ছুটিল। খানিক পরে মহা কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। হুড়াহুড়ি করিয়া মাকে ঘিরিয়া রহিল। যে যা দেখিয়া আসিয়াছে সব একসঙ্গে তাঁকে না বলিতে পারিলে তাহারা যেন শান্ত হইতে পারে না।

—একটা মৌচাক হয়েছে মস্ত বড়।

—কতো মৌমাছি।

—দুটো ঘর।

—সামনে বারান্দা আছে। একজন বুড়ো মানুষ বসে কি কর্‌ছে।

—বাগান আছে একটা।

—সূর্য্যমুখী ফুল যা এক একটা—এতবড়, এতবড়।

—এক রকম নীলফুল আছে; গোল গোল ঝালর-ওয়ালা। কি ফুল, মা?

—ঝুম্‌কো হবে। লতা ত?

—হ্যাঁ, বেড়ার উপরে। আর একদিকে আমগাছ, জামগাছ, কুলগাছ। একটা বড় বাগান আছে কি না!

—বাগান্‌টা কোন্ দিকে?

—ডান দিকে। না না, বাঁ দিকে। না না, দাঁড়াও। এই হাত দিয়ে ভাত খাইতো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডান দিকেই।

—আর এ-দিক্‌টায় সব গোল আলু আর কপি লাগিয়েছে।

—বাঃ, তবে ফুলের গাছ হল কোন্ খানটায়?

—ও, সে তো সব সাম্‌নেটায়। বেড়ার ধারে ধারে।

—বা, রে! মাকে সেই বেল গাছটার কথাই তো বলা হয় নি। জান মা, এমনি একটা—বেল গাছ; হাজার হাজার বেল ধরে রয়েছে?

—হাজার, হাজার?

—হাজার হাজার সত্যি নয়; তবে অনেকগুলো।

—তবে যে বাড়িয়ে বললে?

এমনি করিয়া এই খেলা চলিতে থাকে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাহারা খুঁটিয়া দেখিতে শেখে, বর্ণনা দিতে শেখে, নূতন নূতন বস্তুর নাম ও চেহারা চিনিতে শেখে। মা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ছেলেরা যেই জিজ্ঞাসা করে 'এটা কি'? বা 'এটা দিয়ে কি হয়?' তিনি সেইটুকু তাদেরে বলিয়া দেন। বাড়াইয়াও বলেন না, ফাঁকিও দেন না; ঠিক যেটুকু খাঁটী কথা এবং তাহাদের জানিবার যোগ্য কথা সেইটুকু তাহাদের বলিয়া দেন। এই কথা শিশু তাহার জীবনেও ভোলে না।

শিশুকে বলিবেন সে যেন ঠিকমত দেখে এবং যা দেখিল তাই আসিয়া ঠিকমত বলে। ফেনাইয়া বা কমাইয়া বলিলে চলিবে না। দেখুন না শিশুর লক্ষ্য করার ক্ষমতা কতটুকু। সে যদি বলিতে পারে 'গাছটা সোজা, মাথাটা ছুঁচোলো হয়ে গেছে, পাতাগুলো সরু সরু, বেশী ঝুপসো নয়, ভাল ছায়া হবে না',-- তখন তাহাকে নামটাও বলিয়া দিন, 'দেবদারু'। সে ঠিক বর্ণনা দিয়াছে। সে গাছটাকে চিনিয়াছে। আর সে যদি ভুল করিতে থাকে, তাহার দেখা হয় নাই। তাহাকে গাছের নাম বলিবেন না। বর্ণনা দিবার সময় কিছু বলিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন না, তাহার সঙ্গে গাছটাকে দেখিতেও যাইবেন না। সে বুঝুক, তাহার দেখা ঠিক হয় নাই, গাছের কথা তাহার মনে নাই। তখন সে ফিরিয়া যাইবে, আবার দেখিয়া আসিবে, এবার সে ঠিক বলিতে পারিবে। তখন মা-ও খুসি, ছেলে-ও খুসি। মহা উৎসাহে সে মাকে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহার গাছ দেখাইতে।

এই উপায়ে ছেলেরা খুঁটিনাটি করিয়া সমস্ত জিনিষ দেখিতে শিখে, এবং শিখিলে সেটা আর ভোলে না। বৃদ্ধ বয়সেও সেই ছবি তাহাদের মনে থাকে। শৈশবে দেখা সৌন্দর্য্যের সেই স্মৃতি বড় আনন্দের। অনেকের মনে এই ছবি স্পষ্ট থাকে না। তাহারা বলেন, স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। কথাটা সত্য নয়। স্মৃতি ঝাপসা হয় নাই। আসলে স্মৃতি কোন দিনই স্পষ্ট ছিল না। তাঁহারা যখন দেখিয়াছেন, খুঁটাইয়া দেখেন নাই। একটা ভাসা ভাসা ধারণা লইয়াই তৃপ্ত রহিয়াছেন।

৩। ছবি আঁকা

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালা এবং অন্যান্য বস্তু খুঁটিয়া দেখার মধ্যে শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই খুব বেশী। এইভাবে দেখার অভ্যাস বাড়াইবার একটা চমৎকার উপায়, শিশুকে ছবি আঁকিতে শিখানো।

ছবি আঁকার প্রথম কথা, ছবিটাকে মনের মধ্যে আঁকিয়া লওয়া। শিশুকে বলুন সে একটা বস্তুর দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখুক, তারপর চোখ বুজিয়া বলুক, কি কি দেখিল। যদি ঠিক না হয়, বা তাহার স্পষ্ট মনে না থাকে, তবে তাহার দেখা ঠিক হয় নাই। আবার তাহাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে। তারপর আবার বলিতে হইবে। দেখুন না সে কতটা বলিতে পারে। যেমন, "একটা পুকুর। এই দিক্‌টায় জল কম। ওদিক্‌টায় জল বেশী, কালো রং। ডানদিকে গাছপালা। জলের মধ্যে স্পষ্ট ছায়া

পড়েছে, মনে হয় যেন জলের ভিতরেও আমগাছ, বাগান, আর দুটো তাল গাছ। জলের মধ্যে ঠিক গাছের ছায়ার পরেই আকাশের ছায়া। আকাশে খানিকটা মেঘ আছে। পুকুরের ঠিক কিনারায় শালুক ফুল। দুটো গরু এপারে জল খেতে নেমেছে। একটা প্রায় গলা জলে।"

এই রকম বর্ণনা যে ছেলে দিতে পারে তাহার ছবি আঁকা অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। এবার সে সেই ছবি কাগজে আঁকিতে পারিবে। একটা কথা কিন্তু মনে রাখিবেন। ছবি আঁকা শ্রমসাধ্য কাজ; চক্ষু ও স্নায়ুর উপর হইতে খুব জোর পড়ে। শিশুকে প্রত্যহ ছবি আঁকিতে বাধ্য করিবেন না। প্রত্যহই সে দেখিবে, মনে মনে ছবি আঁকিবে। কাগজে সেই ছবি মধ্যে মধ্যে আঁকিতে দিবেন। তাহাই যথেষ্ট। তাহাতে শিক্ষাও হইবে, অতিরিক্ত শ্রমও হইবে না।

প্রথম প্রথম দেখার ব্যাপারে শিশুদের একটু সাহায্য দরকার হয়। চক্ষু তাহাদের আছে, কিন্তু যা দেখিল তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে তাহারা সব সময় পারে না। সেইটুকু তাহাদেরে শিখাইয়া দিতে হয়।

একটু আধটু ইঙ্গিতেই অনেক সময়ে কাজ হয়। "জলে গাছের ছায়া পড়েছে দেখেছ? দেখ্‌লে কি মনে হয় বল ত? ঠিক যেন জলের নীচে আর একটা —"

— "বাগান"। শিশু ইঙ্গিতে বুঝিয়াছে।

তাহাদের উৎসাহ দিবার জন্য মা নিজেও এই খেলায় যোগ দিতে পারেন। তিনি একটা বস্তু চাহিয়া দেখুন। চোখ বুজিয়া তাহার বর্ণনা দিন। শিশু মাষ্টার-মশাই হইয়া তাঁহার পড়া বুঝিয়া লইবে, এবং তার পরক্ষণেই সেই খেলায় সে নিজে যোগ দিবে।

দেখিবেন, মা-কে হারাইয়া দিবার উৎসাহে তাহার লক্ষ্য করিবার ও মনে রাখিবার ক্ষমতাই বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদের ছবি আঁকিবার উৎসাহ বাড়াইবার একটা সহজ উপায় আছে, তাহাদের ভাল ভাল ছবি দেখানো। অন্ততঃ মা নিজে যদি ছবি দেখিয়া তাহার বর্ণনা তাহাদেরে বলেন — একটি ঘুমন্ত শিশু; বাছুর দুধ খাইতেছে; মাঠ, সমুদ্রে ঝড় চলিতেছে — বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া তাহারা কল্পনায় ছবি গড়িতে শিখিবে, এবং তারপর নিজের চক্ষে দেখা ছবিও সেই কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া দেখিবে। যে ছবি তাহার মনে গাঁথিয়া গেল তাহাকে কাগজে আঁকিতে তাহার কষ্ট হইবে না।

মনে মনে ছবি আঁকিয়া নিবার এই যে অভ্যাস, মনের শ্রান্তি দূর করিবাব এমন উপায় আর নাই। এই ছবি মনে গাঁথিয়া থাকে। সংসারে কর্ম্মক্লান্ত দিনের অবসরে এক মুহূর্ত্তের ছুটি আমরা সকলেই চাই। তখন মন চায় ছুটিয়া যাইয়া প্রকৃতির বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে, যেখানে আছে বিশ্রাম, যেখানে আছে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা। এবং সত্যই যখন দেহটাকে টানিয়া লইয়া একদা-পরিচিত সেই পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদীর ধারে যাওয়া সম্ভব হয় না, তখনও তাহার যে-ছবি আমাদের মনে আছে সেই ছবি আমাদের মনে জাগিয়া আমাদের শ্রান্তি ও অবসাদ জুড়াইয়া দিতে পারে।

উপস্থিত মত দেখার আনন্দের পরেও এই মনের ছবি মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে অন্য সময়েও আনন্দ দেয়। ব্যাপারটা কিছুই শক্ত নয়, দরকার শুধু একটু অভ্যাস। সেই অভ্যাসটা শিশুর মধ্যে সহজেই জন্মাইয়া দেওয়া যায়। জন্মাইয়া দেওয়া মাতা ও পিতার কর্ত্তব্য, যদি সত্যই তাঁহারা চান যে শিশু জীবনে যথাসম্ভব আনন্দে ও সুখে দিন

কাটাক। আনন্দের ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ের এমন সহজ পন্থা তাহাদেরে কেন তাঁহারা শিখাইবেন না?

আর একটি ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহারা সতর্ক হইবেন। মনের মধ্যে ছবি শিশু আঁকিল, তাহার বর্ণনা লোকের সম্মুখে দিতে তাহাকে বাধ্য বা উৎসাহিত করিবেন না। সে ছবি মনেরই সামগ্রী। ভাষায় তাহার বর্ণনা দিতে গেলে তাহার সঙ্গে কল্পনা মিশিবে, মন বিক্ষিপ্ত হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত ছবিটা তাহার মনে নষ্ট হইয়া যাইবে। সে যাহা দেখিল তাহা তাহারই থাকুক; সে যেন অন্যকে তাহা দেখাইতে না যায়। গেলে অন্যকেও ভাগ দিতে পারিবে না, তাহারও ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে। তাহার সম্মুখে নিজেরাও সেই দৃশ্য লইয়া সমালোচনা করিবেন না। ছেলে জন্মগত কবি হইতে পারে; সেই চিত্র লইয়া সে নিজে কবিতার স্বপ্ন রচনা করুক আপত্তি নাই। কিন্তু লোক চক্ষে তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে পিতামাতা চেষ্টা করিবেন না। স্বপ্ন স্বপ্নই, সে টানা-টানির ভর সয় না। ছেলে 'বাহাদুরী' করিয়া তাঁদেরে খুসী নাইবা করিল।

৪। গাছপালা ও ফুল

বাহিরে বেড়াইবার ফাঁকে শিশুকে সেই অঞ্চলের ও সেই ঋতুরা সকল গাছপালা চিনাইয়া দিতে হইবে। গাছপালা চিনিবার জায়গাই মাঠ; ছবি দেখিয়া চেনার বস্তু তাহারা নয়। মাঠে যে সব শস্য ও সব্‌জি আছে শিশু তাহার প্রত্যেকটি গাছ চেনে কি? না চেনে ত চিনাইয়া

দিন। চাষের আরম্ভ হইতে শস্য কাটা পর্য্যন্ত ব্যাপারগুলি দেখাইয়া দেখাইয়া জানাইয়া দিন।

বাগানের ফুল সে বাড়ীতে বসিয়াই চিনিবে। বন্য ফুল চিনিতে হইবে ঝোপ-ঝাড়েই। যত রকম ফুল চক্ষে পড়ে, তাঁহাকে চিনাইয়া দিন। শিশুর চক্ষুকে ফুলই বেশী আকৃষ্ট করে; তাই ফুল চেনা তাহার পক্ষে সহজ। ফুল চিনিলেই সেই গাছও তাহার চেনা হইয়া গেল।

ফুলটা চিনাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি সেখানকার মাটির দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিবেন। তাহা হইলেই কি রকমের মাটিতে কোন্ ফুল জন্মে, সেই সম্বন্ধে শিশুর ধারণা হইবে; এবং ইহার পরে মাটির প্রকার দেখিয়াই সে বলিতে পারিবে এখানে কোন্ রকমের ফুল পাওয়া বা জন্মানো সম্ভব। মা অনেক সময় ভয় পান, তিনি নিজেও সকল গাছ-পালা না চিনিতে পারেন। কিন্তু না চিনিলে তাহাকে চিনিয়া লইতে হইবে। এক ফোঁটা শিশুকে জানাইবার জন্য ত আর তাহাকে বিশেষ পণ্ডিত হইতে হইবে না? সাধারণভাবে কিছু জানিলেই কাজ চালানো যায়। মোটামুটি গাছপালার খবর পাওয়া যায়, এমন বই হইতে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিলেই হয়।

গাছ ও ফুল দেখার পর যদি শিশুকে দিয়া তাহার এক-দুইটা ছবি আঁকানো যায় তবে আর সেই গাছ ও ফুলের আকৃতি তাহার ভুল হয় না।

ফুলের পর তাহারা গাছ চিনিবে। সাধারণতঃ বড় বড় গাছ যে-সব আছে তাহার কতগুলিকে চিনিয়া লইলে, বছর ভরিয়া তাহার বিভিন্ন রূপ তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে। গাছের কচি পল্লব, ভরা পাতা, বউল ফুল, আবার হয় ত পাতা-ঝরা ন্যাড়া গাছের মূর্ত্তি। মাসের পর মাস ধরিয়া নূতন নূতন মূর্ত্তিতে তাহারা গাছগুলিকে চিনিয়া রাখিবে।

গাছের এই রূপ-পরিবর্ত্তন খাপছাড়া ভাবে লক্ষ্য রাখা শক্ত হয়;

ঋতুগুলিকে চিনাইয়া দিলে কাজটা সহজ হয়। তখন কোন্ ঋতুতে কোন্ গাছ কি রূপ নেয় তাহার একটা ধারণা শিশু পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঋতুর বিশেষত্বও তাহার মনে গাঁথিয়া যায়। কেমন করিয়া হেমন্তে গাছের পাতা পাকে, শীতে মরিয়া যায়, বসন্তে আবার নূতন কচিপাতা গজায়, তারপর হয় মুকুল ও ফল; বর্ষায় নূতন শাখা—আবার শরতে হেমন্তে মরা ডাল— এমনি করিয়া পৃথিবীর রূপকে সে চিনিতে থাকে।

এইখানে একজন ইংরেজ কবির একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন, "আচ্ছা, ফুল যদি পৃথিবীতে একটা নূতন বস্তু হইত? আগে ফুল ছিল না, এখন নূতন আমরা তাহাকে দেখিলাম। আমরা কি করিতাম ভাবিয়া দেখ ত। একটু একটু করিয়া কি করিয়া নূতন পাতা একটি গজাইল, তারপর আর একটি, তারপর আর একটি; ক্রমে ছোট্ট একটি মুকুল দেখা দিল, তারপর সেটি বড় হইল, তাহার বোঁটা হইল, কলিটি বড় হইল; তারপর সেটির মুখ একটুখানি ফাটিয়া রঙের আভাস দেখা গেল, আমরা মুগ্ধ ও উদগ্রীব হইয়া লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। তারপর ক্রমে সেই ফাটা আরও বাড়িল; তারপর একদিন হঠাৎ ফুলটি তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত সৌরভ লইয়া ফুটিয়া উঠিল— দেখিয়া আমরা আত্মহারা হইয়া গেলাম।"

ফুল নূতন সৃষ্টি নয়। শিশুরা ত নূতন। তাহাদের প্রত্যেকের রীতি-নীতি ধরণ-ধারণ আলাদা। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি নূতন ফুল। তাহাদের সেই মধুর জীবনের উন্মেষের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি মুহূর্ত্ত যদি পিতামাতা আগ্রহভরে চাহিয়া না দেখেন, তবে সেটা তাঁদেরই বুদ্ধির দোষ। জগতের একটি মধুরতম দৃশ্য হইতে তাঁহারা নিজেদেরে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিতেছেন।

গাছের কথা বলিতেছিলাম। শিশুরা বৃদ্ধদের মত অভিজ্ঞ নয়; তাই যে-গাছকে তাহারা চিনিল, তাহার প্রতিটি খুঁটিনাটি, প্রতিটি পরিণতি তাহারা লক্ষ্য করে। বড় বড় গাছ— আম, বট, অশ্বত্থেরও ফুল হয়; অনেক সময় খুব ছোট ফুল, অনেক সময় ঠিক পাতার রঙের ফুল— চক্ষেই পড়ে না, কিন্তু এ সমস্তই শিশুর চক্ষে পড়ে। তারপর ফল— সেই ফল পাকিয়া, ঝরিয়া, আবার বীজ হইতে চারা উঠে— তাহারা এই সমস্তই দেখে, দেখিতে চায়।

এই দৃশ্যের মধ্যে তাহারা আনন্দ পায়। বড়রা অনেক সময় পান না। তাঁহাদের কাছে এগুলি জানা কথা, পুরাণো খবর। বটগাছে ফল ধরা বা আমের বউল ধরার মধ্যে অভিনবত্ব কি থাকিতে পারে, যার জন্য দিবারাত্র হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হইবে— ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর। সেজন্য অনেক সময়ে এইসব দেখিতে ব্যগ্র ও ব্যস্ত শিশুকে তাঁহারা ঠাট্টা করিয়া বা ধমকাইয়া নিরস্ত করিয়া দেন। অথচ এমন মারাত্মক ভুল আর নাই। ইহাতে তাঁহাদেরই মূর্খতার প্রমাণ হয়। শিশুরও ক্ষতি হয়। বড়রা যা জানেন শিশুর কাছে সেটা জানা খবর নয়। সে-ত জানিতে চাহিবেই। বড়দের বিজ্ঞ চক্ষে যেটা 'জানা', 'পুরাণো' বস্তু, শিশুর কাছে সেইটাই নূতন; তাহার মধ্যে নূতন নূতন বস্তুর দেখা পাইয়া সে আবিষ্কারের আনন্দের সন্ধান পায়। বড়দের কি অধিকার আছে সেই আনন্দ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার? এমনও তো হইতে পারে, তাঁহাদের বিজ্ঞ চক্ষে যেটা পড়ে নাই, শিশুর তীক্ষ্ণ চক্ষে সেইটাই ধরা পড়িবে।

অনেকে ছেলেদের একটা ডায়েরী করিয়া দেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়— কবে প্রথম, সে কোন্ বস্তুটা, কোন্ ফুলটা, পাতাটা, জন্তুটা দেখিল তাহা টুকিয়া রাখিবার একটা খাতা। এই উপায়ে বছর ঘুরিয়া

আসিলেই তাহার একটা মোটামুটি ঋতুজ্ঞান হইয়া যায়। সে বলিতে পারে তাহার পরিচিত কোন্ গাছটা, কোন্ ফুলটা, আবার কি মাসে পাওয়া যাইবে। মনে সব কথা থাকেনা, তাই স্মৃতিকে বিন্যস্ত রাখার জন্য এই হিসাবের বন্দোবস্ত।

আর একটু বড় হইলে সে নিজেই প্রাকৃতিক ডায়েরী রাখিতে পারে। এই ডায়েরী রাখার অর্থ একটা মোটা বাঁধানো খাতা রাখা, যাহাতে তাহার পছন্দমত জিনিষের, ফুল পাতার, ছবি সে আঁকিয়া রাখিবে, এবং ছবির সঙ্গে সঙ্গে একটা বর্ণনাও লিখিয়া রাখিবে। এই ছবি আঁকিতে গিয়া তাহার রঙের জ্ঞানও হয়। সেইটা কি রঙ, এবং রঙ্এর বাক্সের কোন্ কোন্ রঙ দু'টা মিশাইলে কোন্ নূতন রঙ হয়, ইহাও একটা মূল্যবান্ আবিষ্কার। তাহাকে সামান্য একটু বলিয়া দিয়া, শিশুকে রঙ্ নিজেই মিশাইয়া লইতে দিন, তাহার পরিমাণ ও অনুপাতের জ্ঞান সে নিজেই গড়িয়া লইবে।

খাতায় কি সে আঁকিবে সে সম্বন্ধে তাহাকে এক আধটু ইঙ্গিত দেখানই যথেষ্ট। আদেশ দেওয়ার দরকার নাই। তাহার নিজের খুসিতেই সে ছবির পর ছবি আঁকিয়া খাতা ভরিয়া তুলিবে।

এই খাতাও মহামূল্য কিছু নয়। সাধারণ সাদাপাতার বাঁধানো খাতাতেই সুন্দর কাজ চলে। শুধু দেখিয়া দিতে হইবে কাগজটা যেন এমন হয় যে তাহাতে আঁকা ও লেখা দু'টাই চলে।

অনেক সময় শিশু বলে— আমি মন স্থির করিতে পারি না। কেবলি মনে চিন্তা আসে।

এটা তাহার অপরাধ নয়। অনেক শিশুরই এই অবস্থা হয়। এটা হইতে ওটা, ওটা হইতে সেটায় তাহার মন ছুটিয়া চলে। তাহার তরুণ মুগ্ধ মন চারিদিকে নূতন নূতন বস্তুর সন্ধান পাইয়া কেবলই ছুটাছুটি করিয়া

বেড়ায়, একস্থানে স্থির হইতে চায় না। তাই তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সে একসঙ্গে সবগুলি বস্তু দেখিতে চাহিবে, তাই তাহার কোনটাই ভাল করিয়া দেখা হইবে না। তাই এইভাবে একা তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে, শিখিতে পারিবে না; ছবির পর ছবি, চিন্তার পর চিন্তা, ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া তাহার মস্তিষ্ককে শ্রান্ত করিয়া তুলিবে।

এই জন্যই শিশুকে একা ছাড়িয়া দিতে নাই। তাহাকে নির্দিষ্ট কাজ করিতে দিন। কাজ কিন্তু সে করিবে বস্তু লইয়া, নাম লইয়া নয়। ফুল সে দেখিয়া চিনুক, বইয়ের পাতায় যেন ফুল না চিনিতে যায়। সে-জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়; বইয়ের ফুলের রূপ নাই, গন্ধ নাই।

৫। জীব-জন্তু

জীবজন্তুর গতিবিধির মধ্যে শিশু আনন্দ ও শিক্ষা দুইটাই পায়। তাই গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুও তাহাকে চিনাইতে হইবে।

পোষা জীবজন্তুর সঙ্গে শিশু অল্পদিনেই বেশ বন্ধুত্ব করিয়া নেয়। বন্য প্রাণীর দেখা পাওয়া সকল শিশুর পক্ষে সুলভ নয়। শহরের শিশু হয় ত গ্রাম্যজীব কাঠবিড়ালী বা খরগোসের দেখাই পায় না। কিন্তু কোন জীবেরই দেখা পায় না একথা বলা মিথ্যা। আর কিছু না হোক, ইঁদুর, পিঁপড়ে, ব্যাং— এরাও তো আছে। পুকুর একটা থাকিলে কিছু ব্যাঙাচি তুলিয়া বোতলে ভরিয়া আনা যায়। কিভাবে ধীরে ধীরে

তাহার লেজ খসিয়া, পা গজাইয়া, সে ব্যাং হয়, সেটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কৌতূহলের ব্যাপার। যে কোন জায়গায় একটা ইট পাথর উল্টাইয়া একটা পিঁপড়ের বাসা বাহির করা যায়—পিঁপড়ের জীবন যাত্রার মধ্যে দেখার বস্তু প্রচুর আছে। অথচ এই সব জীবও সকল শিশু চেনে না। ভীন্ ফারার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষক "How doth the little busy bee" কবিতাটি পড়াইতেছেন। শিক্ষক খুব ভাল পড়াইতেছেন, কিন্তু ছেলেরা মন দিতেছে না। তারপর তিনি কারণটা আন্দাজ করিলেন। ছেলেদের দু'-চারটা প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, তাহারা কেহই মৌমাছি দেখে নাই। যে-জীব চেনে না, তাহার সম্বন্ধে কবিতাতেও তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই। মৌমাছি সর্ব্বত্রই দেখা যায়, অথচ ছেলেরা চেনে না, এটা কি কম দুর্ভাগ্যের কথা! বহু ছেলে আছে, যারা হয়ত খোলা জায়গাতেই বাস করে, তিন তলার কোঠাতে সারাদিন আবদ্ধ থাকে না, তবু সাধারণ জীবজন্তু চেনে না—মৌমাছি ও বোল্‌তায় প্রভেদ করিতে পারে না। শিক্ষার দোষ ছাড়া এমনটি হইতে পারে না।

ছেলেদেরে অভ্যাস করাইতে হইবে, তাহারা যেন সকল জীবজন্তু পোকামাকড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে শেখে। ধীর, স্থির হইয়া তাহারা এইগুলির উপরে নজর রাখিবে, ক্রমে তাহাদের চলাফেরা কাজকর্ম্ম তাহাদের চক্ষে পড়িবে। মৌমাছি, গোবরে পোকা, শুঁয়া পোকা, ফড়িং, বোলতা, মাকড়সা লক্ষ্য করার মত সুবিধা সুযোগ সকলেরই আছে। অনেক সময় শিশু বলে, "আমি যখন দেখিতে যাই, তখন ওরা কিছু করে না"। এ মোটেই সত্য কথা নয়। আসলে তাহার দেখার চক্ষু নাই। তাহাকে কেহ দেখিতে শিখায় নাই। নহিলে স্বভাবতঃ বড়দের চেয়ে ছোটদের চক্ষু এসকল ব্যাপারে তীক্ষ্ণ।

ছোট প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহল জাগায় পিঁপড়ের কাণ্ড-কারখানা। পিঁপড়েরা বাসা করে মাটির তলায়, তাহাদের সব কাজ দেখাও শক্ত। দেখা যায় এমন ভাবে পিঁপড়ের বাসা ছেলেদের জন্য তৈরী করা যায়।

অনেক শিশু পোকামাকড় দেখিলে ভয়ে অস্থির হয়। অনেক সময়েই এটা তাহারা শেখে বড়দের কাছে। প্রথম হইতেই তাহাদের মনে ভয় জন্মিতে না দিয়া, তাহাদের অভ্যস্ত করিয়া দিলে আর তাহারা ভয় পাইবে না।

শিশু পোকামাকড় দেখিবে, তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবে, এবং কি দেখিল তাহা খাতায় লিখিয়া রাখিবে। সে যদি লিখিতে না শিখিয়া থাকে, মা তাহার হইয়া খাতায় লিখিয়া দিবেন। বড় হইয়া যদি শিশু এই খাতা খোলে, দেখিবে তাহার শৈশবের বন্ধুদের নূতন করিয়া সে সাক্ষাৎ পাইতেছে। এই স্মৃতি বড় মধুর।

কোন কোন ছেলের মনে জীবজন্তু, গাছপালার প্রতি একটি ঝোঁক জন্ম হইতেই থাকে। হয়ত এটা কোন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পাওয়া। কিন্তু বিশেষ ঝোঁকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ ভাবেই শিশুদের মনে এই ঝোঁক কিছুটা থাকে। বাবা-মার কর্ত্তব্য ঝোঁকটাকে উৎসাহ দেওয়া। অনেক সময় বাড়ীর লোকেদের ঠাট্টা বা নিষেধের চাপে শিশুর মনে এই ঝোঁকটা মারা পড়ে, কারণ বাড়ীর লোকদের মত নাই, বা তাঁহারা ইহাতে বিরক্ত হন জানিলে তাহারা নিজে হইতে এই খেলা ছাড়িয়া দেয়। পিতামাতা লক্ষ্য রাখিবেন যেন এই প্রকারের বাধা শিশু না পায়।

শহরের শিশুদের হয়ত অনেকরকম পাখী ইত্যাদি দেখাবার সুযোগ হয় না। তবু উহারই মধ্যে তাহাদেরও যতটা সম্ভব দেখিতে চিনিতে

হইবে। শহরের শিশুদের কাছে একটা সহজলভ্য পাখী চড়াই। চড়াই বুদ্ধিমান্ পাখী, এবং সহজেই আকৃষ্ট হয়। একটু মুড়ি, বিস্কুট, রুটি খাওয়াইয়া ইহাদের বশ করা যায়। দুই চারিটা চড়াই বশ হইলেই ক্রমে তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া আরও অনেক আসে। বেড়াইতে গেলে ত নূতন পাখীর দেখা মিলেই।

এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন :—প্যারিসের বাগানের মালীকে দেখিয়াছ? বাগানের চড়াইরা তাহার বন্ধু। তাহার ঘাড়ে, পিঠে, টুপির কিনারে আসিয়া তাহারা বসে, তাহার হাত হইতে খাবার খায়। সে হাত তুলিলে তাহারা সরিয়া যায়, আবার তখনই আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, সকল চড়াইর মধ্যে একটাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া খাবার খাওয়াইতে। সব পাখীগুলি এক চেহারার, কোনটাকে আমরা কিছুই চিনি না; অথচ সে তাহাদেরে চেনে, তাহারাও তাহাকে ঘিরিয়া পথের কিংবা বেড়ার উপর বসিয়া যেন কতই মনোযোগ সহকারে তাহার বক্তৃতা শুনিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে তাহার আহ্বান মত এক একটি চড়াই আগাইয়া আসিয়া তাহার ভাগের খাবার লইয়া যায়। দেখিয়া মনে হয়, তাহারাও ফরাসী ভাষা বুঝিতে শিখিয়াছে।

ছেলেদের প্রাকৃতিক শিক্ষার উপরে এতখানি জোর দিলাম এইজন্য যে, এই শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত দরকার, এবং এটা একসঙ্গে শিক্ষা ও খেলা দুয়েরই কাজ করে। নিজের চোখে দেখিয়া শেখায় যা ফল হয়, বই মুখস্থ করিলে তাহার শতাংশও হয় না। আমাদের যুগে শিশুদের বড় দুর্ভাগ্য, তাহাদের সকল কিছুই পরের মুখে শুনিয়া শিখিতে হয়। নিজের চোখে দেখিয়া শেখার সুযোগ তাহারা পায় বড় কম। চোখে না দেখার ফলে বস্তুর সত্যকার রূপ, সত্যকার বিস্ময়ের তাহারা খোঁজ পায় না। তাই শেষে শিখিবার জন্য আর তাহাদের উৎসাহও থাকে না। এই দুরবস্থার

জন্য দায়ী বড়রা। এবং ইহার প্রতিকার করিবার উপায়ই হইল তাহাদের নিজের চোখে সব দেখিয়া চিনিতে দেওয়া। একবার চক্ষে নেশা ধরিলে তাহারা নিজের গরজেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিখিবে, এবং জীবজন্তু গাছপালাকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ভালবাসিবে। তাহাদের ভালবাসিলেই শিশুরা ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে।

শিশুদের পক্ষে চারিপাশের পৃথিবীতে তাহারা যাহা দেখিতেছে, তাহাকে চিনিয়া নেওয়ার চেয়ে বড় শিক্ষা আর কিছু নাই। এই কথাটা আমাদের বড়দের জানা উচিত। একবার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলে আর তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না। তাহাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের সন্ধান তাহারা পাইয়া গিয়াছে।

আর একটা বড় কথা, প্রাকৃতিক শিক্ষার মধ্য দিয়া শিশুর চরিত্র-গঠনের অনেকখানি কাজই আগাইয়া যায়। এই খেলার মধ্য দিয়া তাহার মনোনিবেশ, লক্ষ্য ও বাছাই করার শক্তি, ধৈর্য্য, বিশ্লেষণ, সকল-গুলি বৃত্তিরই চর্চ্চা হইতেছে। ইহার ফলে তাহার যে মানসিক উৎকর্ষ ঘটিতেছে তাহার চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি আছে? জীবনের এই সৌন্দর্য্যের এবং বৈচিত্র্যের একবার সন্ধান পাইলে ইহার মধ্যেই তাহার মন ডুবিয়া যায়। অন্য কিছু খুঁটিনাটি লইয়া রাগারাগি ঝগড়াঝাটি করার সময় তাহার থাকে না। ঐগুলি সাধারণতঃ অলস মস্তিষ্কের ব্যাধি। প্রাকৃতিক আবিষ্কারের খেলায় মত্ত শিশু ছিঁচ্‌কাদুনে হয় না, বদ্‌রাগী হয় না, একগুঁয়ে বা ঝগড়াটেও হয় না।

"শিশু" বলিয়া এতক্ষণ কথা বলিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের পক্ষেই এই শিক্ষা বেশী দরকারী। মেয়েদের জীবনে বৈচিত্র্য কম, শরীরে শক্তি কম; এবং কি শৈশবে বা পরিণত বয়সে, পুরুষ যখন নানা কাজ-কর্ম্মের উত্তেজনায় মগ্ন থাকে, মেয়েদের থাকিতে হয় অলস ও একঘেয়ে

জীবন লইয়া—তাহাদের দিন যেন আর কাটে না। একঘেয়ে জীবনের ফলে তাহাদের মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়া যায়। কাজেই নিজে নিজে আনন্দ পাইবার মত উপায় তাহাদের কিছু জানা দরকার। সেই উপায় এই খেলা। তাহার চেয়েও বড় কথা, মেয়েরা ভবিষ্যতের মা; ভবিষ্যতের শিশু কি হইবে তাহা স্থির হয় তাহার মাকে দিয়াই। শিশু যাহাতে এই প্রকৃতির খেলা শিখিতে পারে এই জন্যইত তাহার ভাবী মা'রও ইহা জানা দরকার।

৬। প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বই-পড়া

শিশুদিগকে জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে শিখানো হইবে কি? ইহার উত্তর, না। বিজ্ঞানের আলোচনা বুঝিবার বয়স তাহাদের হয় নাই; তাহা ছাড়া এই সব বিদ্যার খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে গেলে ফুল বা জীবদেহ কাটিয়া চিরিয়া দেখাইতে হয়। সেটা শিশুর মনে আঘাত করে। শিশুকে বরং এই কথাটাই শিখানো দরকার যে, যে-প্রাণ সে দিতে পারে না, সে প্রাণ নেওয়ারও অধিকার তাহার নাই।

বিজ্ঞানের চর্চ্চা সে করিবে আরও বড় হইয়া, যখন বুঝিবে বিজ্ঞানের খাতিরে, জ্ঞানের খাতিরে, অন্য দিকে একটু ক্ষতি বা নিষ্ঠুরতাকে স্বীকার করিয়া না লইয়া উপায় নাই। তাহার আগে পর্য্যন্ত সে ফুলই চিনুক, তাহার কোষ-সংস্থান জানিবার সময় তখনও হয় নাই।

তবুও সেই চেনার মধ্যে তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থাকা চাই। ফুলের কোষ সে না চিনিতে পারে; ফুলের বিভিন্ন অংশ, পাপ্‌ড়ি, বোঁটা,

কেশর— তাহাকে চিনাইতে হইবে। গাছপালা জীব-জন্তু যা সে দেখে, মোটামুটি তাহার যে শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে, সেটুকু তাহাকে শিখাইতে হইবে। গাছের মধ্যে গোল পাতা, লম্বা পাতা; তিন-পাপ্‌ড়ি, পাঁচ-পাপ্‌ড়ি ফুল; গাছের মধ্যে কোনটার পাতা শরতে ঝরে, কোনটার ঝরে শীতে; জীবের মধ্যে কোনটা মেরুদণ্ডী, কোনটা মেরুদণ্ডী নয়; কোনটা তৃণভোজী, কোনটা মাংসাশী, এটুকু তাহার চিনিতে হইবে। ফুল ও পাতা সংগ্রহ করিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া রাখা শিখিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে এক আকৃতির, এক ধরণের পাতা ও ফুল এক সঙ্গে রাখিতে শিখিবে। এইটাই শ্রেণী-বিভাগ শেখার প্রথম ধাপ।

শ্রেণী-বিভাগ করিতে জানাটা মস্তবড় কথা। মনের মধ্যে যে লক্ষ্য করার ক্ষমতাটা আছে, এটাতে তাহারই উৎকর্ষ ঘটে। কিন্তু সেই শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইবে নিজে দেখিয়া, চিনিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া। বই-মুখস্থ বিদ্যা চালাইলে হইবে না। বই আওড়াইয়া, পাতা কোন্ ফাইলে যাইবে ঠিক করায় স্মৃতিশক্তি বাড়িতে পারে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে না।

অবশ্য, এই সময়েও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বই কাছে থাকিলে কাজে লাগে। শিশুদের উপযোগী বাংলা বই অনেক পাওয়া যায়—তাহাতে সহজ ভাষায়, অল্প কথায়, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়পর্ব্বত প্রভৃতির ছবি ও পরিচয় থাকে। বইগুলি হাতের কাছে থাকিলে তাহাদের শেখা সহজ ও নির্ভুল হয়।

কিন্তু বই-এর চেয়েও বেশী দরকার বস্তু, এবং মা অথবা শিক্ষকের সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকা। বইয়ের পড়া মৃত বস্তু; তার চেয়ে মানুষের মুখে শুনার মধ্যেও শিশু একটা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আরাম পায়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে পারে।

এই জন্যই শুধু মাতা বা শিক্ষক নন, যিনিই শিশুদের সংস্পর্শে আসিতে চান, তাহাদের সঙ্গে ভাব জমাইতে চান, তাঁহারই উচিত, সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু জ্ঞান রাখা। দেখিবেন, সেই জ্ঞানের মধ্যদিয়া শিশু অতি সহজে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবে। যিনিই তাহার প্রশ্নের উত্তর দেন, তাহাকে নূতন নূতন জিনিষ চেনান, নূতন নূতন কথা বলেন, তাহার কৌতূহল মিটাইতে পারেন, শিশু তাহাকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। এবং হয়ত এমনি একটা অতর্কিত কথার মধ্যে শিশু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত পাইয়া যাইবে কি না তাহাই বা কে জানে?

৭। শিশু জ্ঞান আহরণ করে— বুদ্ধি দিয়া নয়, ইন্দ্রিয় দিয়া

শিশু যখন কোন কাজ হইতে দেখে, তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়াছেন? একাগ্র দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিতে থাকে। শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণতম হইতেছে চক্ষু। কিছুই তাহার চক্ষু এড়ায় না। দেখার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সে শব্দ শোনে, আস্বাদ নেয়, গন্ধ নেয়, ধরিয়া দেখে, তবু দেখাটাই তাহার বড় কথা। ছোট্ট শিশু খেলা করে, হাতের কাছে যা পায় মুখে পোরে বা মাটিতে ঠুকিয়া শব্দ করে। সেটাও তাহার দেখারই অঙ্গ— বস্তু পরিচয়। তখনও তাহার দূরের ও নিকটের প্রভেদ বুঝিতে দেরী আছে, তাই চাঁদ ধরিবার জন্য বায়না ধরে। তখনও তাহার

উঁচুনীচুর জ্ঞান হয় নাই, তাই ছবি আর কঠিন আকৃতি বা মূর্তির তফাৎ সে বোঝে না। তবুও যেটুকু বোঝে উহারই মধ্যে সে জ্ঞান আহরণ করে। এ বিষয়ে তাহার বড় সহায় প্রকৃতি— অলক্ষ্যে, বিনাশ্রমে, বিনাচেষ্টায় তিনি তাহাকে সকল বস্তু চিনাইয়া দিতেছেন।

শৈশবে এই শিক্ষাটাই বেশি হওয়া উচিত। এই সময়ে সে শুধু দেখিবে— শুধু ছবির পর ছবি দিয়া মনের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিবে। তাহা হইলেই পরে বড় হইয়া সে ইহার সাহায্যে নূতনতর বস্তুর সন্ধান পাইবে। তখন আসিবে তাহার আন্দাজ করার, চিন্তা করার ও ধারণা করার সময়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না, যদি পূর্ব্বসঞ্চিত ভাণ্ডার মনে না থাকে। যে-বস্তু সে চেনে তাহার 'মত' বা 'মত নয়' বলিয়াই ত নূতন বস্তু তাহাকে চিনিতে হইবে। কিছুই না চিনিলে সেত চেনা আরম্ভই করিতে পারিবে না।

অনেকে শিশুর উপর অতিরিক্ত ভার চাপাইবার কথা বলেন। যাহা তাহার সাধ্যে বা শক্তিতে কুলায় না তাহা সে শিখিবে কেমন করিয়া? কথাটা কিন্তু আসলে ঠিক অতিরিক্ত ভার চাপানো নয়— ভুল রকমের ভার চাপানো। যে-কাজ করার শক্তি তাহার হয় নাই, তাহা সে করিতেই পারিবে না। ছোট ছেলে দেড় মণ বোঝা তুলিতে পারিবে কেন? কিন্তু যে-কাজ তাহার পক্ষে করা স্বাভাবিক ও সম্ভব তাহাতে বড়দের তুলনায় সে সহজে শ্রান্ত হয় না। নূতন ফুল, নূতন বস্তু দেখিতে উৎসাহের অভাব ছেলেদের কখনও হয় না। ইহার কারণ এগুলি তাহার মনের খোরাক যোগাইতেছে। এই সময়ে তাহার মনে থাকে রাক্ষসের ক্ষুধা, যা পায় তাই খাইয়া সে ভাণ্ডার সঞ্চয় করে। দেহের ক্ষুধার সীমা আছে। শিশুর মনের ক্ষুধার সীমা পাওয়া শক্ত। কারণ তাহার মনে জড়তা নাই।

এই মনের খোরাক শিশুকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে দেই না। স্কুলে বা বাড়ীতে যে ধরণের বস্তুর দেখা সে পায়, তাহার ক্ষুধা মিটাইতে তাহা যথেষ্ট নয়।

বড়রা সাধারণতঃ সকল কথাই শিখে ভাষার মধ্যদিয়া। শিশুদের ভাষার সম্বল কম। তাই তাহারা বর্ণনা শোনা অপেক্ষা জিনিষ দেখিতে পছন্দ করে বেশী। আমরা মনে করি তাহাকে মুখে বলিলেই সে বুঝিবে। কিন্তু আমাদের সকল কথার অর্থ-ই সে বোঝে না। কারণ কথার পেছনে আসল বস্তুটার যে-অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের প্রকৃত অর্থ বোধ হয়, সেই অভিজ্ঞতা শিশুর এখনো হয় নাই। আমরা সেটার খবর রাখি না, তাই কথাগুলা সে ধরিতে পারিল কি না সেদিকে দৃষ্টি দেই না। ফলে তাহার শিক্ষা কাঁচাই থাকে।

মানুষের একটা স্বভাব, যাহা দেখে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে চায়। বস্তু দেখার আগে নাম মুখস্থ করিতে শিশু উৎসাহ দেখায় না। বস্তু চিনিলেই তবে কথা বলার ইচ্ছা তাহার হয়, সে নাম জানিতে চায়। তাই আগে তাহাকে বস্তু দেখাইয়া তারপর কথা বলিতে হইবে। তবেই সে সেই কথাটা শিখিবে। যা দেখে তাই লইয়াই সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, অনেক সময় সে প্রশ্নের কোন মাথামুণ্ড থাকে না। এই প্রশ্নেরও মূল ঐখানে। প্রশ্নের উত্তরে শিশু বস্তু বা তত্ত্ব জানিতে চায় না, চায় কথা শিখিতে। এই দুরন্ত উৎসাহী শিশুকে মুক্ত প্রকৃতির বুকে অবাধে বাড়িতে দেওয়া ভাল, না ঘরের কোণে বন্ধ রাখিয়া পিষিয়া মারা ভাল?

শিশু দেখে এবং শেখে, ভাষা-জ্ঞান জন্মিবার আগেই তাহার মনে সৌন্দর্য্য জ্ঞান জন্মায়। সেই সৌন্দর্য্য জ্ঞান জন্মিতে পারে তখনই, যখন সে প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়।

সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু শিশুকালে তীক্ষ্ণ থাকে, বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিংবা শেলি যে কবি হইয়াছিলেন তার বড় কারণ তাঁহারা শৈশবে মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বড় হইয়াছিলেন। আমরা বলি— অমুক লোকটার সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি প্রখর। সে দৃষ্টি তাহার বড় হইয়া প্রখর হয় নাই। কাহারও হয় না। শৈশবের প্রখর দৃষ্টিশক্তি বড় হইয়াও ঝাপ্‌সা হয় নাই, এই মাত্র।

৮। প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর পরিচয়

এই জন্যই শিশুকে স্বাভাবিক দৃশ্য ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে। দেখার চক্ষু তাহার থাকিতে পারে, দেখার বস্তু না পাইলে সে দেখিবে কি? এবং এই দেখার বস্তু গ্রামে যত মেলে সহরে তত মেলে না। গ্রামের পথের দুইধারে আছে নালা, খাল, গাছপালা; তাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সহরের পথে চলিতে দুইধারে দেখি আলাদা আলাদা বাড়ী, অফিস, দোকানঘর—কাহারও সহিত কাহারও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। গ্রামে চলিতে শিশু সবশুদ্ধ একটা ধারাবাহিক চিত্রের সারি মনের মধ্যে আঁকিয়া নেয়। সহরের পথে সে পায় টুকরা টুকরা ভাঙ্গা ছবি। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। তাই সে ছবি সম্পূর্ণ নয়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার মন নূতন ছবি তৈরী করিতে পারে না।

স্বভাবের কোলে যে বস্তুগুলি দেখা যায়, তাহারা পরস্পরের সম্পর্কে সংবদ্ধ। একটা হইতে অন্যটার কথা আপনি মনে আসে। পাথরের

নুড়ি হাতে নিলাম, তার কিনারাগুলি ঘষা। ঘষিল কিসে? জলের স্রোতে। নুড়ি হইতে জলের একটা গুণ বা শক্তি চিনিলাম। বস্তুগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে এইটা হয় না। তাই সে জ্ঞানটাও বিভিন্ন টুকরার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

মা শিশুকে প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন, এবং যাহা সে দেখে তাহার সম্বন্ধে তাহার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবেন। প্রকৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডারের সন্ধান যে পাইল, সেই তো শক্তিমান্—পৃথিবী চলে তাহার ইঙ্গিতেই। আপনার শিশুকে আপনি সেই শক্তির সন্ধান দিবেন না? তাহাকে চিরকালের মত দুর্ব্বল ও মূর্খ করিয়া রাখিবেন, ইহা কি হইতে পারে? শিশুকে প্রকৃতির কোলে ছাড়িয়া দেওয়ার আরও একটা বড় সুফল আছে—ইহাতে তাহার উচ্ছৃঙ্খল হইবার ভয় থাকে না। শিশু ও কিশোরের মনে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্যম আছে। অথচ সে তুলনায় তাহার হাতে কাজ কম। বেকার শরীর ও মন লইয়া বসিয়া থাকিলে তাহার প্রবৃত্তি কুপথে চলিতে পারে। তাহাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সন্ধান দিন। সমস্তখানি বাড়তি সময় সে সেই সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে। উচ্ছৃঙ্খল পথে চলিবার কথা তাহার মনেই হইবে না।

৯। প্রাকৃতিক ভূগোল

শিশুর মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ জন্মাইবার প্রয়োজন লইয়া এতক্ষণ কথা বলিলাম। এবার আমরা আবার আমাদের পুরাণো কথায় ফিরিয়া যাইব। শিশুকে বেড়াইবার ফাঁকে ফাঁকে, খেলার ফাঁকে ফাঁকে, আর কি রকমের শিক্ষা দেওয়া যায়?

ধরুন একটা বস্তু তাহার জানা দরকার, ভূগোল। নদী কাহাকে বলে, হ্রদ কাহাকে বলে জানা দরকার। অথচ নদী ও হ্রদ হয়ত ইচ্ছা করিলেই দেখা যায় না। বাড়ীর ধারে সেগুলি না-ও থাকিতে পারে। এইগুলি চিনাইবার কিন্তু একটা সহজ পন্থা আছে, ছোট বস্তুর নমুনা দিয়া। বেড়াইবার সময় মা এটা সহজেই করিতে পারেন। এটা অতি সুন্দর খেলাও বটে।

পথের ধারে একটা ডোবা। ওটা কি? হ্রদ ঐ রকম হয়। একটা খাল,— নদী ঐ রকম হয়। বৃষ্টির জল মাঠের ধার দিয়া ছুটিয়া নামিতেছে— পাহাড়ী ঝরণা ঐ রকম আসে। জলটা কোথাও নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে— জলপ্রপাত। উইয়ের ঢিপি— পাহাড়। এই রকম করিয়া সব জিনিষের নমুনা দেখানো যায়। ম্যাপ দেখার অভ্যাস পরে করানোই ভাল। যখন সে বড় হইবে, 'ম্যাপ' বস্তুটা কি সেই ধারণা তাহার হইবে।

সূর্য্য দেখিতে শিশুকে শিখান। সূর্য্য কখন কোথায় থাকে তাই দেখিয়া সময়ের আন্দাজ সে করিতে শিখুক। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় কি বস্তু, তাহা দিয়া কি কাজ হয়— সেটা তাহাকে শিখান। বই পড়ার চেয়ে সত্যকার বৃষ্টিতে মাটি ভিজিতে ও তাহার ফলে গাছ বাড়িতে দেখিলেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

দূরত্বের ধারণাও তাহার জন্মানো যায় এই ভাবে। খোকা হাঁটিতেছে; কেহ মাপিয়া বলিয়া দিলেন, একবার পা ফেলিয়া সে এত ইঞ্চি যায়। তাহা হইলে বারান্দাটা মোট কত পা লম্বা? খোকা গুনিয়া গুনিয়া পা ফেলিয়া হাঁটিয়া আসিল। তারপর অঙ্ক কষিল, এত পা × এত ইঞ্চি। এইভাবে বাড়ীর মধ্যেই সব বারান্দা ও ঘর, উঠান ও ছাদ এবং কোন খাট হইতে আলমারী কতদূর, সে মাপিবে

তারপর তাহাকে সময়ের আন্দাজ দিন। এক মিনিটে সে এতবার পা ফেলে; অতএব এত ফিট্ চলে। তাহা হইলে একশ গজ, কিংবা এক মাইল হাঁটিতে তাহার কতক্ষণ লাগিবে?

দূরত্বের খানিকটা ধারণা হইলে তাহাকে দিক্ চিনাইতে হইবে। দিক্ চিনাইবার একটা সুন্দর উপায় সূর্য্যের গতি চিনানো। সূর্য্যের অবস্থান ও ছায়ার হেলন দেখিয়া সে দিক্ চিনিতে শিখিবে। সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ডানদিকে দক্ষিণ, বাঁয়ে উত্তর, সামনে পূর্ব্ব, পিছনে পশ্চিম সে চিনিতে পারে; নূতন জায়গাতে গিয়াও এই উপায়েই আমরা দিক্ ঠিক করি। বাড়ীর বা স্কুলের দরজা-জানালা কোন্‌টা কোন্ দিকে তাহা সে স্থির করিতে শিখুক। ছায়ার পর দেখিতে শিখুক হাওয়ার গতি। ধোঁয়া, ঘুড়ি, গাছের পাতা কোন্‌দিকে উড়িতেছে, দেখিলেই হাওয়ার গতি সে ঠিক পাইবে। জোর হাওয়া ত এমনিই চেনা যায়। হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশেষত্ব তাহাকে মুখস্থ করানো যায়— উত্তর বায়ুতে বৃষ্টি, পুব হাওয়াতে বৃষ্টি ও ঝড়।

ইহার পর ক্রমে দূরত্ব ও দিক্, দুইটা একত্রে লক্ষ্য করিতে সে শিখিবে। অমুক বাড়ীটা এত গজ উত্তরে। অমুক বাড়ীটা উত্তরে—সোজা উত্তরে নয়, একটু পশ্চিমেও। কোণাগুলির ধারণা আসে এইভাবে। ইহার পর তাহাকে কম্পাস দেখিতে শিখানো যায়। কম্পাস-হাতে দাঁড়াইয়া নিজে ঘুরিলে কম্পাসের কাঁটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া যায়। এটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত মজার খেলা ও কৌতূহলের বিষয়। ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করুক, তারপর ইহার কারণটা তাহাকে বুঝাইয়া দিন, সে বুঝিবে।

এইবার তাহার শিখিতে হইবে সীমানা। বাড়ীর উঠানটার সীমানা কি? উত্তরে ঘর, দক্ষিণে বাগান, পূবে পাঁচিল, পশ্চিমে ঘর।

সীমানা সেই বস্তু যেটা ঠিক এই জায়গাটার গায়ে লাগিয়া আছে।

দুটা ক্ষেত যদি পাশাপাশি থাকে, মধ্যে বেড়া বা জায়গা কিছু না থাকে, তবে তাহারাই পরস্পরের সীমানা। বাড়ীঘর এবং গ্রামের জিনিষগুলির সীমানা শিশু চিনিতে শিখুক। তাহা হইলে আরও বড় হইয়া— "উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর" পড়িয়া সে ভয় পাইবে না। তাহার অর্থ তখন সে বোঝে।

ইহার পর কোন জায়গা দেখিলেই তাহার সীমানা সে নিজে হইতেই লক্ষ্য করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিষ তাহাকে লক্ষ্য করিতে শিখান— জমির শস্য ইত্যাদি।

মাঠ আছে কি ধানক্ষেত আছে, বালুমাটি না পাহাড়, এটা লক্ষ্য করিতে শিখুক। তাহা হইলে পরে কোন্ মাটিতে কোন্ শস্য জন্মে সহজে বুঝিবে। এখন অবশ্য তাহাকে ইহা শিখাইবার দরকার নাই; এখন শুধু সে শস্য ও মাটিটাই দেখিবে।

সীমানার ধারণা হইয়া গেলে, যা সে দেখিল মাটিতে তাহার মানচিত্র আঁকিতে দিবেন। কোনটা চৌকোণা জমি, কোনটা তিনকোণা, এইটুকু সে প্রথমে আঁকিবে। তারপর ক্রমে সেই মানচিত্র মাপ ঠিক করিয়া আঁকিবে। তাহার কয় পায়ে কয় ফুট হয় সে জানে ত? বাগানটার চার পাশে সে হাঁটিয়া মাপিয়া আসুক। তারপর প্রতি দশহাতে এক-পা করিয়া মাপিয়া মাটিতে দাগ টানিয়া বাগানের মানচিত্র আঁকুক। বাড়ীর মানচিত্র আঁকিলে, তাহার কোথায় ঘর, কোথায় পুকুর, কোথায় বাগান, সব আঁকিয়া বসাইতে শিখুক। আঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম লিখিয়া দিতে হইবে; না হইলে মানচিত্র সম্পূর্ণ হয় না।

অনেক সময় বাড়ীর কাছাকাছিই পাহাড়, হ্রদ, নদী, উপনদী ইত্যাদি থাকে। সেইক্ষেত্রে শিশু দেখিয়াই সব চিনিতে পারে। যেখানে যেটা

নাই, সেখানে নমুনা দিয়া চেনার কথা আগে বলা হইয়াছে। যেগুলি আছে, সেগুলি আসল বস্তু দেখাইয়াই চেনানো ভাল। ভূগোলের জ্ঞান ইহাতে সম্পূর্ণ হয়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে এই সবের মানচিত্র তাহাকে আঁকিতে হইবে। অবশ্য এই মানচিত্র অর্থ কাগজে রং দিয়া আঁকা নয়। মাটিতে দাগ টানিয়া বা মেঝেয় চক্ কি কয়লা দিয়া আঁকিলেই হইবে।

১০। শিশু ও প্রকৃতি

এই বিরাট তালিকা দেখিয়া মা'র ভয় পাইবার কারণ নাই। ইহার সমস্ত কথা তাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। বরং বেড়াইতে বাহির হইয়া শিশুর সঙ্গে তিনি যথাসম্ভব কম কথা বলিবেন। শিশুরা সাধারণতঃ মা'র সঙ্গে কথা বলিতে খুব বেশী ভালবাসে। খেলা বা বেড়ানো ছাড়িয়াও তাহারা মা'র সঙ্গে গল্প করিতে চাহিবে। মা'র তখন কর্ত্তব্য বই বা সেলাই লইয়া এমন ভাব দেখানো যেন তিনি মোটেই গল্প করিতে রাজী নন। শিশু বাধ্য হইয়া আবার খেলিতে যাইবে, গাছপালা ফুল আবিষ্কার করিতে যাইবে। মা শুধু হইবেন পরিচায়ক। সে যেটা চিনিতে চাহিবে বা তাহার যেটা চেনা দরকার, তিনি চিনাইয়া দিবেন, বুঝাইয়া দিবেন, প্রয়োজন মত তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিবেন। মেঘটা কি সুন্দর দেখেছ? পাহাড়ের রং বদলে গেছে, দেখেছ? বাকিটা সে নিজেই দেখিবে। তারপর প্রকৃতি নিজেই তাহাকে নিজের রূপে মুগ্ধ করিয়া বশ করিয়া ফেলিবে। মা'র তাহা লইয়া ভাবিতে হইবে না। তাঁহার শুধু দেখিতে হইবে যেন শিশু নিজের মায়ের দিক্

হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই বৃহত্তম মাতা— প্রকৃতির দিকে চাহিতে শিখে। আর একটি কাজ মা করিবেন। প্রত্যহই করিবার দরকার নাই। সপ্তাহে কি মাসে একদিন করিলেই যথেষ্ট। কাজটা হইল, কোন একটা সুন্দর ও মহৎ বস্তুর দিকে শিশুর চক্ষু আকৃষ্ট করিয়া দেওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও আধার সেই ঈশ্বর আরও কত সুন্দর ও মহান্ এই কথাটি তাহার কানে তুলিয়া দেওয়া। এই উপায়ে শিশু অতি সহজেই সৌন্দর্য্যময় বলিয়া ঈশ্বরকে চিনিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শেখে। রাশিকৃত ধর্ম্মোপদেশের চেয়ে এই খেলা বেশী ফলদায়ক হয়।

১১। খেলা

এতক্ষণ প্রধানতঃ খেলার কথাই বলা হইল। খেলার কথার মধ্যে আর একটু কথা বলিয়া নিই, সেটা পড়ার কথা।

অবশ্য পড়া বলিয়াই সেটা ভয়ঙ্কর, এমন মনে করার কারণ নাই। পড়া একসঙ্গে বেশিক্ষণ হইবে না। এবং খেলার ফাঁকে ফাঁকে হইবে, কাজেই তাহার চাপটা শিশু টের পাইবে না।

প্রত্যহ কয়েকটি— দুটাই হোক বা দশটাই হোক, সাধ্য অনুসারে নূতন শব্দ শিশু শিখিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো শেখা কথাগুলিও একবার আবৃত্তি করিয়া লইবে, যেন ভুলিয়া না যায়। প্রথম দিকের শেখা মুখে মুখে, লেখার প্রশ্ন আসিবে পরে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন উচ্চারণ বিকৃত বা অস্পষ্ট না হয়।

বিকালবেলাটা বড়-ছেলেদের খেলার সময়। স্কুল হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়া তখন একটু ছুটাছুটি করাই দরকার। না হইলে তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক ভারী হইয়া থাকিবে। ছোট শিশুরা সারাদিন দৌরাত্ম্য

করিয়া শ্রান্ত, অতএব তাহারা বিকালে ঠাণ্ডায় একটু ঘুমাইয়া লইলে তাহাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না।

খেলার সময় ছেলেরা চীৎকার করে; চীৎকার করাটা খানিকটা দরকার, ফুস্ ফুস্ ও গলার পেশীর ব্যায়ামের জন্য। অনেকে বলেন 'ছেলের গলা দুর্ব্বল।' দুর্ব্বল কেন হয় তাহা তলাইয়া দেখেন না। গলার পেশীও ব্যায়ামে বাড়ে। না চেঁচাইলে গলায় জোর হইবে কেন? চেঁচাইলে যাহাতে অন্য লোকের অসুবিধা না হয়, সেই জন্যই খেলা ও বেড়ানোর জন্য লোকালয়ের বাহিরে ফাঁকা মাঠে যাওয়া ভাল। সেখানে নিঃসঙ্কোচে চেঁচানো যায়। মন খুলিয়া খানিক চেঁচাইতে পারিলে মনও হালকা হয়, মনে ফুর্ত্তি আসে।

কণ্ঠনালীর ব্যায়ামের জন্য গলা সাধা ও গান গাওয়া অতি ভাল কাজ। শিশুকে গান শিখান সম্ভব হইলে উপেক্ষা করিবেন না। গানে মন প্রফুল্ল ও উন্নত করে, গলার ব্যায়াম হয়, ফুসফুসের পেশীগুলির জোর বাড়ে।

খেলা অনেক রকমই হইতে পারে, তাহার পুরা তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। দেশী ও বিলাতী অনেক খেলাই স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। অবস্থা, বয়স ও সুবিধা অনুসারে খেলা সকল ছেলে মেয়েই অভ্যাস করিতে পারে।

ছুটাছুটি হুটোপাটির মতই একটা অতি চিত্তাকর্ষক খেলা গাছে বা টিলায় চড়া। মায়েরা এ খেলাটা বিশেষ পছন্দ করেন না। তাঁহাদের কেবলই ভয় হয়, এই বুঝি ছেলে পড়িল, এই বুঝি হাত পা ভাঙ্গিল, জামাকাপড় ছিঁড়িল।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে বাধা দেওয়ার অর্থ হয় না। ছোটকালে একটু একটু করিয়া লাফাইতে, অল্প একটু গাছে চড়িতে শিখাইলেই

ত হয়; তাহা হইলে বড় হইয়া বড় গাছেও সে নির্ভয়ে উঠিতে পারিবে।

অনেক সময়ে মায়েরা নিজেরাই বিপদ্ বাধান। ছেলে যখন গাছের আগায় তখন মা চেঁচাইয়া উঠেন, "ওরে পড়বি, শিগ্‌গির নাম"। হাঁকের চোটে ছেলে ঘাবড়াইয়া যায়, তাহার চক্ষু ও হাত স্থির থাকে না এবং তাহার ফলেই সে আরও সহজে পড়িয়া যায়। মা যদি এক্ষেত্রে সংযম অভ্যাস করিতে পারেন তবে ছেলের বিপদ্ কম হইবে।

বারণ না করাই উচিত। পুরুষ-ছেলে (এবং এখনকার দিনে, মেয়েও) ডানপিটে হইবে না ত কি মায়ের আঁচল-ধরা হইয়া জীবন কাটাইবে? তবু যদি বারণ করিতে হয় অন্য সময়ে করিবেন। সে যখন গাছের মাথায়, তাহার সমস্ত মন ও শক্তি যখন কেন্দ্রগত, তখন আচম্‌কা হাঁক দিয়া বা কান্না জুড়িয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিবেন না।

গাছে চড়ার পরই স্বাভাবিক খেলার নাম করা যায়, নৌকা চালানো, এবং সাঁতার কাটা। গ্রামের ছেলের পক্ষে এগুলি মোটেই অসাধ্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়; সহরের ছেলেরাও ইচ্ছা করিলে নৌকা চালানো ও সাঁতার কাটা শিখিতে পারে। পুকুর শহরেও থাকে এবং আজকাল সাঁতারের ক্লাবও বড় বড় সহরে গঠিত হইতেছে।

১২। রোদ-বৃষ্টি

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রোদ ও বৃষ্টি শিশুর পক্ষে অমূল্য ধন। বিশুদ্ধ বায়ু যেমন না হইলেই চলে না, তেমনি সূর্য্য-কিরণ না হইলেও মানুষের চলে না। বিশেষভাবে শিশুরা চায় উন্মুক্ত আকাশের তলে অবাধ সূর্য্যালোক, যাহাতে তাহাদের রক্তে জন্মিবে প্রচুর "রক্ত-কণিকা",

গাল হইবে টুক্‌টুকে, চামড়া হইবে সুস্থ সবল। সূর্য্যের আলোকে এমন একটা জীবনী শক্তি থাকে, যাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেই জন্যই খালিগায়ে, খালি মাথায় সহ্য-মত "রোদে ঘোরা" মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর নয়। উৎকট, অসহ্য রৌদ্রে অবশ্য বেশীক্ষণ না থাকাই ভাল।

কিন্তু শুক্‌না দিনে বেড়ানো সম্বন্ধেত প্রশ্ন নয়; বরং বাদ্‌লা দুর্য্যোগ আরম্ভ হইলেই ঘর হইতে বাহির হওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তবুও বাদলার মধ্যে দেখার মত বস্তু আছে। বৃষ্টির একটা নিজস্ব রূপ আছে, মনের উপর ও স্নায়ুর উপর তাহার একটা বিশেষ ক্রিয়া আছে; বৃষ্টি স্নায়ুকে শান্ত করে। বর্ষাকালে যে সব জায়গা বর্ষার জলে ভরিয়া যায় সেখানে তো রীতিমত সৌন্দর্য্যের মহোৎসব। শিশুদের বৃষ্টির ও বন্যার জলে খেলিতে ছাড়িয়া দিন, দেখিবেন কি মহা-উৎসাহে তাহারা লাফাইতেছে। তাহাদের অসুখ করিবে বলিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই। বৃষ্টির জলে শরীর সুস্থই হয়, অসুখ করে না। ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য যেটুকু দরকার সতর্ক হইলেই হইল। ভিজা শেষ হইলে যেন আর তাহারা ভিজা কাপড়ে না থাকে। তৎক্ষণাৎ কাপড় বদ্‌লাইয়া গরম কাপড়-চোপড় পরিলে শরীর ঝরঝরে লাগিবে। বর্ষার মধ্যেও রোজ কিছুক্ষণ তাহাদের বেড়াইতে যাওয়া নিয়ম করিয়া বৃষ্টিতে ভিজার অভ্যাস করা ভাল। বৃষ্টিতে ঝর্ণা-স্নানের (shower bath) কাজ করে। বৃষ্টির জলে ময়লা থাকে না। অসুখ করে জলে নয়, ময়লাতে। শুধু লক্ষ্য রাখিবেন, যেন বসিয়া বসিয়া তাহারা ভিজা কাপড়ের জল গায়ে না শুকায়, আর ভিজা জুতা পরিয়া পায়ে ঠাণ্ডা না লাগায়। ভিজা জুতা পরার চেয়ে খালিপায়ে চলা ভাল, তাহাতে পায়ে জল বসে না। বৃষ্টির মধ্যে এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইতে ছাতি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু 'ওয়াটার

ক্রেক্' জড়াইয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া চলিবে না। ওয়াটার প্রুফের মধ্যদিয়া হাওয়া চলে না, দেহের ঘাম শুকায় না। ওয়াটার প্রুফ জড়াইয়া বেশীক্ষণ থাকিলে কিংবা হাঁটিলে শরীরে গরম লাগিবে, হয়ত সর্দ্দিও লাগিবে। তার চেয়ে বরং একটু ভিজিলে শরীরটা তাজা হইবে, অসুখও করিবে না।

১৩। "বন্য জীবন"

'বন্য' জীবনে মানুষের অনেকগুলি চেতনা তীক্ষ্ণ থাকে, 'সভ্য' জীবনে তাহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে। চক্ষু, কান, নাক— অসভ্যদের এই ইন্দ্রিয়গুলি সভ্য মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ। চর্চ্চা রাখিলে দেখা এবং শোনার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এই চর্চ্চার এক নূতন পন্থা বাহির করিয়াছেন স্যার রবার্ট্ ব্যাডেন্-পাওয়েল। তাহা হইতেছে "স্কাউট্ আন্দোলন।" স্কাউট্দের মধ্যে যে সব খেলা প্রচলিত তাহা শিশুদের বড়ই উপযোগী। শিশুদেরে এই খেলা সহজেই শেখানো যায়। একটি খেলার বর্ণনা দিতেছি :—

জন-চারেক শিশুর একটি দল কোথাও লুকাইবে। লুকাইবার জায়গা তাহারাই বাহির করিবে। তাহারা লুকাইলে দ্বিতীয় দল খুঁজিতে বাহির হইবে। প্রথমে তাহারা বাহির করিবে লুকাইবার জায়গাটা, তারপর বাহির করিবে মানুষ। তাহারা টের না পায় এমন ভাবে ধীরে ধীরে তাহাদের যতটা সম্ভব কাছে যাইতে হইবে— যেন সন্তর্পণে শত্রুশিবিরে যাইয়া তাহাদের তথ্য জানিয়া আসা হইতেছে।

এই রকমের আর একটি চমৎকার খেলা পাখী আবিষ্কার। পাখীর ডিম

ও ছানা পাড়িয়া আনারই উৎসাহ ছেলেদের থাকে। এটা বড় নিষ্ঠুর খেলা। তাহার চেয়ে তাহাদের পাখী চিনিতে শিখান। শুধু গান শুনিয়া, না দেখিয়া, তাহারা স্থির করিবে এটা কি পাখী, কোথায় বসিয়া আছে। তারপর চেষ্টা করিবে তাহার যথাসম্ভব কাছে যাইতে। এ খেলায় ধৈর্য্য ও দক্ষতা দুইটাই লাগে। অতি ধীরে ধীরে, হয়ত শুইয়া বুকে হাঁটিয়া পাখীর কাছে যাইতে হইবে, যেন সে টের না পায়, উড়িয়া না যায়। পারিলে পাখীর তিন চার হাতের মধ্যে যাইতে হইবে। তারপর সেখানে বসিয়া বসিয়া তাহার গান শোনা, নাচ দেখা। পাখীর মনে সন্দেহ নাই, ভয় নাই, কাজেই এই গান ও নাচ সত্যই উপভোগ করিবার মত বস্তু। সত্যকার ধৈর্য্য ও আত্মসংযমেরও প্রয়োজন হয় এই খেলায়; কারণ এতটুকু নড়াচড়া শব্দ করিলে পাখী তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইবে।

১৪। স্বাস্থ্যের আদর্শ

প্রত্যেক শিশুর সম্বন্ধে যেমন একটা শিক্ষার আদর্শ সৌন্দর্য্যের আদর্শ থাকিবে তেমনি যেন একটা স্বাস্থ্যের আদর্শও থাকে। এবং সেই আদর্শকে কাজে ফুটাইবার ভার পিতামাতার। মোটা শিশুই সুস্থ শিশু নয়। শিশুকে মোটা করা সহজ; স্বাস্থ্যবান্ করিতে হইলে সতর্ক দৃষ্টি ও শ্রম চাই। শিশুর দেহে থাকিবে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, চক্ষে থাকিবে উৎসাহ-উদ্দীপনার আলো, মুখে থাকিবে আনন্দের ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার রশ্মি, তবে না তাহাকে দেখিয়া পিতামাতার এবং অন্য লোকেরও প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিবে। সেই সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে জন্মাইতে পারেন পিতামাতাই।

তৃতীয় ভাগ

১। প্রাকৃতিক নিয়মের উপরেই শিক্ষার ভিত্তি

অভ্যাসের শক্তি স্বভাবের দশগুণ—

শিক্ষার ভিত্তি হওয়া চাই প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এই কথাটাই আমি বলিতে চাই। এইজন্যই এই পুস্তকের প্রথম দিকে আমি সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থ দেহের উপর এত বেশী জোর দিয়াছি।

তার পরেই আমি জোর দিয়াছি ঘরের বাহিরে প্রকৃতির কোলে সময় কাটানোর উপর। ছয় সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা যাহা শেখে সেটা পুঁথির বিদ্যা ততটা নয়, যতটা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়। পৃথিবীকে নিজের চোখে না দেখিলে সেই পরিচয় হইবে কি করিয়া? পৃথিবীকে দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহার ইন্দ্রিয়সকল সচেতন ও সবল হইবে। সে সমস্ত জিনিষ দেখিতে ও বুঝিতে শিখিবে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়া ক্রমে তাহার মধ্যে সুপ্ত মনটি জাগিয়া উঠিবে। শিক্ষকের বাহাদুরী হইবে—সেই খানেই তাহাকে ঠিক পথে চালাইয়া নেওয়া, তাহার সম্মুখে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ধরিয়া দেওয়া, যেন এই জাগরণের ব্যাঘাত না হয়।

এইবার আমরা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল একটা ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিব। জটিল হইলেও শিক্ষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব এই সমালোচনা না করিলে চলে না। একটা কথা আছে, "Habit is second nature"— অভ্যাসই ক্রমে স্বভাবে দাঁড়ায় আমি বলি, "Habit is ten natures"— অভ্যাস স্বভাবের চেয়ে দশগু

বেশী শক্তিশালী। অভ্যাস শিশুকে গড়িবার যন্ত্র। মা তাঁর শিশুকে যে রকম দেখিতে চাহেন, অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে সেই রকম করিয়া তিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন। অবশ্য কাঁচা মালটা হইল শিশু নিজে; সেটা অপদার্থ হইলে কোন কাজই হয় না। কিন্তু কাঁচা মাল ভাল হইলেও যন্ত্র ও যন্ত্রী ভাল না হইলে সব নষ্ট হইবে।

অভ্যাসের শক্তির উপর আমার নিজের দৃঢ় আস্থা আছে। এই আস্থা জন্মিয়াছে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা হইতে। নিজের অভিজ্ঞতাটাই আমি এখানে বলিব। আমি জানি, "স্বভাব শক্তিশালী"; কিন্তু সেই স্বভাবকেও ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে "অভ্যাস", এবং অভ্যাসের মূলে থাকে "শিক্ষা"।

২। নিজেদেরে চালাইবার মত জোরালো ইচ্ছাশক্তি শিশুদের থাকে না

কয়েকবছর আগের কথা। আমি তখন মাত্র শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছি। শিক্ষকের কর্ত্তব্য অতি মহৎ; নিজের ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্যা বলিতে যা কিছু আছে তাহা ছাত্রের মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষকের সার্থকতা; এই সব আদর্শে তখন আমার মন ভরপুর।

এই সময়ে আমি প্রথম এই কথাটি শুনি, "অভ্যাসের জোর দশটা স্বভাবের সমান।" আমাদের পাদ্রী সাহেব কথাটি বলিতেন, প্রতি রবিবার গীর্জ্জায় যাইয়া কথাটা শুনিতাম।

ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে লক্ষ্য করিলাম, তাহাদের আশানুরূপ উন্নতি হয় না। দোষগুলিও যায় না, গুণগুলিও বাড়ে না। যে যেমন আছে, তেমনি থাকিয়া যায়। পড়ার ব্যাপারেও তাই— যে পড়া পারে না, সে কোন দিনই পারে না; যে পারে, রোজই পারে।

কেন তাহাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে না, এই চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল। শিক্ষা সম্বন্ধে যা বই পাইতাম সবই পড়িয়া দেখিতাম, ইহার রহস্যের সন্ধান পাই কিনা। বিশেষ কিছুই পাই না। ছেলেরা, মেয়েরা, ভাল হইতে চায় না এমন নয়। ভাল হইতে চায়, হয়-ও, কিন্তু থাকিতে পারে না। একদিন কষ্টে আত্মসংযম করিয়া লক্ষ্মীছেলে হয়, পরদিন আবার দুষ্টুমি করিয়া বসে।

অনেক ভাবিয়া ইহার কারণ আবিষ্কার করিলাম। ভাল হইবার ইচ্ছাটা শিশুদের মনে থাকে; থাকে না সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করিতে যে দৃঢ় সংকল্প লাগে, সেইটা। সদিচ্ছা তাহার মনে থাকে, কাজ করার মত জোরটা মনে থাকে না। সেই জোরটা যোগাইবার ভার পিতামাতা লইতে পারেন, শিশুকে ঠিক মত চালিত করিয়া।

তাই বলিয়া পিতামাতার আদেশের উপরেই সারাক্ষণ নির্ভর করিলে চলিবে না। তাহাতে শিশুর মন অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া যায়। তারপর আর নিজে নিজে কিছু করার শক্তি ও সাহস তাহার থাকে না। ত্রিশ বছর বয়সেও সে "খোকা"-ই থাকে।

নিজের ভার নিজে নিয়া চলার শক্তি তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। অথচ শিশুর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ, কোন ব্যাপারে কর্ত্তব্য স্থির করা। সেটা তাহার সাধ্যের বাহিরে। তাই তাহার বিবেচনার উপর তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া, সেই কর্ত্তব্যবোধ ও কর্ত্তব্য-করাটাকেই তাহার অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে।

ইহা লইয়া ভাবিতে গিয়া আমি হঠাৎ আমার প্রশ্নের সমাধান পাইয়া গেলাম। স্বভাব কি? অভ্যাসই বা কি? এই দুইটার স্বরূপ বুঝিলেই কথাটা সহজ হইয়া যায়।

৩। স্বভাব কি ?

স্বভাব বলিতে শিশুর স্ব (নিজের) ভাব, অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে বুঝায়। কতগুলি বিশেষ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া শিশু জন্মায়। এই যে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা— ইহা সকল শিশুর মধ্যেই বর্ত্তমান। এখানে সভ্য, অসভ্য, কালাধলার প্রভেদ নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম, ন্যায়-অন্যায়-বোধ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-বোধ মোটামুটি গোড়ায় সকলের একই প্রকার।

একটু তফাৎ অনেক সময়ে হয়, বংশানুক্রমের ফলে। পিতামাতার, পিতামহ-মাতামহের দোষগুণ, শিশুর মধ্যে বর্ত্তায়; এবং তাহার ফলে শিশুতে শিশুতে তফাৎ হয়। কিন্তু সে-তফাৎ প্রকারের ততটা নয়, যতটা পরিমাণের। সবলদেহ, সবলচিত্ত পিতামাতার সন্তান সবল হয়; দুর্ব্বল পিতামাতার সন্তান দুর্ব্বল হয়; এই মাত্র। ইহার সঙ্গে অবশ্য শিশুর নিজের স্বাস্থ্যের ফলও যুক্ত হয়। সবল পিতামাতার পুত্রের নিজের স্বাস্থ্য যদি ভাঙ্গা হয়, তবে আর সে সবল হইবে কি করিয়া ?

আসলে নানা বৃত্তি ও নানা প্রবৃত্তি একত্রে জড়িত হইয়া সৃষ্টি হয় মানুষের স্ব-ভাব। এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তির কতক ভাল, কতক মন্দ। ভালগুলিকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, মন্দগুলিকে উচ্ছেদ করা যদি সম্ভব না-ই হয়, অন্ততঃ দমন করিতে হইবে। এইখানেই শিক্ষকের ও অভিভাবকের প্রয়োজন।

অনেক সময়েই পিতামাতা শিশুর সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। বলেন, তাহার শুভবুদ্ধিই তাহাকে সৎপথে চালাইবে; আমাদের হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। কথাটা ভুল। শুভবুদ্ধি তাহার থাকিতে পারে; কুবুদ্ধিও ত আছে! এবং সেই কুবুদ্ধিকে জয় করার মত শক্তি শিশুর নাই।

শিশুকে যদি রীতিমত ভাল করিয়া না তোলা হয়, সে রীতিমত মন্দ হইয়া যাইবে। এইটাই সাধারণ নিয়ম। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যাইতে পারে, কাহারও যত্ন ছাড়াও শিশু "মানুষ" হইয়া উঠিল—নিজের চেষ্টায় বা ঘটনাচক্রে। কিন্তু সেগুলি একান্তই আকস্মিক ঘটনা, সচরাচর ঘটে না। তাহার ভরসায় থাকিয়া লাভ নাই।

এইবারে আমি পথের ইঙ্গিত পাইলাম— শিশুর মনে শক্তি নাই, সেই শক্তি জাগাইতে হইবে। কিভাবে জাগাইতে হইবে, তাহার স্পষ্ট ধারণা তখনও আমার মনে আসে নাই। তবুও নির্ভুল পথের সন্ধান ত পাইয়াছি! আমি আরও উৎসাহে অনুসন্ধান করিতে লাগিয়া গেলাম।

একটা কথা বুঝিতেছিলাম। শিশুকে ধীরে ধীরে শিখাইয়া দিতে হইবে, কিভাবে তাহার নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে সে নিজের বুদ্ধি ও ইচ্ছামত চালাইতে পারে। কোন্‌টা তাহার মধ্যে ভাল প্রবৃত্তি, কোন্‌টা অনিষ্টকর, এই বিচার করাই শক্ত— সেই বিচার তাহাকে কি করিয়া শিখানো যায় তাই লইয়াই যত গোল।

অনেকে বলেন, ঈশ্বরের দয়া ছাড়া এই বুদ্ধি জাগে না। ঈশ্বরের দয়া হয়ত পাওয়া যায়; কিন্তু সে-দয়ার অধিকারী তাহারাই, যাঁহারা নিজের শক্তিতে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করেন। অসংখ্য পিতামাতা এই ভুল করেন— ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া ছেলেকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, যেন ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাদের ছেলের মাষ্টারমশাই হইয়া বসিবেন। অনেক সময় হয়ত ছেলে ভালই উৎরাইয়া যায়, পিতামাতা ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু সেইটুকু উৎরাইতে ছেলের যে পরিমাণ কষ্ট, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও ঝড়ঝঞ্ঝা সহিতে হয়, তাহা সহিতে হইত না, যদি ঈশ্বরের ও তাহার উপর দায়িত্ব ছাড়িয়া না দিয়া পিতামাতা নিজেরাই তাহাকে একটু চালাইয়া নিতেন, একটু সাহায্য করিতেন।

একটা কথা তাহা হইলে পাওয়া গেল— স্বভাব মানুষের সহজাত, কিন্তু তাহা অজেয় কিংবা অপরিবর্তনীয় নয়। স্বভাবকে জয় করিয়া বা ইচ্ছামত বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া তবেই শিশুর প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বভাবের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহাকে নিজের খেয়ালে চলিবার জন্য রাশ ছাড়িয়া দিলে হইবে না।

এখন প্রশ্ন— কি উপায়ে স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়?

৪। স্বভাবের স্থান অভ্যাস দখল করিতে পারে

'অভ্যাস'ই সেই নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র—

অভ্যাস ঠিক স্বভাবের মতই মনের ও প্রকৃতির মধ্যে যাইয়া কাজ করে। ভীরু ছেলে অভ্যাসবশেই মিথ্যা বলিয়া অন্যায়ের শাস্তি এড়াইতে চায়; সহৃদয় শিশু অভ্যাসবশেই ভিক্ষুককে তাহার খাদ্যের ভাগ দেয়। এইভাবে থাকিতে থাকিতে অভ্যাস ক্রমে স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায় এবং পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহার শক্তি বাড়িতে থাকে।

অবশ্য স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অভ্যাসকে সকল সময়েই স্বভাবের অনুসরণ করিলে চলিবে না। স্বভাবগত ভাল গুণগুলিকে যেমন অভ্যাসের দ্বারা দৃঢ়তর, পূর্ণতর করিয়া তুলিতে হইবে, স্বভাবগত দোষগুলিকেও তেমনই বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা বিনষ্ট করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অভ্যাস স্বভাবের ঠিক বিপরীত দিকে চলে।

অভ্যাসের ফলে শিশুদের মধ্যে সদ্‌গুণের দেখা দেয়, ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র মিলে। অনেক শিশু আছে, তাহারা কাপড়-জামায় হাত

যোছে না। বাড়ীর খবর বাহিরের লোককে বা একের খবর অন্তকে বলে না। কেহ প্রশ্ন করিলেও এড়াইয়া যায়। বড়দের সম্মান করে, দরিদ্রকে দয়া দেখায়। এই সকলই অভ্যাসের ফল।

এই অভ্যাস তাহারা শিখে মা-বাবার কাছে। সব সময় মুখে বলিয়াও দিতে হয় না, দেখিয়াই শিখে। ভদ্র পরিবারের শিশুরা দেখিয়াই ভদ্রতা শিখে। তবু, মা তাহাদের কিছুটা শিখাইতে পারেন। শিখাইবার প্রধান উপায়, নিজের দৃষ্টান্ত। একান্তই যদি মুখে কিছু বলিতে হয়, আদেশ করিবেন না। একটু খোঁচা দিয়া তাহার শুভ বুদ্ধিকে জাগাইয়া দিবেন। "লোকে কি বলবে?" "লোকে কি ভাবছে?" "কি রকম দেখাচ্ছে দেখ ত?" এই রকমের কথাই যথেষ্ট। খোকা চুরি করিবে না; কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ চুপ করিবে; জামায় হ ছবে না—এই সব অভ্যাসের মূলে রহিয়াছে যে শুভাশুভ, তাহাই শি অন্তরে জাগাইয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে কতখানি সু-অভ্যাস গড়া হইয়েছে সে-সংবাদ মা-ও সব সময়ে রাখেন না। না-ই রাখিলেন। তিনি যে শুধু ছেলের প্রবৃত্তি, সুরুচি ও সংযমের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলেই তাহার সু-অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে।

অভ্যাসের দ্বারা স্বভাবকে যে-কোন দিকে চালানো যায়। সার্কাসে আমরা দেখি, লোকেরা ঘোড়ার পিঠে বা তারের উপর অদ্ভুত সব খেলা দেখাইতেছে; একটা মাত্র পায়ের আঙুলে ভর করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া আছে; দেহটা তাহার যেন রবারের তৈরী, এমনই ভাবে ধপাধপ আছাড় খাইয়া গড়াইতেছে, দেহটাকে বাঁকাইতেছে, ঘুরাইতেছে;—এই সকলই অভ্যাসের ফল।

মানুষের দেহকে দিয়া অভ্যাসের দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়। মন ত অভ্যাসের বশ হয় আরও সহজে; শুধু মানুষের নয়, পশুপক্ষীরও।

বিড়ালকে রোজ খাবার দিয়া দেখুন, খাবার না থাকিলেও সে ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইবে। খাদ্যের গন্ধ পাইয়া সে আসে নাই, আসিয়াছে অভ্যস্ত সময় হইয়াছে বলিয়া। যেখানে রোজ খাবার পাওয়া তার অভ্যাস, বিড়াল যদি সেইখানে অনাহারে মরিয়া থাকে, তবু বাড়ী ছাড়িয়া নূতন জায়গায় যায় না। কুকুরের মধ্যে অভ্যাসের প্রভাব আরও বেশী। চড়াইকে রোজ একসময়ে খাইতে দিলে তাহারা ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হয়। ডারউইন বলিয়াছেন, তাঁহার ধারণা, জীব-জন্তুরা যে পরস্পরকে ভয় করে তাহাও অভ্যাসের ফল। প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপে নাকি তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে মানুষ নাই। ছোট ছোট পাখীরা তাঁহাকে দেখিয়া একটুও ভয় পাইল না; নির্ভয়ে আসিয়া তাঁহার কাঁধেপিঠে বসিল। মানুষকে ভয় করা তাহাদের অভ্যাস নাই।

খারাপ দিকেও অভ্যাস এই রকমই জোরালো হইয়া উঠিতে পারে। মাতালের "অভ্যাস" মদ খাওয়া; যুক্তিতর্ক, বিবেকবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, কিছুতেই তাহার এই "অভ্যাসকে" ঠেকাইতে পারে না। ইহার পরও কি বলা যায়, "অভ্যাস" স্বভাবের চেয়ে শক্তিশালী হইতে পারে না বা হয় না?

এই সকল অবশ্য পুরাণো কথা। এগুলি আমি আগেও জানিতাম। যে-কথাটা আমি হঠাৎ মনের মধ্যে টের পাইয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলাম সেটা শুধু এই নহে। সে-কথাটা হইতেছে, শিশুর মধ্যে সদভ্যাস জন্মাইতে হইবে, এবং সেই অভ্যাস জন্মাইতে পারেন তাহার পিতামাতা। এই উপায়েই অতি অল্প আয়াসে এবং নিশ্চিত ফলের ভরসা লইয়া তাহার স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে। এতদিনে আমি ঠিক পথের সন্ধান পাইলাম।

এবার দেখা যাক্ শিশুর মধ্যে সদভ্যাস পিতামাতা কি উপায়ে জন্মাইতে পারেন।

৫। নূতন অভ্যাস শিখানো

'একবার আরম্ভ কর, তাহা হইলেই পারিবে'—

সকল অভ্যাস সম্বন্ধেই এ-কথাটা বলা যায়। কিন্তু অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবে আমাদের নিজের ইচ্ছামত নয়, অভ্যাসের স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতির বশেই।

শিশুর মনে যে-কোন অভ্যাস, যে-কোন ধারণা একটুখানি ঢুকাইয়া দিলে সেটা আপনার গতিতেই মনের মধ্যে বাড়িয়া বাড়িয়া চলে। লিখিতে বসিবার পর আপনাআপনি কথা যোগাইতেছে, এমন সব বাক্য ও যুক্তি লিখিয়া ফেলিতেছি যাহার কথা আগে ভাবি নাই, যাহার সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি— এ আসিল কোথা হইতে? লেখার অভিজ্ঞতা যাহার আছে, এই আশ্চর্য্য ঘটনার অভিজ্ঞতাও তাহার হয়। দার্শনিক যখন নিজের মনের গতি নিজেই লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তিনিও এইভাবে আশ্চর্য্য হন। অথচ এইটাই মানুষের স্বভাব। চিন্তা বা অভ্যাসের বীজ পড়িলেই তাহা ক্রমে ডালপালা ছড়াইয়া কায়েমি হইয়া বসে।

চিন্তা করা মানুষের স্বভাব। যাহা পাই তাহা লইয়াই আমরা চিন্তা করি, শিশুও করিবে। চিন্তার ধারাটা তাহার প্রকৃতি ও অভ্যাসের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট থাকে। পিতামাতার কাজ শুধু বাছিয়া দেওয়া সে কি লইয়া চিন্তা করিবে। বলিয়াছি, অভ্যস্ত রকমেই শিশু চিন্তা করে। অভ্যাস মনের বাঁধা রেলের রাস্তা। রাস্তা ধরিয়া গেলে বিপদ্ নাই, রাস্তা ছাড়িয়া গেলেই বিপত্তির সম্ভাবনা। তাই রাস্তাটাই যাহাতে ভুলপথের রাস্তা না হয়, সেইজন্য সেটা গড়িবার ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার দায়িত্ব পিতামাতার।

এইখানে একটি কথা আছে। যে কোন কাজ— শরীরের বা মনের কাজ— প্রথমবার করিতে অসুবিধা হয়; দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার করিতে ততটা শক্ত লাগে না; তারপর যতই করি ততই সেটা অনায়াসে করিতে পারি। তারপরও কেবলই করিতে থাকিলে হয়ত সেটা এমনিভাবে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়, তখন আর না করিয়া পারি না। তখনই হয় অভ্যাসের সৃষ্টি। কিন্তু তাই যদি হয়, "অভ্যাস" সৃষ্টির অর্থ কি এই নয় যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত করা হইতেছে, যে বাঁধা কাজই করিয়া চলে?

হয়ত তাই। হয়ত কেন, সত্যই তাই। কিন্তু তাহাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, শিশুর মনে অভ্যাস জন্মানো খারাপ। বরং এই কারণেই বেশী করিয়া তাহার মনে অভ্যাস জন্মাইবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আসল কথা মানুষ অভ্যাসের দাস। দৈনন্দিন জীবনে শতকরা অন্যূন নিরানব্বইটা কাজ আমরা অভ্যাসের বশে করি। "স্বাধীন" ইচ্ছায় একটাও করি কিনা সন্দেহ। নিত্য "নূতন" কাজ, যাহার কোন অংশই "অভ্যস্ত" নয়— খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; এবং পাইলেও তাহা দিয়া ধারাবাহিক জীবন চলে না। অতএব "অভ্যাস" আমাদের থাকিবেই। এবং তাই যদি হয়, সে অভ্যাসগুলি কু-অভ্যাস না হইয়া সদভ্যাস যাহাতে হয় সেইদিকেই ত দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অভ্যাস গড়িব না বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিলে অভ্যাস গড়া বন্ধ হইবে না। যা গড়ার তা গড়িবেই, দেবতা হাত গুটাইলে ভূতে গড়িবে। তার চেয়ে বুদ্ধিবিবেচনা খাটাইয়া সদভ্যাস শিশুর মধ্যে গড়িয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অভ্যাসে যে আমরা কাজ করি, শুধু তা-ই নয়। আকস্মিক কাণ্ডের মধ্যেও যথাসাধ্য "অভ্যস্ত" পথই খুঁজি। এবং অভ্যস্ত পরিচিত পথের প্রতি এই আকর্ষণ অনেক সময়ে আমাদের ভুলভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে।

যে ছেলে বইয়ের মজা জানে, সে অলসের দলে পড়িলেও অলসতা শেখে না; অভ্যাসবশেই বই লইয়া বসিয়া নিজেরও অজ্ঞাতে সে জ্ঞানচর্চ্চা করে। যে মেয়ে কখনও মিথ্যাকথা বলে না, বিপদের মুখেও তাহার মুখে সত্য কথাই যোগায়; মনে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়া এড়াইবার ইচ্ছা জাগিলেও সেই মিথ্যা কথা তাহার মুখে বাধিয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হয়, অভ্যাস ইচ্ছার চেয়েও বলবান্। এবং তাই যদি হয়, তবে জীবনের চলার পথে সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধির চেয়েও বেশী কাজে আসে সদভ্যাস। সেই অভ্যাস শিশুর মধ্যে গড়িয়া না দিলে তাহাকে চির-দুর্ব্বলই করিয়া রাখা হইবে।

৬। অভ্যাসের দেহতত্ত্ব

কাজ করিতে করিতে কি করিয়া সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায় তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ডাঃ কার্পেণ্টার তাহার Mental Physiology পুস্তকে। এই বইখানা পড়িয়াই আমি ঠিক নিয়ের ইঙ্গিতটি পাইয়াছিলাম।

ডাঃ কার্পেণ্টার বলেন :— প্রত্যেকটি কাজে দেহের খানিকটা ক্ষয় হয়, খানিকটা পেশী-তন্তুর ক্ষয় হয়। আবার নূতন তন্তু গড়িয়া তাহার জায়গা পূরণ করে। প্রত্যেক কাজে পেশীর উপরে একরকমের জোর পড়ে না, এক রকমের ক্ষয় হয় না। যে কাজে যেই ধরণে ক্ষয় হয়, সেই ধরণে নূতন তন্তুর সৃষ্টি হয়। কাজেই এক কাজ বারবার করার ফলে, এবং সেইহেতু নূতন নূতন তন্তু গড়ার ফলে, ক্রমে পেশীগুলাই সেই কাজ করার উপযোগী রূপে গঠিত হইয়া যায়। তখন আর সেই কাজটা করার

জন্ত মনের চেষ্টা বা মস্তিষ্কের সচেতন তাড়ার দরকার হয় না ; পেশী প্রায় স্বয়ংক্রিয় হইয়াই সেটা করিয়া ফেলিতে পারে, করিয়া ফেলিতে চায়। এইজন্যই প্রথম অ, আ, ক, খ, লেখা শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এবং অভ্যাস হইয়া গেলে লেখার মধ্যে যে একটা জটিল শ্রম আছে সেকথা মনেই হয় না। এইজন্যই অভ্যস্ত হাতে পিয়ানো অনায়াসে বাজে, অনভ্যস্ত হাত চলিতেই চায় না। কারণ অনভ্যস্ত হাতের পেশী প্রয়োজনের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। এটা নিছক পেশীর গঠনের ব্যাপার, বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপার নয়।

এইজন্যই শিশুকে দৌড়, ঝাঁপ, সাঁতার, নৃত্য, শিখাইতে হয়, যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি মোটামুটি অনেক রকম কাজের উপযোগী হইতে পারে।

শৈশবে অভ্যাস করা সহজ, তখন পেশী নরম থাকে। একবার একটা ধাঁচে গড়িয়া গেলে তখন আর তাহাকে নূতন করিয়া গড়া শক্ত। শিশু তোৎলা ; অনেকে বলেন বড় হইলে সারিয়া যাইবে। বড় হইলে সারিয়া যায় না, বড় হইলে বরং অভ্যাসটাই গড়িয়া যায়। প্রথম দিকে যেটা ছিল সামান্য প্রবৃত্তি, অভ্যাসের ফলে পেশীর গঠন বদলাইয়া সেইটাই প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়।

এইভাবে শরীরের তন্তুগুলা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। শিশুকাল হইতে যদি সর্ব্বদা এক পায়ে দাঁড়াইবার অভ্যাস করা হয়, ক্রমে মেরুদণ্ডটাই বাঁকিয়া দেহটা এক পায়ে দাঁড়াইবার উপযোগী হইয়া যায়। তখন দুই পায়ে দাঁড়ানোই শক্ত হইয়া উঠে।

মনের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, এগুলির স্থান মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কও একটি অঙ্গ মাত্র, ইহারও তন্তু ক্ষয় হয়, পুনরায় গঠিত হয়। অতএব যে কোন প্রকার চিন্তা, কল্পনা বা প্রবৃত্তি, চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের গঠনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। পুরাতন অভ্যস্ত ধরণের চিন্তা আমরা

সহজে ও তাড়াতাড়ি করিতে পারি। সে তাহার পরিচিত খাতে বহিয়া চলে। নূতন ধরণের চিন্তায় শ্রম বেশী লাগে, তাহাকে টক্কর খাইতে খাইতে চলিতে হয়। এইজন্যই মার মনে শিশুর কথা স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে, এইজন্যই চিত্রশিল্পীর মনে ছবি ও কবির মনে কবিতা সহজে ধরা দেয়; একই দৃশ্য দেখিয়া একজন ভাবে ছবি কেমন হইবে, একজন ভাবে কবিতা কেমন হইবে। একই ঘটনা দেখিয়া করুণ-রস লেখকের মনে ট্রাজেডির 'প্লট' গজায়, হাস্য-রসিকের মনে ঠাট্টা ব্যঙ্গের সম্ভাবনা ধরা দেয়।

ভালবাসা, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, ভয়, সকলই অভ্যাসের ব্যাপার। ডাঃ কার্পেণ্টার বলেন, "যে মানসিক ব্যাপারটা আমরা অনেকবার করিয়াছি সেটা ক্রমে মনে স্থায়ী হইয়া যায়। কোন অবস্থায় যে রকম অনুভূতি, চিন্তা বা সিদ্ধান্ত আমাদের মনে অনেকবার জাগিয়াছে, সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইবা মাত্র ঠিক সেই অনুভূতি, চিন্তা, সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। ইহার জন্য চেষ্টা ত করিতেই হয় না, অনেক সময় টেরও পাই না যে সেই চিন্তা মনের মধ্য দিয়া খেলিয়া গেল এবং হাত-পা-ও তাহার নির্দ্দেশে কোন একটা কাজ করিয়া বসিল"।

একটা প্রচলিত গল্প আছে, এক প্রাচীন সৈনিক পথ দিয়া খাবার লইয়া যাইতেছে। একজনের মনে একটু পরিহাসের ইচ্ছা হইল। পিছনে গিয়া হঠাৎ হাঁকিল, Attention! সৈনিক কিছু বুঝিবার আগেই তাড়াতাড়ি "অ্যাটেন্‌শন্" হইয়া দাঁড়াইল, হাতের খাবার মাটিতে পড়িয়া গেল। গল্পটা মজার, কিন্তু ইহার মধ্যে চমৎকার একটি সত্য আছে—অভ্যাসে কতদূর কি হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ড্রিল শেখা শক্ত ব্যাপার; "অ্যাটেন্‌শন্" হইয়া দাঁড়াইতে প্রথম প্রথম দারুণ অস্বস্তি লাগে। কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে? সমস্ত

স্নায়ু-শিরা পর্য্যন্ত ড্রিলের হুকুমে বাঁধা পড়ে। ইহাকেই বলে অভ্যাস। এবং অভ্যাসের এই শক্তি আছে বলিয়াই অভ্যাসের দ্বারা স্বভাবকেও জয় করা যায়। সমস্ত প্রকৃতিকেই বদলাইয়া শিশুকে মানুষ করিয়া তোলা যায়।

এইজন্যই শিশুর মধ্যে অভ্যাস জন্মাইবার প্রয়োজন। পিতামাতা তাহার মধ্যে যে অভ্যাস বাড়িতে দিবেন বা জন্মাইয়া দিবেন সেই ধরণে তাহার সমস্ত দেহ ও মস্তিষ্ক জন্মের মত গড়া হইয়া যাইবে। বিপরীত সদভ্যাস দ্বারা কুঅভ্যাসকে দূর করিতে হইবে। না হইলে সেইগুলাই স্থায়ী হইয়া যাইবে। "ওতে কিছু হবে না", "আপনিই সেরে যাবে", "বড় হয়ে বুঝবে", "ছেলেমানুষ তো" !—ইত্যাদি বলিয়া তাহার কুঅভ্যাসকে প্রশ্রয় দেওয়া শুধু বোকামি নয়, পাপ। ইহাতে পিতামাতা নিজের কর্ত্তব্যকেও ফাঁকি দেন, তাহারও ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নষ্ট করেন।

এবং এই জন্যই পিতামাতার সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া নজর রাখিতে হয় শিশু কি করিতেছে, না করিতেছে। বেশীর ভাগ কাজই শিশু শেখে অপরের কাজ দেখিয়া। প্রথমবার করার পরই যদি প্রয়োজন মত উৎসাহ পায় বা ধমক খায়, তবেই তাহার অভ্যাসগুলা ঠিক পথে চলিবে। উৎসাহের অভাবে সদভ্যাস না গড়া দুঃখের কথা। সতর্কতার অভাবে কদভ্যাস গড়া ও পরে আবার তাহা বর্জন করা, উভয়ই শ্রম ও শক্তির অপব্যয়; এবং শেষে অনেক সময়ে শক্তি ব্যয় করিয়াও ফল হয় না, কদভ্যাসকে উৎখাত করাই যায় না।

৭। অভ্যাস তৈরী করার উপায়

শিশুদের বড় দুর্ব্বলতা দীর্ঘসূত্র ও পরনির্ভর হওয়া। মা যেটা করিয়া দিলেন, সেটা নিজে করার তাহার উৎসাহ হয় না, এবং করার অভ্যাসই সে করিতে চায় না।

এই বদভ্যাস সারানো দরকার। সারিবে কি ভাবে? বড় হইয়া? বাজে কথা। বড় হইয়া তাহার এই দোষই আরও পাকা হইয়া যাইবে। শাস্তি? না। শাস্তির ভয় অলস শিশু করে না। পুরস্কারের লোভ? তাহাতেও কাজ হইবে না। আসলে পুরস্কারের লোভ শাস্তির ভয়েরই অন্য রূপ মাত্র। পুরস্কারটা না পাইলে মন খারাপ হইবে, শাস্তিটা এই। তাহাতে তাহার চৈতন্য হইবে না।

তবে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে কি ভাবে? উল্টা সদভ্যাস তাহার মনের মধ্যে জন্মাইয়া।

মা খুব অল্প কথায় তাহাকে কাজটি না পারার দোষ বুঝাইয়া দিবেন। তারপর তাহাকে দিয়া কাজটি করাইবেন।

ধরুন পোষাক পরা। বেড়াইতে যাইতে হইবে; মা—বলিলেন, "জুতার ফিতা নিজে বাঁধ, আমি বাঁধিয়া দিব না"। খোকা ফিতা বাঁধিতে বসিল। ফিতাটা টানিয়া, একটা ফাঁস দিয়া, সে থামে, মার দিকে চায়। তাহার আর ইচ্ছা করিতেছে না। মা তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষে ভৎর্সনা নাই, আছে আগ্রহ—বাঃ, দেখি কেমন পার। শিশু মাথা নীচু করিয়া সে ফিতাটা বাঁধা সারা করে। তারপর অন্য পা'টা। আবার সে একটু থামে, কিন্তু এবার অল্পক্ষণ, আবার মার দিকে তাকায়। তারপর আবার এটাও সারা করে। মা বলেন, বাঃ, চমৎকার।

পরদিন তাহার কষ্ট একটু কম হয়। তারপর দিন আরও কম।

ক'দিন পরে মা বলিলেন, "আজ তোমাকে একা একা জুতো পরতে হবে। আমি কাছে থাক্‌ব না।"

—আচ্ছা।

—পাঁচ মিনিট সময় মোটে।

—আচ্ছা।

—আগেই যে আচ্ছা বলচো, যদি না পার?

—চেষ্টা করব।

খোকা আজ জুতা ঠিক পরিতে পারিয়াছে, নিজে নিজে। তাহার শেখা হইয়া গিয়াছে।

অনেক সময় মা একটা কাণ্ড করেন। ক'দিন কাজ করাইবার পরে তাহার মনে হয়, আহা, ওর কষ্ট হইতেছে। প্রথম দিন যতটা কষ্ট হইয়াছিল পরের দিনগুলিতে তত কষ্ট হয় না, এ কথাটা তাহার খেয়াল হয় না। কদিন পরে একদিন বলেন, আহা, আজ থাকুক্, আজ আর না-ই কর্‌ল। কদিন ছুটি দিয়া আবার করান। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। অভ্যাস নিত্যকার ব্যাপার। কদিন ছুটি দিলে পরে সেটা আবার করানো হয় না, আবার আরম্ভ করানো হয়; কারণ কদিনের অভ্যাসে স্নায়ু ও পেশীর কাজ যেটুকু আয়ত্ত হইয়াছিল, কদিনের ছুটিতে আবার সেটুকু উঠিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ কদিন কাজ করার পর আর শিশুর ছুটি দরকার হয় না; তখন সে কাজে তাহার কষ্ট ত নাইই, বরং আনন্দ আছে। অনেক সময় দেখা যায় শিশু নিজেই সেটা করিতে আগ্রহ করিতেছে। মা করিয়া দিবেন, ইহাতে তাহার আপত্তি। নিজে কাজ করার মধ্যে যে গর্ব্ব ও আনন্দ আছে সেইটুকু সে পাইতে চায়। এক্ষেত্রে মা যদি 'আহা'

বলিয়া তাহার সেই নূতন-শেখা অভ্যাস নষ্ট করেন, তবে সেটা তাহারই অপরাধ।

শিশুকে অভ্যাস করাইবার জন্ত মাকে ধৈর্য্য ধরিতে হইবে; নজর রাখিতে হইবে; ঠিক সময়টি বুঝিয়া তাহার মনে ঘা দিতে হইবে।

একটা সাধারণ অভ্যাসের কথা ধরা যাক। বিলাতে ঘরে যাইতে বা ঘরের বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিতে হয়। এটা খোকাকে শিখাইতে হইবে। মা বলিলেন, "খোকা, একটা কথা তোমাকে মনে রাখিতে হবে। ঘরে যদি কেউ থাকে, ঘরে ঢুকবার সময় বা বেরোবার সময় দোর বন্ধ না করে যাবে না।"

খোকা তৎক্ষণাৎ বলিল, "কিন্তু মা, যদি ভুলে যাই।"

—আমি মনে করিয়ে দেব।

—কিন্তু যদি আমার খুব তাড়াতাড়ি থাকে।

—তবু করতে হবে।

—কেন?

—না হলে ঘরের লোকদের অসুবিধে করা হয়। সেটা অভদ্রতা।

—কিন্তু যদি ঢুকে তক্ষুণি আবার বেরিয়ে যাই?

—তবু ঢুকে দোর বন্ধ করবে। বেরোবার সময় আবার খুলে নেবে। মনে থাক্‌বে ত?

—থাক্‌বে।

—আচ্ছা দেখব কটা ভুল হয়।

দুইবার তিনবার খোকার ঠিক মনে থাকে। তারপরের বার সে সাঁ করিয়া ছুট দিয়াছে—মা তাহাকে পিছন্ পিছন্ ডাকিতে ডাকিতে সে মাঝ সিঁড়িতে।

মা 'খোকা, ফিরে এস, দোর বন্ধ করে যাও' বলিয়া গর্জন

ছাড়িলেন না। উঠিয়া গিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইলেন। বেশ মিষ্টি করিয়া ডাকিলেন, খোকা! খোকা দরজার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে। মা কেন ডাকিলেন ভাবিতে ভাবিতে সে ফিরিয়া আসিল। মা চোখ তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়া দরজার দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "আমার মনে করিয়ে দেবার কথা ছিল।"

—হ্যাঁ, একেবারে ভুলে গেছি।

খোকার আত্মসম্মানে লাগিয়াছে। এবার সে সযত্নে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। ইহার পর আর তাহার ভুল হয় না।

ভুল অনেকই হইবে। মা শুধু লক্ষ্য রাখিবেন যেন খোকার সে ভুল তাহার চক্ষু না এড়ায়। তৎক্ষণাৎ ভুলের সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া দিতে তিনি যেন ভুল না করেন। আর লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাকে মনে করাইয়া দিবেন, বেশ সহজ মিষ্ট কথায় ও ইঙ্গিতে। গর্জন বা গালাগালি করিলে খোকা সেটাকে অত্যাচার বলিয়া মনে করিবে; এবং দায়ে পড়িয়া যদি বা কাজটা করে, সেটাকে আরও করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইবে না। সেটা তাহার কাছে স্নেহময়ী মায়ের অনুরোধ নয়, বদমেজাজী মনিবের হুকুম। তাহা সে পালিতে চায় না—ধীরে সুস্থে চলিলে নিজের মনের উৎসাহেই সে আরও করিবে।

এখানেও "আহা" বলিয়া অভ্যাসটি নষ্ট করা মার পক্ষে শক্ত নয়।

কদিন খোকা নিয়মিত ভাবে দরজা বন্ধ করিয়াছে। একদিন হঠাৎ অন্য কোন মজার টানে সে দরজা খোলা ফেলিয়াই ছুট্ দিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি যাইয়া মনে পড়িল, সে থামিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা বন্ধ না করিয়াও যাইতে পারিতেছে না, আবার ফিরিতেও ইচ্ছা করিতেছে না, নীচের মজাটা এতক্ষণে শেষই হইয়া গেল বুঝি! মা ভাবিলেন, আহা, রোজই তো বন্ধ করে, আজ থাক্ না। খোকা সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া খানিক

মাথা চুলকাইল, তারপর মনে ভাবিল, 'থাক গে।' ভাবিয়া ধীরে ধীরে চম্পট দিল। মা ডাকিয়া ফিরাইলেন না। পরদিন খোকা দরজা খোলা রাখিয়াই চলিয়া গেল। ভুলে নয়, ইচ্ছা করিয়াই। সে দেখিয়াছে, সব সময় বন্ধ না করিলেও চলে। মা হয়ত ডাকিলেন, সে ফিরিল না; চেঁচাইয়া বলিয়া গেল, উঃ, এখন ভীষণ কাজ মা।

মা কিছু বলিলেন না।

খোকা হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। দরজা খোলা ফেলিয়াই ঘরময় চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। মা কঠিনস্বরে ডাকিলেন, খোকা!

খোকা বলিল, আঃ, এক্ষুণি তো আবার বেরিয়ে যাচ্চি। এক্ষুণি সে যায় না, যায় দশমিনিট পরে, এবং দরজা খোলা রাখিয়াই যায়।

মা তাহাকে "ছুটি" দিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যে আলস্য। সেই আলস্যে খোকার নবলব্ধ অভ্যাসটিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৮। ছোট শিশুর "অভ্যাস"

কাজ ও অভ্যাসের বুদ্ধি মানুষ প্রায়ই মাথা খেলাইয়া বাহির করে না, দেখিয়া শেখে। যে কাজ সে অন্যকে করিতে দেখে তাহার ছায়া তাহার মনে ও মস্তিষ্কে পড়ে, এবং তাহারই সে অনুকরণ করে। এই ছায়া পড়া আরম্ভ হয় অতি শৈশবকাল হইতেই, শিশুর হাঁটিতে এবং কথা বলিতে শিখিবারও আগে। তাই অতি শৈশব হইতেই শিশুর মধ্যে সদভ্যাসের গোড়া পত্তন করিতে হইবে।

তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত সময়ে খাওয়ানো, ঘুম-পাড়ানো, বেড়াইতে নেওয়া, এই সবগুলিই শিশুর শিক্ষার অঙ্গ। ইহার ফলে তাহার দৈহিক অভ্যাসগুলি নিয়মিত হয়।

মা এগুলি যত যত্নে করিবেন নার্স তাহা করে না। তাহার কাছে খাওয়ানো শুধুই খাওয়ানো। তাহার মধ্যে যে আবার সময়-জ্ঞানের পড়াও আছে এটা তাহার ধারণার বাহিরে। অনেক নার্সের ধারণা থাকে, জানালা খোলা রাখাই শিশুর পক্ষে খারাপ। অনেকে ঘরে বা শিশুর গায়ে দুর্গন্ধ থাকিলে সেটা টেরই পায় না। এবং দুর্গন্ধটা যে আসলে ময়লা জিনিষের সূক্ষ্ম অদৃশ্য কুচি, এবং সেইগুলি নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের মধ্যে ঢুকিতেছে, এ-কথাটা ইহাদের কিছুতেই বুঝানো যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। গন্ধের জ্ঞানটা শুধু ফুল শুঁকিবার জন্য নয়; বাতাসে ময়লা আছে কিনা টের পাইবারও ইহা উপায়, আত্মরক্ষারও উপায়। অথচ বহু লোক আছে যাহারা কোনদিন দুর্গন্ধ টেরই পায় না, সময়ে সাবধানও হইতে পারে না। শিশুর ঘ্রাণশক্তিটাকে অভ্যাস দ্বারা বাড়াইয়া তোলা দরকার। তাহা হইলে ঘরের বাতাস ভাল কি নোংরা, সে সহজেই টের পাইবে, সাবধানও হইতে পারিবে।

শিশু যাহা দেখে তাহাই শেখে, যদি 'নার্সের' এই চৈতন্যটা থাকে, তবেই খুব ভাল। ইহা না থাকিলে সে নিজেরও অজ্ঞাতে শিশুকে সব নোংরা অভ্যাস শিখাইবে।

অনেক সময় ফিট্‌ফাট্ কাজ করিতেছি এই অছিলায় নার্স কতগুলা কাণ্ড করে। তাহার মধ্যে বড় একটা ব্যাপার—সকালবেলায় শিশুর বিছানা পাট করিয়া রাখা; আর একটা, রাত্রে সে যখন শুইতে যায় তখন তাহার ছাড়া জামাটা পাট করিয়া রাখা, কাল আবার সকালে সে ওটা পরিবে।

এই পাট করার ফল হয় বিপরীত, বিছানায় ও জামায় যে ঘাম আছে, সেটা শুকাইতে পার না। বরং ছেলেদের ঘরে একটা দড়ি টাঙাইয়া দিন, যেন এই জামা সেই দড়িতে ঝুলাইয়া হাওয়ায় শুকানো যায়। বিছানা করার আগে বিছানাটা খানিকক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া জুড়াইয়া লওয়া দরকার। নার্স যদি ফিট্‌ফাট্ কাজ করিতে সত্যই চায় এই ভাবেই করুক; ময়লা না জমিতে দিয়া সেটা দূর করিয়াই শিশুকে ফিট্‌ফাট্ রাখুক। হাতে কাদা বা কালি লাগিলে শিশু অস্থির হইয়া উঠে, মার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দেয়— "ধুয়ে দাও"। পরিষ্কার থাকিবার এই প্রবৃত্তি শিশুর স্বভাবগত। সে স্বভাবটা যেন অভ্যাসের দোষে, মা ও দাইয়ের অভ্যাসের দোষে, নষ্ট না হয়। শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিখাইতে হইবে। ধুলামাটি লইয়া খেলিতে যদি সে চায় খেলুক, কিন্তু খেলার শেষে আর ধুলামাটি তাহার গায়ে যেন না থাকে, সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিতে হইবে। নোংরা থালা-বাসনে তাহাকে খাইতে দিবেন না। ইহাতে তাহার নোংরামি সহিয়া যায়। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। ভব্য স্বভাবের দিক দিয়াও খারাপ। নোংরামি সহিয়া গেলে শেষে বড় হইয়াও নোংরা থাকিবে। তখন আপনিই লজ্জা পাইবেন। কিন্তু দোষ তাহার নয়, দোষ আপনার।

স্নানের মধ্যে মজা আছে, সেই মজাটার সন্ধান শিশুকে দিবেন। তাহা হইলে সে নিজের গরজেই রোজ স্নান করিবে। রোজ রোজ সাবান আর তোয়ালে লইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না। যুদ্ধ করিলেই তাহার রাগ হয়, তাহার চোখে সাবান যায়, স্নানের ব্যাপার-টাকেই সে ভয় করিতে শেখে। না হইলে এমনিতে শিশু কখনও নোংরা থাকিতে চায় না, সাফ্ থাকিতে, সাফ জামা পরিতে পাইলে সে

সর্ব্বদাই খুসি। সেই সাফ-থাকার প্রবৃত্তিটাকে বাড়াইয়া তুলুন। দেহের পরিচ্ছন্নতার যদি কোন মূল্য থাকে, মনের ও আচরণের পরিচ্ছন্নতার মূল্য তাহার চেয়েও অনেক বেশী। শিশুর মন ও কথাবার্ত্তা যাহাতে নোংরা না হয়, সে দিকে মা দৃষ্টি দিবেন। অনেক দৈহিক ব্যাপার আছে, দেহের অনেক অঙ্গ আছে, যাহা লইয়া কথাবার্ত্তা ও আলোচনা সমাজে চলিত নয়। এইগুলির সম্বন্ধে মা শিশুকে সতর্ক করিবেন, যেন তাহার আচরণে, কথাবার্ত্তায়, লজ্জাহীনতা প্রকাশ না পায়, অশিষ্টতা প্রকাশ না পায়।

মনের পরিচ্ছন্নতার বড় লক্ষণ কথা মানিয়া চলা এবং আত্মসম্মান-বোধ। ঈশ্বর চাহেন আমরা সকলে ভদ্র হই, উন্নত হই। আমাদের মনটাকে পবিত্র ও উন্নত রাখিতে হইবে, এই ভার ও দায়িত্ব তিনিই আমাদের দিয়াছেন— এই ধারণা শিশুর মনে থাকিলে সে সগর্ব্বে মনের উৎকর্ষ সাধন করিবে, নিজের মনকে হীন হইতে দিবে না।

চালচলনেও তাহাদের সুশৃঙ্খল হইতে শিখাইতে হইবে। তাহার ঘরের জিনিষপত্র যেন অগোছাল না হয়, শিশুর ঘর যেন রাজ্যের যত কানাভাঙ্গা গেলাস, কড়াভাঙ্গা পেয়ালা, আর ঠ্যাংভাঙ্গা চেয়ার-টেবিলের হাসপাতাল না হইয়া উঠে। শিশুকে শিখাইবেন, জিনিষ ভাঙ্গিলে, নোংরা করিলে, সেটা নষ্ট হইয়া যায়, আর কাজে লাগে না। তাহা হইলেই সে সাবধান হইবে। শিশু জিনিষ নোংরা করে সেটা তাহার অবধানের অভাব, জিনিষ নষ্ট করিয়া লোকসান ঘটাইতে শিশু ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করে না।

জিনিষপত্র ফেলিয়া ছড়াইয়া রাখিলে তাহার চলিবে না। অনেক সময় এ অভ্যাসটা বড়রাই তাহাদের শিখান। হয়ত বলেন, পারি না আর, দিনে পঞ্চাশ বার করিয়া পুতুল হাঁড়িকুড়ি ছত্রাকার করিবে, কত গুছাইব? থাক্ পড়িয়া। তাহারা মনে রাখেন না, তাহাতে শুধু পুতুলটাই

পড়িয়া রহিল না, শিশুর মনটাও পড়িয়া রহিল; অযত্নে সুশিক্ষা পাইল না, মার্জ্জিত হইতে জানিল না। অনেক সময় বড়রা বলেন, পুতুল দুটা চারটা মাটিতে না গড়াইলে শিশুর অস্তিত্বটাই বোঝা যায় না। অগোছাল ঘর অবিন্যস্ত থাকাই তাহার উপস্থিতির প্রমাণ, ঘর ঐ রকমই থাক্। থাকেও। ইহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পারে, শিশুর অনিষ্টই হয়।

দু'বছর বয়সেই শিশুকে শিখাইবেন, তাহার নিজের পুতুল, নিজের খেলার জিনিষ, তাহাকে নিজেই গুছাইয়া রাখিতে হইবে। এটা শক্ত কাজ নয়, তাহার কাছে এটাও একটা খেলা। তাহাকে শিখান, পুতুলের বাক্স খুলিয়া যেখানকার যেটা বাহির করিয়া আবার ঠিক ঠিক গুছাইয়া রাখুক। ক'দিনের মধ্যে সে চমৎকার গুছাইতে শিখিবে এবং তারপর অন্য কেহ তাহার বাক্স গুছাইতে গিয়া এক জায়গার পুতুল অন্য জায়গায় রাখিলে সে অস্থির হইয়া যাইবে। নিয়ম বস্তুটা শিশুরা বড়দের চেয়ে বেশী বোঝে। শিশুকে এই নিয়ম শিখাইতে বেগ পাইতে হয় না। শিশুর মন ঘড়ির মত, নিজের উৎসাহেই চলিতে থাকে, শুধু মধ্যে মধ্যে একবার দম দিলেই হইল।

শিশুকে "ফিটফাট্" থাকিতে শিখাইবেন। "ফিটফাট" থাকার অর্থ খালি যেখানকার জিনিষ সেইখানে রাখাই নয়, প্রতিটি জিনিষ তাহার যোগ্য স্থানে রাখা। এইখানে "পছন্দের" কথা আছে, শিশুর মনে সেই পছন্দের জ্ঞান জাগাইতে হইবে। সুন্দর জিনিষ দেখিলেই সে সৌন্দর্য্যের অর্থ বুঝিবে। খুকীকে শিখাইবেন, ফুল খালি জল দিয়া রাখিলেই হয় না, সাজাইয়াও রাখিতে হয়। সাজানোর মধ্যেই পছন্দের খেলা। শিশুকে ঠাণ্ডা জলে বা নোংরা মগে ফুল রাখিতে দিবেন না; সস্তা হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু সুন্দর ফুলদানী তাহার চাই। বই, ছবি, যা কিছু তাহার থাকে, কোথাও যেন কুৎসিত, কদর্য্য বা বাজে জিনিষ সে না পায়।

অতি বিশ্রী কিম্ভূত-কিমাকার ছবি দেখিয়া, অতি অপাঠ্য বই পড়িয়া যে-শিশুর প্রথম হাতে খড়ি হইল, সে কি আর কখনও ভাল ছবি, ভাল রচনার মর্ম্ম বুঝিবে? সুন্দর জিনিষ তাহাকে দিন, তবেই না সে সৌন্দর্য্যের খোঁজ পাইবে, অনুসরণ করিবে।

ছন্দহীন, অশুদ্ধ বানানে খারাপ ভাষায় লেখা বই পড়িতে দেওয়ার মত অন্যায় আর নাই। ইহাতে চেষ্টা করিয়া তাহার জ্ঞানকে বিকৃত করা হয়। অল্প দিন, তবু ভালজিনিষ দিবেন। এক ঝুড়ি মুড়ির চেয়ে মিছরির টুকরাও ঢের ভাল। নিয়মিত সময়ে শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন। শিশু হয়ত শুইতে চাহিবে না, কাঁদিবে। কাঁদুক, একটু কাঁদিলে শিশু ফুরাইয়া যায় না; দু'দিন পরে সে ঠিক ঘুমাইতে শিখিবে। শিশুর কান্না সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট কথা শোনা যায়। কাঁদিলেই অনেকে তাহার অর্থ করেন, সে মার জন্য কাঁদিতেছে, দাইএর জন্য কাঁদিতেছে, খাইবার জন্য কাঁদিতেছে।

অনেক সময়ে এগুলা একেবারেই বাজে কথা। আর যদিই তাই কাঁদে, সে কান্নাটায় কান না দিলে সে নিজেই চুপ করিবে। আর কাঁদিবামাত্র তাহার প্রার্থিত বস্তু দিলে সে বুঝিয়া নিবে, কাঁদিলেই পাওয়া যায়। কাজেই ইহার পরে সে ইচ্ছা করিয়া কাঁদিবে। দুষ্টবুদ্ধি গজাইতে সময় লাগে না, সময় লাগে উচ্ছেদ করিতে। এই দুষ্টবুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে ছেলে বড় হইয়াও এই পথেই চলিবে; ক্রমে উচ্ছন্নে যাইবে। তখন আর সামলাইবার সময় থাকিবে না।

আসল কথা, ঠিক সময়ে বিছানায় শোয়াইলে শিশু কাঁদে অন্য কারণে। এতদিন যে দিন যখন খুসি ঘুমানো তাহার অভ্যাস ছিল; এখন নিয়মিত সময়ে শুইবার জবরদস্তিটা তাহার ভাল লাগিতেছে না। তাই বলিয়া তাহার কান্নাতে গলিয়া গেলে নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস তাহার

হইবেই না ; না গলিলে, দুদিন কাঁদিলেও পরে এইটাই তাহার অভ্যাস হইয়া যাইবে। এবং তখন অত্যন্ত আনন্দ-ভরেই রোজ একসময়ে ঘুমাইতে চাহিবে। তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে এই নিয়ম হিতকর, মনের পক্ষেও। আর নিয়ম যদি শিখিতেই হয়, যত অল্প বয়সে শেখে ততই ভাল ; ততই শেখা সহজ হয়।

৯। শারীরিক ব্যায়াম

দেহের ও ইন্দ্রিয়ের ব্যায়াম লইয়া প্রথমভাগে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে :— ব্যায়ামটা যেন প্রাত্যহিক অভ্যাস হয়।

শরীরের যেমন ব্যায়াম দরকার, আদব-কায়দারও তেমনি অভ্যাস দরকার। খেলার ছলে আদব-কায়দা শেখা একটা সুন্দর উপায়। শিশুরা অভিনয় করিতে ভালবাসে। সেই ঝোঁকটাকেই এখানে কাজে লাগানো যায়।

"মশাই, বাজারের রাস্তাটা কোন্ দিকে বল্‌তে পারেন ?"

"আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এই ধরণের অভিনয় শিশুরা মহাউৎসাহে করিবে, এবং ইহার মধ্য দিয়াই ভদ্র ব্যবহার ও ভব্য কথাবার্ত্তা তাহাদের শেখানো যায়।

কান ও গলার ব্যায়াম হওয়া দরকার। কথার উচ্চারণ যেন তাহারা ঠিক ধরিতে ও ঠিক করিতে পারে। তাহাদের সঙ্গে বিকৃত ঢঙের উচ্চারণ করা অন্যায়। তাহারা যাহাতে ঠিক উচ্চারণটাই শোনে এবং

বলিতে শেখে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বিকৃত উচ্চারণ একবার অভ্যাস হইলে পরে শোধরানো শক্ত। মাষ্টারের কাছে যদি তাহারা পড়িতে শেখে, মাষ্টার নিজে কি রকম উচ্চারণ করেন সেটা আগে দেখিয়া নিতে হইবে।

কানের খুব ভাল ব্যায়াম হয় গান শিখায়—সুর ও তাল ধরার চেষ্টায়। এই ভাবে অতি সহজে কানের তীক্ষ্ণতা বাড়ে। ভাল সুর-জ্ঞান যাহার আছে, ধ্বনির অতি সূক্ষ্ম বিশেষত্বও তাহার কান এড়ায় না।

অনেকে বলেন, সুর-জ্ঞানটা পুরাপুরিই বংশানুক্রমিক, জন্মের সহিত না পাইলে ঘষিয়া মাজিয়া ও-বস্তু পাওয়া যায় না। অনেকে আবার বলেন, মোটেই না, সুরের কান নিছক চর্চ্চার ফলেই আসে, শিক্ষার দ্বারা যে কোন লোককে গান শেখানো যায়।

জন্মগত ক্ষমতা থাকিতে পারে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সে ক্ষমতা থাকিলে ত ভালই। না থাকিলেও চর্চ্চায় কিছুটা কাজ না হইয়াই পারে না। আসলে অনেক ক্ষেত্রেই চর্চ্চাটা ঠিকমত হয় না, তারপর দোষ পড়ে বংশানুক্রমিক ক্ষমতার।

শেষকালে একটা কথা আর একবার বলা আবশ্যক। মা শিশুকে গড়িয়া তুলিবেন; কিন্তু সে গড়ার অর্থ হাতে করিয়া মূর্ত্তি দেওয়া নয়। তাহাকে কি করিতে হইবে না-হইবে সেইটুকু শুধু বুঝাইয়া দিয়া—তারপর তাহাকে নিজের গতিতেই বাড়িতে তিনি দিবেন। শুধু একবার "কর" এবং "করিও না" তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে শিশুর মন বাড়ে না; কাজের ও কর্ত্তব্যের বোঝা সে যতটা অনুভব করে, তাহার আনন্দ সে ততটা পায় না। তাই মা তাহাকে নিজের আনন্দেই কাজ করিয়া যাইতে, বাড়িতে দিবেন। নিজে শুধু লক্ষ্য রাখিবেন সে বিপথে না যায়, বাড়াটা ঠিক রকম হয়। "শিশুকে ছাড়িয়া দাও"—কথার ইহাই অর্থ।

শিশুর জীবন গাছের মত। মালী গাছ লাগায়। তাহার গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, জল দেয়, সার দেয়, বেড়া দেয়, তারপর চুপচাপ বসিয়া দেখে গাছ নিজের স্বাভাবিক গতিতে বাড়িতেছে। তখন বিশ্বের প্রেরণায়ই গাছে পাতা হয়। ডাল মেলে, ফুল ধরে, ফল ধরে; মালীর মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। গাছের মধ্যে বাড়িবার শক্তি না থাকিলে মালীর বিদ্যা বৃথা হইত। গাছের বাড়কে আটকাইয়া রাখিয়া গাছের গোড়ায় সার ও জল যতই সে ঢালুক তাহাতে ভাল গাছের সৃষ্টি হইত না। আবার গাছও মালীর কাজকে অস্বীকার করিতে পারে না। মালী গোড়া না খুঁড়িয়া দিলে, জল না দিলে, গাছ শুকাইয়া মরিবে। মালী তাহার গোড়া পরিষ্কার না রাখিলে সে বুনো লতায় জড়াইয়া মরিবে।

শিশু হইল গাছ, আর মা তাহার মালী। তিনি দেখিবেন, সে বাড়িতেছে কি না; তিনি দেখিবেন, সে আবর্জ্জনায় জড়াইয়া পড়িতেছে কি না। তাহার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতেই তাঁহার আনন্দ, তাঁহার সার্থকতা, তাঁহার গৌরব।

চতুর্থ ভাগ

মনের অভ্যাস, নৈতিক অভ্যাস

শিশুর মনোরাজ্যে মায়ের দৃষ্টি যেমন চলে এমন আর কাহারও নয়, তাঁহার মত সহজে আর কেহ তাহাকে চালাইতে পারে না। এই ক্ষমতা ঈশ্বর-দত্ত। কিন্তু তবু শিক্ষা দেওয়ারও একটা বিজ্ঞান আছে, সেই বিজ্ঞান বা পদ্ধতি শিখিয়া নিলে মায়ের কাজ বহুগুণে সহজ ও সুষ্ঠু হইয়া উঠে।

'অভ্যাস' গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। 'অভ্যাস' করার মধ্যে সাধনা আছে, শ্রম আছে। কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তারপর আর সেই কাজ করা কষ্টসাধ্য হয় না। মা যদি বাছিয়া বাছিয়া গোটা-কুড়ি অতি প্রয়োজনীয় অভ্যাস শিখাইয়া দেন, তবে তাহার জীবনযাত্রা আশ্চর্য্য রকম সহজ ও সরল হইয়া উঠিবে। তারপর আর তাহাদেরে লইয়া মাকেও ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। ছেলেরা নিজের জোরেই সৎপথ মানিয়া চলে। আর সেই অভ্যাসগুলি শিখাইতে যে মা অবহেলা করেন, তাঁহারই সমস্ত জীবনে অশান্তির আর শেষ থাকে না। অভ্যাসের দোষে ছেলেরা যথাযথ ভাবে চলিতে পারে না, চলিতে চায়ও না। প্রতি পদে মা বলেন, 'এইটা কর,' ছেলেরা তাহা করে না; মা বলেন, 'এই দিকে যাও', ছেলেরা তৎক্ষণাৎ উল্টা দিকে চলিতে থাকে। মা তখন কাঁদিয়া বলেন, "আমি কি কখনই শান্তি পাইব না?" মনে রাখেন না, পাইবার পথ যাহা ছিল তাহাকে তিনিই উপেক্ষা করিয়াছেন। 'সমব্যথীর' দল হয়ত বলিবে, "হইতে পারে

অভ্যাসই সব, কিন্তু তাই বলিয়া এত এত অগুণতি সদভ্যাস মানুষ ছেলেকে শিখাইবেই বা কিরূপে? মা বেচারির কি একটু ছুটিও নাই?"

অথচ ছেলেদের অভ্যাস করানোটা সত্যই খুব শক্ত ব্যাপার নয়। 'অভ্যাস' করানোটাও একটা অভ্যাস; ছু'চারবার করার পর মায়েরও বিশেষ কষ্ট হইবে না। আর অভ্যাস ত ছেলেদের একদিনে পঞ্চাশটা করাইতে হয় না, ধীরে-সুস্থে দিনের পর দিন ধরিয়া করাইতে কষ্টও খুব হয় না। কয়েকটা ভাল অভ্যাস তাহাদের মনে গাঁথিয়া দিতে পারিলে তারপর তাহারাও সহজে শিখে, মাও সহজে শিখাইতে পারেন। তারপর মায়ের 'ছুটি' পাইতে বাধা থাকে না। সমস্ত অভ্যাসই বলিয়াও শিখাইতে হয় না; বাড়ীতে প্রচলিত সদভ্যাসগুলি —ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা— তাহারা দেখিয়াই শিখে। অবশ্য সেইজন্যই এগুলি মা-বাবার অভ্যাস রাখা দরকার, নিজের খাতিরে এবং শিশুর শিক্ষারও খাতিরে।

মানসিক অভ্যাসও শিশু কিছু শিখে দেখিয়া, কিছু শিখে উপদেশ পাইয়া। উপদেশ পাইয়া যেগুলি শিখে, তাহার দুই একটা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্।

১। মনোযোগ

মানুষের যতগুলি মানসিক অভ্যাস ও ব্যায়াম আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অভ্যাস, 'মনোযোগ'। মনোযোগ থাকে বলিয়াই আমরা একরাশ কথা ও বস্তুর মধ্য হইতে ঠিক প্রয়োজনীয় কথা ও বস্তুটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, তাহার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিতে পারি, কাজে লাগাইতে পারি।

মনোযোগের অর্থ, একসঙ্গে যতগুলি বস্তু মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মধ্যে একটিকে বাছিয়া তাহার উপরেই সমস্ত মনটাকে নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া। তখন আর অন্য কোন বস্তু বা চিন্তা মনকে স্পর্শ করিতে বা বিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না।

মানুষের মনে সকল সময়েই চিন্তার একটা স্রোত চলে। মনের চিন্তা আমাদের ইচ্ছামত আসে না, আসে নিজে হইতে। পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ও সাদৃশ্য থাকে বলিয়া একটার পর একটা চিন্তা ও ছবি মনের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতে থাকে। ইহার সকলগুলি আমাদের লক্ষ্য করিবার বস্তু নয়; সকলগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতনও নই।

মনের সকল চিন্তা আমরা মুখে প্রকাশ করি না। করিলে একজনের কথা শুনিয়া আর এক জন বিস্মিত হইত; কারণ একজনের মনে যে কারণে যে চিন্তাটা উঠিল, অন্যজনের পক্ষে তাহা বোঝা বা তাহার দিশা পাওয়া অসম্ভব।

শিশুকে একখানা কাচ দেখাইলেন। আপনার ইচ্ছা, এই অবসরে তাহাকে কাচ সম্বন্ধে কিছু কথা বলিবেন—কাচ কি বস্তু, কি ভাবে তৈরী হয়, কি কাজে লাগে, কে ইহার আবিষ্কার করিয়াছিল। সে কিন্তু

মোটেই এসব ভাবিতেছে না। তাহার মনে পর-পর যে কথাগুলি জাগিতেছে তাহা এই রকম :—কাচ—কাচের বুয়াম্—আচার—পিসীমা আচার পাঠাইয়াছিলেন—পিসীমাদের বাড়ীর আমরুলগাছ হইতে একটা ছেলে পড়িয়া গিয়াছিল—সেই ছেলেটা স্কুলে পড়ে—ছেলেটাদের টাইফয়েড হইয়াছে—।

খোকা আপনাকে বলিবে, পিসীমা চমৎকার আচার তৈরী করেন; এবং তারপরই বলিবে, টাইফয়েড্ হইলে মানুষ মরিয়া যায়, না?

কথা দু'টা হঠাৎ শুনিলে অসংলগ্ন লাগে। অথচ খোকা সত্যই অসংলগ্ন কিছু বলে নাই। তাহার মনের মধ্যে কতকগুলি পরস্পর-সংলগ্ন কথাই বহিয়া যাইতেছে। আপনি মোটে তাহার দুইটি টুক্‌রা শুনিয়াছেন, তাই ধরিতে পারেন নাই।

পরস্পর-সংলগ্ন চিন্তার এই ক্রমাবর্ত্তন মানুষের মনের বড় সম্পদ্; কিন্তু ইহাকে সংযত রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে তবেই সম্পদ্; তাহা না পারিলে চিন্তা ও কথা দাঁড়ায় প্রলাপে।

চিন্তার পর চিন্তা মনের মধ্যে দ্রুত ছুটিয়া যাইতেছে; ইহারই মধ্যে এক একটাকে ধরিয়া তাহার উপরে মনটাকে নিবিষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহারই নাম মনোযোগ। এই মনোযোগ না থাকিলেই ভূগোল খুলিয়া শিশুর মন—সাগর—সাগর—পুকুর—পুকুর পারের পোদ্দারের দোকান—লাট্টু—এই ধারায় চলিয়া যায়; মানুষের কথা পড়িতে পড়িতে ফানুসে চড়িয়া আকাশে উধাও হয়। তখন আর পুস্তকে তাহার মন বসে না। সে বলে, বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি মজার কথা অন্যত্র পাওয়া যায়।

যায় ঠিকই। কিন্তু খালি সেই মজার পিছনে ছুটিলে পড়া ত হইবেই না, মনটাও চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে; কোন কিছু লইয়া

ধীরভাবে একাগ্র-চিন্তা করার ক্ষমতাই ক্রমে লোপ পাইবে। মনোযোগ সেই একাগ্রতার ব্যায়াম।

অতি শিশুকাল হইতেই শিশুর মনে মনোযোগ জাগাইতে হইবে। শিশুর হাতের পুতুলটা মাটিতে পড়িয়া গেল, সে আর তাহার কথা মনে রাখিল না, আর একটা খেলনার দিকে তাহার চক্ষু পড়িয়াছে। তাহা হইবে না—সেই পুতুলটা তাহার হাতে আবার তুলিয়া দিন, "বাঃ বাঃ, কেমন সুন্দর," বলিয়া এক মিনিট দুই মিনিট তাহাকে সেইটাই দেখিতে বাধ্য করুন। মনোযোগের এইটাই প্রথম পাঠ।

খুকী একটা সূর্য্যমুখী ফুল দেখিয়াছে। পরক্ষণেই সেটা ফেলিয়া সে একটা গোলাপের দিকে দৃষ্টি দিবে। এই ফাঁকটুকু মা ছাড়িবেন না; চট্ করিয়া তাহাকে সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে কয়টা কথা বলিয়া দিবেন। সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে বলিয়া এ ফুলের নাম 'সূর্য্যমুখী'—দেখিবে সকাল হইতে বিকালে ক্রমশঃ ঘুরিয়া এটা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমমুখী হয়। হল্‌দে ফুল, অনেক রকম আকারের হয়, এতটুকু হইতে এত বড়।

এই কথা কয়টা যতক্ষণ বলা হইতেছে সেই সময়টুকুতে তাহার মন সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া নড়িতেছে না। ইহারই নাম মনোযোগ।

বস্তুর দিকে মনোযোগ দেওয়া সহজ; কারণ, বস্তু তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এবং ভঙ্গি দিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করে। ইহার তুলনায় কথার দিকে মনোযোগ দেওয়া বেশী শক্ত। যে-শিশু আমগাছ দেখিতে মন দিতে পারে, আমগাছের সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা তাহার ভাল লাগে না। এইজন্য প্রথম যখন সে স্কুলে পড়িতে যায়, প্রথম যখন 'কথার' মধ্য দিয়া বস্তুর আলোচনা শুনিতে আরম্ভ করে, সেই সময়টা শিশুর পক্ষে বড় কঠিন সময়। এই সময়েই তাহার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এই সময় যদি তাহার মন বিক্ষিপ্ত হয়, তবে পরে সেই পড়ার উপরে মন দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

মা এই সময়ে লক্ষ্য রাখিবেন, সে যেন বই খুলিয়া না ঝিমায়। বই খুলিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে, বইয়ে তাহার মন বসিতেছে না। তাহাকে অন্য বই পড়িতে দিন, তাহার মন বসিবে।

শিক্ষকেরও এই সময় দেখিতে হইবে, পড়াটা যেন যথা সম্ভব মনোগ্রাহী হয়। বইএর শুষ্ক কথার ভিতর মন বসাইতে যে শ্রমটা শিশুকে করিতে হইতেছে তাহার চাপ তাহার মনে না পড়ে, এইজন্য অন্যদিকে তাহার উৎসাহ বাড়াইতে হইবে। "না পারিলে অন্যের কাছে সে হারিয়া গেল; ছিঃ!" "এটুকু মনে না থাকিলে সে প্রথম হইবে, প্রাইজ নিবে, কি করিয়া?" "আম গাছের কথা ত পড়িতেছ, আমগাছ চেন কেউ?"—এইভাবে তাহার মনের তীক্ষ্ণতাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা না হইলেই শিশুর মন ঝিমাইয়া পড়িবে।

এই ব্যাপারে পড়ার বাঁধা-রুটিন অনেকটা কাজ দেয়। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কাজ করিতে হইলেই তাহার ভয়টা বেশি থাকে। পড়ার রুটিন বাঁধা হইলে শিশুর জানা থাকে, এই বইটা ততক্ষণ মোটে পড়িতে হইবে; সে চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া সে সময়টা পার করিয়া দেয়, এবং দিতে দিতেই ক্রমে সেটা তাহার কাছে সহজ হইয়া আসে।

রুটিন করার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন একটা বিষয় একসঙ্গে বেশিক্ষণ না পড়িতে হয়; এবং, পড়িতে একই রকমের শ্রম লাগে, এই রকম কয়েকটা বিষয় যেন পর পর না পড়িতে হয়। আটবছরের শিশুর পক্ষে একটা বিষয় একসঙ্গে কুড়ি মিনিটের বেশী পড়ার দরকার নাই। যে বিষয় পড়িতে বুদ্ধি বেশী লাগে (যেমন, অঙ্ক বা সাহিত্য) সেইটা সে

প্রথমে পড়িবে; তারপর পড়িবে সেইটি যাহাতে বুদ্ধি কম লাগে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী লাগে শ্রম (যেমন, মুখস্থ করা); তারপর যে কাজ করিবে তাহাতে হাতের বা চক্ষের কাজই বেশী (যেমন, হাতের লেখা, সেলাই); ইহাতে পড়ার পরেও সে ক্লান্তি অনুভব করিবে না। একই ধরণের বই রোজ পড়িলেও একই বিষয় বস্তু যেন রোজ পড়িতে না হয়। একদিন কবিতা, একদিন গল্প, একদিন পাটীগণিত, একদিন বীজ-গণিত, এই ভাবে পড়া বদলাইয়া দিতে হইবে।

পড়ায় মন বসাইবার আর একটা ভাল উপায়, পুরস্কারের লোভ দেখান।

একটা সুন্দর পুরস্কার, ছুটি। এই পড়াটা করিবার জন্য তাহার কুড়ি মিনিট সময় আছে। তাহার চেয়ে কম সময়ে যদি সে পড়াটা তৈয়ার করিতে পারে, তাহাতে যে সময়টুকু বাঁচিবে সেটুকু তাহার ছুটি। শিশু মহা উৎসাহে পড়িতে বসিবে এবং দশ মিনিটে পড়া তৈরী করিতে পারিলে তাহার ছুটিও আছে, বাহাদুরিও আছে, এই উৎসাহে তাহার মনোযোগও অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে।

আর একটা পুরস্কার, অন্যের উপর জয়ের আনন্দ। অনেকে বলেন, প্রাইজের প্রথাটায় উৎসাহ বাড়ায় সত্য, কিন্তু শিশুর মনকে বিকৃতও করে; প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লইয়া রেষা-রেষির, হিংসা-দ্বেষেরও সৃষ্টি হয়। আশঙ্কাটা হয়ত অমূলক নয়; কিন্তু এ আশঙ্কা ত জীবনের সর্ব্বত্রই থাকিবে, উপায় নাই। মা চেষ্টা করিলে এইসব কুফল না জন্মিতে দিতে পারেন; মায়েরা ছেলেদের শিখাইবেন যেন প্রথম হইয়াও তাহারা অহঙ্কারী না হয়; সর্ব্বশেষ স্থান পাইলেও যেন যাহারা উপরে হইয়াছে তাহাদের হিংসা-না করে, কেন না দোষ তাহাদের নয়।

শিক্ষককেও সতর্ক হইতে হইবে যেন 'নম্বর' দিবার সময় তিনি খালি

পড়ায় উৎকর্ষ দেখিয়াই না দেন। অন্যান্য গুণ— অধ্যবসায়, নম্রতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, নীতি-নিষ্ঠা প্রভৃতিও হিসাব করিয়া তবেই তিনি ছেলেদের মধ্যে কে 'ভাল', কে 'ভাল নয়'—তাহা ঘোষণা করিবেন। শিক্ষকের দায়িত্ব ছেলেদের 'মানুষ' করিয়া গড়া। সে জন্য কেবল ভাল স্মৃতি-শক্তি বা ধারণা-শক্তি দেখিলেই চলে না। সকল দিকে নজর না রাখিলে অনেক সময় কুফল দাঁড়ায়, পড়ায় ভাল হইবার মোহে বা গর্ব্বে ছেলে অন্যদিকে মন্দ হইয়া যায়। অন্যকে 'হারাইয়া' দিবার উত্তেজনায় ছেলে হয়ত খালি পরীক্ষার ফাঁকিই শিখে, সত্যকার জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জ্জনের দিকে নজর দিতে চায় না। এটা প্রায় আত্ম-হত্যার সামিল।

পিতামাতার প্রতি আকর্ষণ শিশুর মনে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বাবা-মা খুসী হইবেন, বা অন্য কোন আত্মীয় কি বন্ধু খুসী হইবেন, এই আনন্দেই সে অনায়াসে 'ভাল ছেলে' হইয়া যায়।

জ্ঞানের আকর্ষণ তাহাকে সকলের চেয়ে বড় হইতে প্ররোচনা দিবে। লেখাপড়া জানায় লাভ কত, জ্ঞানের মূল্য কতখানি—এইটা একবার মাথায় ঢুকিলে শিশুর জন্য আর ভাবিতে হয় না। তবে এইটা বুঝিতে তাহার সময় লাগে, কারণ ইহা অনেকখানি 'বিবেচনা' ও 'বুদ্ধির' ব্যাপার।

প্রথম দিকে 'আজ্ঞাপালন' বা অপরকে খুসী করিতেই শিশু মনোযোগী হয়। ইহার পরে আসে তাহার নিজের ইচ্ছার জোর, তখন নিজের খুসীতেই সে পড়িতে বসে ; তখন সে পড়ার 'মজা' বুঝিয়াছে। শিশুর মনের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাইবেন না ; যাহাতে সে আনন্দ না পায় এমন কাজ চাপাইলে তাহার মন নির্জীব হইয়া যাইবে। "পড়ার" নাম শুনিলেই সে ভয় পাইতে শিখিবে।

স্কুলের পরেও ছেলেদের "বাড়ির কাজ" দেওয়া হয়। কিছুটা দেওয়াও দরকার, স্কুলে যাহা শিখিল তাহার পুনরাবৃত্তির জন্য। কিন্তু এই কাজ যেন অতিরিক্ত হইয়া না উঠে। "এতগুলি অঙ্ক কষিতেই তাহার ঘণ্টা বাজে, একটুও সময় পায় না"—এই অবস্থা যখন দাঁড়ায়, তখন শিশুর মানসিক উৎকর্ষ ত ঘটেই না, লাভের মধ্যে হয় স্বাস্থ্যহানি।

অবশ্য সময়ে যে পড়া শিখা হয় না, ইহারও কারণ অনেকক্ষেত্রেই শিশুর মনের বিক্ষিপ্ততা। এই লইয়া সে বসিয়া থাকে, সাত-পাঁচ চিন্তা করে, ঘড়ি বাজিয়া যায়, কিন্তু পড়া সারা হয় না। অভিভাবকেরা একটু চেষ্টা করিলেই এই বদভ্যাস দূর করিতে পারেন। একটা বাঁধা সময় তাহার পড়ার জন্য থাকিবে, ইহার পর তাহাকে পড়া দিতে হইবে। পড়া না হইলে 'আহা' বলা চলিবে না। পড়ার সময়ের পরেই খেলা ও ছুটা-পাটির সময়; সে সময়েও সে বসিয়া পড়া শিখিতে থাকিবে। ক্রমে সে বুঝিবে, খেলার মজাটা ভোগ করিতে হইলে পড়াটাও সারিয়া লইতে হয়। তখন আর সে বই লইয়া ঝিমাইবে না।

২। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা

মনোযোগ হইতেই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসে। শিশু ধৈর্য্য সহকারে কাজ করিয়া চলে; এই চলার গতি বাড়াইয়া তোলা খুব শক্ত নয়। শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন যেন প্রশ্ন করা মাত্র সে উত্তর দেয়, মনে মনে ভাবিবার সময় তিনি দিবেন না। 'কে আগে বলিতে পারে,' 'কে আগে মুখস্থ করিতে পারে' —এই বলিয়া তাহাদের দিয়া অসাধ্য সাধন করানো যায়। অবশ্য অনেক শিশু স্বভাবতই মন্দ-গতি; তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশুদের পিছনে

পড়িবেই। কিন্তু চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা এই মন্দগতিদের গতিকেও কিছুটা দ্রুততর করিয়া তোলা যায়। একটু তাড়াতাড়ি ভাব, একটু তাড়াতাড়ি বল—এইভাবেই বুদ্ধির গতিকে ক্রমশঃ দ্রুত করিয়া তুলিতে হইবে। এক দিনেই এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। দিনে দিনে একটু একটু করিয়া হইবে।

সহিষ্ণুতাকেও এইভাবে বাড়াইয়া তুলিতে হয়। শিশু বলে, "আর অঙ্ক করিতে পারি না, বাবা!" "সত্যই কি পার না? দেখি ত, আর একটা! না পারিলে ত হারিয়া গেলে!" সেই একটা সে করিতে পারিবে। এই ভাবেই ক্রমে তাহার ধৈর্য্য ও ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

৩। চিন্তা

মস্তিষ্কে যত রকমের কাজ চলে, মনস্তত্ত্ববিদের ভাষায় তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তবু মোটামুটি মস্তিষ্কের কাজকে আমরা 'চিন্তা' বলিতে পারি। চিন্তা অর্থ, জানা বা চেনা বস্তু লইয়া আলোচনা করা। সে আলোচনা সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল হইবে; আবোল-তাবোল ভাবনাকে 'চিন্তা' বলা হয় না। 'চিন্তা'র ক্ষমতা কতদূর সে সম্বন্ধে আর্ক্‌বিশপ্‌ টম্‌সন্‌ তাঁহার 'চিন্তার নিয়ম' (Laws of Thought বইয়ে একটি সুন্দর গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

ভ্রমণকারী ক্যাপ্টেন্‌ হেড্‌ দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তর দিয়া চলিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে এক পথ-প্রদর্শক। একদিন যাইতে যাইতে হঠাৎ পথ-প্রদর্শক দাঁড়াইয়া পড়িল; আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া

বলিল, 'সিংহ'! কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ 'সিংহ' বলিয়া হাঁক, এবং সেটাও আকাশের দিকে আঙুল বাড়াইয়া!!—হেড্ একটু আশ্চর্য্য হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অনেক উঁচুতে— এত উঁচুতে যে প্রায় দেখাই যায় না—এক ঝাঁক শকুনি চক্রদিয়া ঘুরিতেছে।

পথ-প্রদর্শকের যুক্তিটা তিনি বুঝিলেন। অনেক দূরে, তাঁহার ও পথপ্রদর্শকের দৃষ্টির বাহিরে, একটা মড়া জানোয়ার পড়িয়া আছে। তাহাকে খাইবার জন্যই শকুনির আবির্ভাব। কিন্তু তাহারা খাইতে নামিতে ভরসা পাইতেছে না। কেন? মড়াটার কাছে কোন হিংস্র জন্তু আছে। কুকুর বা শিয়াল নয়; কুকুর বা শিয়াল হইলে শকুনিরা ভয় পাইত না, কাজেই কোন বড় জন্তু। সে অঞ্চলে সিংহ আছে। অতএব সেটা সিংহই হইবে।

পথ-প্রদর্শক 'সিংহ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল এতখানি চিন্তা। এই চিন্তা করিতে তাহার বেশী সময় লাগে নাই।

কারণ হইতে ফল এবং ফল হইতে কারণ বুঝিয়া লওয়া; যাহা দেখিতেছি, মাথা খেলাইয়া তাহার পরেও কতটুকু কথা আন্দাজ করা—ইহাকেই বলে চিন্তা। শিশুকে এইরূপে 'চিন্তা' করিতে শিখাইতে হইবে।

৪। কল্পনা

শিশুদের কল্পনা শক্তি বাড়ে, এমন সব খেলা ও পড়া তাহাদের দিতে হইবে। মুখস্থ পড়ার মধ্যে একটা ক্লান্তি থাকে, সেখানে শিশুর মন বাঁধা-বস্তুর চাপে পড়ে। কিন্তু কল্পনার মধ্যে সে সৃষ্টির আনন্দ পায়, 'জানার' সীমানা ছাড়াইয়া 'অজানার' রাজ্যে তাহার মন চলিয়া যায়।

কল্পনার অভ্যাস বাড়াইতে হইবে একটু একটু করিয়া। একবারেই কষ্ট-কল্পনা তাহার উপরে চাপাইলে অনিষ্ট হইবে।

অনেকে শিশুদের জন্য উদ্ভট কৌতুক-কল্পনার পক্ষপাতী। উদ্ভট কল্পনায় তাহাদের কৌতুক-বোধ ও হাস্য-রসবোধ বাড়ে। তবুও উদ্ভট কল্পনা অপেক্ষা, স্বাভাবিক ও সহজ কল্পনার দাম বেশি ; উদ্ভটের মোহে স্বাভাবিককে বর্জ্জন যেন না করা হয়। "এলিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড" পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই, বইখানা যে না পড়িয়াছে সে একটা মূল্যবান্ বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তবুও শিশুদের পক্ষে "সুইস্ ফ্যামিলি রবিন্‌সন্"-এর মূল্য অনেক বেশী।

শিশুদেরে বই উপহার দিবার সময়ে এই কথাটা মনে রাখা দরকার। হাস্যরসের বই পড়া তাহাদের দরকার ; স্বভাবের মধ্যে একটা সুন্দর ক্ষমতা তাহাতে জন্মায়। কিন্তু শুধুই হাস্যরসের চর্চ্চায় স্বভাব লঘু হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। 'মজার' বই ছেলেদের দিবেন ; "আজগুবি" বা 'উদ্ভট' পুস্তক খুব বেশী দিবেন না। শিশুদের গল্প বলার সময়েও এই কথাটা স্মরণ রাখিবেন। সাধারণ জীবনের গল্প শুনিয়া শিশু আনন্দ পায় না। সে-সমস্ত তাহার জানা কথা ; তাহার মধ্যে সে কল্পনার খোরাক পায় না। তার চেয়ে অন্য দেশের, অন্য কালের গল্প, ইতিহাসের

অভিযানের গল্প, যাহাতে কল্পনার খোরাক আছে, তাহাই তাহাদের দিবেন।

কল্পনার অভ্যাসটা শুধু আমোদের জন্য নয়। সমস্ত বৃহৎ কাজই প্রথমে কল্পনার আকারে মনে দেখা দেয়। কল্পনা মনকে উত্তেজিত করিয়া সংকল্পে পরিণত করে। তারপর সঙ্কল্প কাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কল্পনাই যাহার নাই, সে কাজ করিবে কি করিয়া? কেহ কেহ বলেন, কল্পনার দিন ফুরাইয়াছে; এখন আর কল্পনা করিয়া বাহির করিবার মত নূতন কিছু পৃথিবীতে নাই। ইহা অত্যন্ত বাজে কথা। কল্পনার সীমা অনন্ত; জীবন যতদিন আছে, কল্পনাও থাকিবে। যাহা কিছু ঘটিতে পারে, যাহা কিছু ঘটা একান্ত অসম্ভব নয়, তাহাই কল্পনা করা চলে। কল্পনার দিন ফুরাইয়াছে, ইহা হইতেই পারে না। কল্পনা একদিনে ফুরাইয়া যায় না, ধীরে ধীরে নূতন নূতন সৃষ্টি সে করে। দিনের পর দিন আমাদের জ্ঞান বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে; তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে কল্পনার সৃষ্টি, তাহাও নূতন নূতন রূপে দেখা দেয়। ইতিহাস পড়িতে পড়িতে যদি শিশু নিজেকে সেই অবস্থায় কল্পনা না করে, ভূগোল পড়িতে পড়িতে যদি চট্ করিয়া তাহার মন সেই পাহাড়ের এবং সমুদ্রের দেশে একবার বেড়াইয়া না আসে, তবে তাহার পড়া আদৌ তাহার মনে বসে নাই।

লেখা বা পড়ার ক্ষমতা যেমন অভ্যাসে বাড়ে, কল্পনাও তেমনই অভ্যাসে বাড়ে। যে শিশু কোন দিন 'কল্পনা' করে নাই, তাহার পক্ষে পরে কল্পনার আশ্রয় লওয়াও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। একবার আরম্ভ করিলে তবেই কাজটা সহজ হইয়া আসে। সেই আরম্ভটা তাহাকে করাইয়া দিতে হইবে; এই শিক্ষার ভার পিতামাতা ও শিক্ষকের উপরে। কি ভাবে পরিচিত বস্তু লইয়া কল্পনা সৃষ্টি করিতে তাহাকে

শিখানো যায়, তাহা লইয়া আলোচনা পরে করিব। এখানে এইটুকুই শুধু বলিয়া রাখা যথেষ্ট, ব্যবহার দ্বারা না বাড়াইলে অন্যান্য অনেক বৃত্তির মত এই বৃত্তিটাও চিরকাল লুপ্ত থাকিবে। বিশেষ কোন একটা বৃত্তির—হাস্য-রস, কবিত্ব-বোধ, ছন্দ-জ্ঞান, সুর-জ্ঞানের—তিল মাত্র সন্ধান পায় নাই, অথচ জীবন কাটাইয়া যাইতেছে, এমন দুর্ভাগ্য মানুষের দেখা কম মিলে না।

কল্পনার প্রথম বিকাশ, যে কোন বস্তুর কারণ আবিষ্কারের ভিতর দিয়া। শিশু যাহাই দেখে, সেইটা 'কেন' হয়, জিজ্ঞাসা করে; এইটাই প্রমাণ করে যে তাহার মনে কল্পনার সাড়া জাগিতেছে। পিতামাতা সেই 'কেন'র উত্তর দিলে, তাহার কল্পনা তৃপ্ত হয়। ইহার পর পিতামাতা আর একটু অগ্রসর হইবেন, শিশুকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, "বলত কেন ?" শিশু যদি উত্তর দিতে পারে, খুব ভাল। না যদি পারে, একটুক্ষণ তাহাকে মাথা খেলাইতে দিন। তারপর তাহাকে বলিয়া দিলেও ক্ষতি হইবে না। তখন সে কথাটা মনে রাখিবে—চিরকালের মত। এই 'কেন' জিজ্ঞাসা করার সুযোগের অভাব কখনও হয় না। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক বস্তুই চক্ষে পড়ে—"শুকনা পাতাটা জলে ভাসিতেছে কেন ?" "ঢেলাটা ডুবিয়া গেল কেন ?" এরকম প্রশ্ন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। এবং এই সব প্রশ্ন হইতেই হঠাৎ একটা নিউটনের জন্ম হইয়া যায়।

৫। স্মৃতি-শক্তি

যে জ্ঞান আমরা দিনের পর দিন আহরণ করি, তাহা সঞ্চিত হয় আমাদের স্মৃতিতে। এই সঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার যাহার যত সমৃদ্ধ, সে তত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান বলিয়া পরিচিত হয়। শিশুকালে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার অনেক কথা পরে ভুলিয়া যাই। কিন্তু তবু সেই কথাগুলি একেবারে মরিয়া যায় না। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত অন্য কথা আমাদের মনে থাকে। প্রথম শেখা কথাটা মনে না থাকিলেও সেইটাই পরে অর্জ্জিত জ্ঞানের ভিত্তি হয়; আমরা তাহাকে মনে রাখি না, কিন্তু তাহার ফল উপভোগ করি। আবার অনেক কথা থাকে, যাহা ইচ্ছামত মনেও করিতে পারি। এই মনে-থাকা এবং আপাততঃ মনে-না-থাকা, দুই প্রকারের কথা লইয়াই স্মৃতি গঠিত হয়।

আর এক রকম স্মৃতি আছে, ইহাকে বলা যায় 'ভাসা' বা লঘু স্মৃতি। কথাগুলি আমরা শিখি, জানি, কিছুক্ষণ মনে রাখি, তারপর ভুলিয়া যাই। ব্যারিষ্টার মামলার খুঁটিনাটি কথাও মনে রাখিয়া আদালতে যান, আদালতে তর্ক-বক্তৃতা সারিয়া বাহির হইয়াই সমস্ত কথা ভুলিয়া যান। ডাক্তার রোগীর লক্ষণ মনে রাখিয়া চিকিৎসা করেন, চিকিৎসা সারা হইবার পর আর তাহার কথা মনে রাখেন না। এই রকমের স্মৃতি প্রয়োজনের অধিককাল মনকে আঁকড়াইয়া বোঝা হইয়া থাকে না। বস্তুত প্রয়োজন ফুরাইলেই ভুলিয়া যাওয়ার এই বিদ্যাটাও অভ্যাস করিতে হয়; জীবনে এটা কাজে লাগে। সমস্ত কথা মনে রাখিতে হইলে যতটা কাজ করা মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব হইত, খানিকটা ভুলিয়া যাওয়ার ফলে তাহার চেয়ে বেশী কাজ সে করিতে পারে। কিন্তু এই অভ্যাসের

বিপদও আছে। ছেলে যদি বছরের শেষে পরীক্ষার জন্য যত বই মুখস্থ করিয়াছিল সমস্তই ভুলিয়া যায়, তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াইবে? অথচ, ছেলেরা সাধারণত করে কি? পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থ করে, জ্ঞানের জন্য নয়; পরীক্ষা পাশ হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভ হয় না।

স্মৃতির ব্যাপার লইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। মোটামুটি যে কয়টা প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে তাহার দু'একটা লইয়াই এখানে আলোচনা করিব।

কথা 'মনে থাকে' কি করিয়া? সেই কথা আবার 'মনে পড়ে' কি করিয়া? যে কথা মনে বসে না, জ্ঞান বাড়ায় না, মনে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া আবার বাহির হইয়া যায়,—সেটাই বা যায় কেমন করিয়া?

'স্মৃতি' ব্যাপারটাই আশ্চর্য্য। এ যেন একটা অভিনব যন্ত্র; যে কোন কথা তাহার সম্মুখে উচ্চারিত হইল, তাহাই সে ধরিয়া রাখিবে, একশ' বছর পরেও বলিবামাত্র সেই কথা একেবারে সেই ভাষায় সেই গলায় আবার বলিয়া দিবে। বস্তুত দেহতত্ত্ববিদ্‌রাও আজকাল মোটামুটি এই কথাই বলেন—স্মৃতির কাণ্ডটা প্রায় যান্ত্রিক। মন যাহা দেখে তাহা ধরিয়া নেয়। তারপর সেইটা মস্তিষ্কের তন্তুর মধ্যে একেবারে খোদাই হইয়া যায়।

ইহার পরই প্রশ্ন উঠে, মস্তিষ্কে ঘটনার এই যে ছাপ খোদাই হইয়া পড়ে, ইহা পড়ে কোন্ কোন্ অবস্থায়? এই ছাপ কি চিরস্থায়ী? মস্তিষ্ক কি এই ছাপ যত ইচ্ছা ততই নিতে পারে, না তাহার ধারণ-ক্ষমতার একটা সীমা আছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর, যে-কোন বস্তু বা ঘটনাকে আমরা 'মনোযোগ' দিয়া লক্ষ্য করি, তাহাই মস্তিষ্কে খোদাই হইয়া যায়। মনে রাখিতে

হইলে মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা চলিত কথায় বলি, "দৃশ্যটা আমার মনে একেবারে দাগ কাটিয়া দিল।" সত্যই সেটা "দাগ কাটিয়াছে"। মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে, মনের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিয়াছে, তারপর সেখানে ছাপার অক্ষরের মত তাহার 'ছাপ পড়িয়াছে'। সে ছাপ আর মুছিবে না। শিশুকে কোন কথা 'মনে রাখাইতে' চান? তাহার সমস্ত মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট করুন। তাহার মস্তিষ্কে সেই কথার ফটোগ্রাফ উঠিয়া যাইবে। বৃদ্ধ বয়সেও সেই ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিবে। কিন্তু শুধু একটি একটি ছবি আলাদাভাবে মস্তিষ্কে গাঁথিলেই হইবে না। একটা কথা হইতে যাহাতে আর একটা কথা মনে পড়ে, এইভাবে কথা ও ছবিগুলিকে পরপর সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই জ্ঞানটা পুরা হয়, তাহার উপর ভর করিয়া নূতন চিন্তা করা চলে। এই জন্যই প্রতিটি বস্তু তাহাকে চিনাইবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ অন্য বস্তুর সহিত সেটার সাদৃশ্য, পার্থক্য ও সম্পর্ক কি তাহা জানাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দিনের পড়া যেন এমন হয় যে, আগের দিনের পড়ার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তাহা হইলে আজিকার পড়া পড়িতে বসিলেই কালিকার পড়াটাও তাহার মনে পড়িবে; এবং এইরূপে সারা বছরের, সারা জীবনের 'পড়া' একত্র হইয়া তাহার জ্ঞানকে সম্পূর্ণ, অখণ্ড ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।

কথা কেবল মুখস্থ করিলেই হয় না, সেটা মনে বসিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কে নূতন তন্তুর সৃষ্টি হইয়া সেইখানে তাহার ছাপ থাকিবে; এই তন্তু সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত কথাটাকে মনে রাখিলে তবেই সেটা স্মৃতিতে গাঁথিয়া যায়, তারপর আর মোছে না। লঘু স্মৃতি মনে আসে, কাজের শেষে আবার সরিয়া যায়। তাহার কারণও এই। নূতন তন্তু সৃষ্টি

হওয়ার মত সময় আমরা এরূপ ক্ষেত্রে দিই না,— কারণ তাহাকে লইয়া ততখানি সময় কাটাইবার উৎসাহ, বা তাহাকে যত্ন করিয়া মনে রাখার প্রয়োজন আমাদের থাকে না।

কিন্তু স্মৃতিতে দাগ কাটিয়া বসিবার, অর্থাৎ নূতন তত্ত্ব শিখিবার মত সময় দিয়া যদি চলা যায়, তাহা হইলে মোট কত বস্তু আমরা মনে রাখিতে পারি তাহার সীমা নাই। সেদিক দিয়া মস্তিষ্কের ও স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা সত্যই অসীম।

একটা ব্যাপার কিন্তু ঘটে। অনেক সময়ে দেখা যায়, অল্প বয়সে একটা বিষয় অত্যন্ত মন দিয়াই শিখিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দেখা গেল তাহার এক বর্ণও মনে নাই। এরূপ হইবার কারণ, চর্চ্চার অভাব। একবার মনে রাখিবার পর আর তাহাকে 'মনে করা' হয় নাই; সেটা মনের মধ্যে হয়ত আছে কিন্তু আর পাঁচটা বস্তুর তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার বাহিরে আসিবার পথ খোলা রাখা হয় নাই। সেক্ষেত্রে মনের গহন অন্তস্তলে তাহার থাকা না থাকা সমান। কুয়ায় জল আছে কি না-আছে তাহাতে কি আসে যায়, যদি সে জল তুলিবার পথ না থাকে? সে জলে তৃষ্ণা মিটিবে না।

এইভাবে অব্যবহৃত জ্ঞান চাপা না পড়ে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার একটি উপায় আছে, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে একত্রে জড়াইয়া রাখা। শিশু আজ বইয়ে সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের কথা পড়িল, কাল হল্যাণ্ডের কথা পড়িবে। দুইটা দেশের কিছুই মিলে না। "হল্যাণ্ড সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের মত নয়", এই কথাটাই সে মনে রাখুক; হল্যাণ্ডে কি আছে এবং নাই, তাহা মনে করিলেই সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে সেই জিনিষগুলা নাই এবং আছে, তাহা তাহার মনে পড়িবে। অতএব হল্যাণ্ডকে মনে রাখিয়াই সে সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডকেও মনে রাখিবে।

আর একটা কথা। কোন বস্তুকে চিনিতে হইলে আমরা অনেক সময় চিনি তাহার রং, রস, গন্ধ, শব্দ বা অবস্থান দিয়া। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই গুণগুলি জ্ঞানসঞ্চয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়; কোন বিশেষ 'গন্ধ' বা 'রং' 'মনে থাকে' না। মনে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় বস্তুর 'স্বরূপ' ও 'প্রকৃতি' জানিয়া তাহা মনে রাখা। সে জ্ঞান মোছে না। কেবল গন্ধ দিয়া যদি চিনিতে হয়, সর্দ্দি হইলেই সে বস্তু 'অপরিচিত' হইয়া যাইবে।

৬। নিখুঁতভাবে কাজ করা

"যাই কর ভাল করিয়া করিও"— এই একটা উপদেশ মানিয়া চলিলে অনেক কিছুই জীবনে করিতে পারা যায়।

কাজ করিলে নিখুঁত করিয়াই করিতে হইবে। খুঁটিনাটি না দেখিয়া অসম্পূর্ণভাবে অনেকখানি কাজ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত লাভ বেশী দাঁড়ায় না।

জার্ম্মেণীর একটা স্কুল একবার দেখিতে গিয়াছিলাম। জন-চল্লিশেক ছেলে শ্লেট্ লইয়া লিখিতেছিল; শিক্ষক মুখে বলিতেছিলেন এবং বোর্ডের উপর লিখিয়া দেখাইতেছিলেন।

ছেলেরা যখন শ্লেট্ দেখাইল, দেখিলাম, চল্লিশখানা শ্লেটের একখানাতেও কোথাও একটি ভুল বা বাঁকা অক্ষর লেখা হয় নাই। ছেলেদের এইভাবে 'নিখুঁত' কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়ার দিকে নজর জার্ম্মেণী এবং ফ্রান্সে খুব বেশী দেওয়া হয়। "শিশুদের কাজ, একটু খুঁত ত থাকিবেই", এই বলিয়া খুঁতকে মানিয়া লওয়া হয় না; যেমন তেমন বেগার দিয়া শিশু এড়াইয়া যাইতে পারে না।

যে-কাজ তাহার পক্ষে সত্যই নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয়, তাহা শিশুকে করিতে দিবেন না। তাহার শক্তিতে যাহা কুলায় তাহাই তাহাকে করিতে দিবেন, এবং তারপর লক্ষ্য রাখিবেন যেন সে ঠিক-ঠিক ভাবে কাজটি করে। তাহাকে কতকগুলি অক্ষরের রেখা আঁকিতে দিলেন। সে এক স্লেট ভর্ত্তি রেখা যেমন তেমন করিয়া টানিয়া আনিয়া দেখাইল। রেখাগুলা কোনটা কোনটার সঙ্গে মেলে না; কোনটা কোনটার সঙ্গে সমান নয়, সমান্তরাল নয়; যা-খুসি করিয়া এক স্লেট বনজঙ্গল আঁকিয়া সে ধরিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে তাহার শিক্ষাও কিছু হয় নাই; চক্ষুর ব্যথা হইয়াছে; এবং তাহারও উপরে হইয়াছে স্বভাবের অবনতি; নিখুঁত কাজ করিতে শেখার বদলে সে ফাঁকি দিতে শিখিয়াছে।

তার বদলে তাহাকে মাত্র ছয়টি রেখা আঁকিতে দিন; প্রত্যেকটি যেন একই ভাবে কাৎ হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আঁকা হয়, সমান দূরে এবং সমান রেখায় হয়। আঁকা ঠিক না হইলে তাহাকেই বলুন কোথায় ভুল হইয়াছে বাহির করিবে, এবং তারপর আবার ঠিক করিয়া সেটা আঁকিয়া আনিবে। একবারে না পারিলে পাঁচবারে পারিবে, একদিনে না হইলে পরের দিনও ঐটাই আঁকিবে। এমনই করিয়া যখন তাহার আঁকা নিখুঁত হইবে, তখন দেখিবেন সে শুধু রেখাই আঁকিতে শেখে নাই, নিখুঁত কাজ করিতেও শিখিয়াছে। এইটুকু যতক্ষণ না ঠিক হইতেছে, ততক্ষণ তাহার শিক্ষা সারা হয় না।

আরও একটি শিক্ষা এইখানেই দিতে হইবে, সেটি হাতের কাজ সারা। একটি কাজ ঠিক রকম সারা হইলে, একটি পড়া ঠিক রকম শেখা হইলে, তবেই সে নূতন কাজে নূতন পড়ায় হাত দিবে, তার আগে নয়। বিদ্যা তাহার কতটা হইল তাহা স্থির হয় সে সত্যই কতটুকু

শিখিয়াছে তাই দিয়া, বইয়ের কয় অধ্যায় পাতা উল্টাইয়াছে বা কত পাতা ছিঁড়িতে পারিয়াছে তাহা দিয়া নয়।

৭। 'কথা শোনা'

'কথাশোনা' শিশুর কর্ত্তব্য—একমাত্র কর্ত্তব্য; শিশু নিজের পথ নিজে স্থির করিয়া চলিতে পারে না, অপরের নির্দ্দেশে তাহাকে চলিতে হইবে। জীবনে যাহাকে সম্বল করিয়া চলিবে সেই সদভ্যাস তাহাকে এখনই শিখিতে হইবে; এবং শিখিতে হইবে অভিভাবকের কথা মানিয়া। কাজেই শিশু যদি কথা মানিতে রাজি না থাকে, তাহার শিক্ষা আদৌ অগ্রসর হইবে না।

সাধারণতঃ কথা শুনিবার দিকেই শিশুর প্রবৃত্তি থাকে। সে যে বাবার মার উপরে নির্ভর করিতেছে সেই নির্ভরেরই এটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু সকল সময়ে সে কথা শুনিতে নাও চাহিতে পারে। না চাহিলে পিতামাতা তাহাকে কথা শুনাইয়া ছাড়িবেন। 'আহা' বলিয়া তাহাকে রেহাই দেওয়া অন্যায়। পিতামাতা মনে রাখিবেন, শিশুর যেমন কথা শোনা কর্ত্তব্য, শিশুকে চালাইয়া নেওয়া, কথা শোনানোও তেমনই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, সেটা তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। শিশুকে অবাধ্য হইতে দিবার অধিকার তাঁহাদের নাই; দিলে তাঁহারা নিজেরা কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন।

আগেই বলা হইয়াছে, শিশুদের মনেই কথাশোনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। 'উচিত' ও 'অনুচিতের' বোধ তাহাদের অতি প্রখর। এবং সেই বোধ হইতেই তাহারা সাধারণতঃ কথা শুনিতে চায়, নিজের খুসিতেই চায়। এই জন্য তাহাদেরে কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে এইটা শোনাই তাহাদের উচিত, শুনিলে মঙ্গল হইবে। তাহা হইলেই তাহারা শুনিতে আপত্তি করিবে না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, শিশু কথা শুনিতে চাহিতেছে না। বদরাগী পিতামাতা—যাঁহারা শিশুকে কারণে অকারণে দাঁত খিঁচুনি দেন, তাঁহাদের শিশুরা কথা শুনিতে চায় না। পিতৃমাতৃহীন শিশু অনাথ আশ্রমে মানুষ হইতেছে, অস্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে খালি ধমক খাইয়া দিন কাটাইতেছে, ইহারা ফাঁক পাইলেই কথার অবাধ্য হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। উচিত বা অনুচিত বোধ ইহাদের মধ্যে জন্মানো হয় নাই। শুধু ধমকের জোরেই যেখানে তাহাদের কাজ করিতে ও কথা শুনিতে বাধ্য করা হয়, সেখানে কথার উপরে তাহাদের শ্রদ্ধা থাকে না; কথার দাম তাহারা ধরে ধমকের ওজনে। সেরূপ কথা তাহারা নিজের খুসিতে মানিবে কেন? কিন্তু তাহাদের ভিতরকার শুভ-বুদ্ধিকে জাগাইয়া দিন। তাহারা সানন্দে কথা শুনিবে। মায়েরা অনেক সময়ে এই ভুল করেন, ধমকের জোরে শিশুকে কথা শুনাইতে চান। ভুলিয়া যান, ঈশ্বর শিশুকে তাঁহার কথার বাধ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার কথা সে নিজে হইতেই শুনিতে চায়। তাহাকে কথা শুনাইবার জন্য মারধর বকাবকি করা অনাবশ্যক। তিনি যদি শুধু বলেন, 'এইটা কর', এবং তারপর নিজেও প্রত্যাশা করেন যে সে করিবে, তবে সে-ও না করিয়া পারে না। ধমক তাহাকে দিতে হয় কেন? দিতে হয়, যেহেতু মা'র নিজেরই মনে জোর নাই; শিশু তাহার কথা শুনিবে এইটাই যেন তিনি ভরসা করিতে

পারেন না। তাই আদেশের সঙ্গে শাস্তির চাপ দিয়া সেই আদেশ তাহাকে পালন করাইতে চান। শিশু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়া নেয়, মার মনেও দুর্ব্বলতা আছে। সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। মার যদি নিজের ক্ষমতার, নিজের অধিকারের উপর, নিজেরই বিশ্বাস না থাকে, তবে শিশুই বা সে অধিকার মানিবে কেন? তাহাকে বুঝাইতে হইবে, মার কথাই যথেষ্ট, সে কথা না মানিলে উপায় নাই। এইটা বুঝিলে সে আর অবাধ্য হয় না।

আর এ-কথা যদি সে টের পায়, মার কথা না মানিলেও চলে, তারপর আর তাহাকে বশে আনা শক্ত হইয়া উঠে। আর এক রকমের দুর্ব্বলতা মা প্রকাশ করেন, শিশুর আবদারকে প্রশ্রয় দিয়া ও অবাধ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া। শিশুরা ঘরে বসিয়া আছে; বাহিরের লোক কেহ আসিল। মা বলিলেন, "তোমরা ওঘরে যাও ত।" তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিল, "না মা, আমরা ওই কোণে ব'সে থাকি? একটুও গোল করব না, খুব লক্ষ্মী হ'য়ে থাক্‌ব। কেমন?"

শিশুরা কি ভয়ানক বিনীত, দেখিয়া মা মুগ্ধ হইয়া যান। শিশুরা ঘরেই থাকিয়া যায়; 'লক্ষ্মী' হইয়া থাকে না অবশ্য, কিন্তু সেইটাই এখানে বড় কথা নয়; মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা না করিয়া তাহারা পারিয়াছে, তাহাদের কথাই রহিয়াছে। পরের বারে নিজেদের এই 'স্বাধীনতা' বজায় রাখিবার জন্য একটু যুদ্ধ না করিয়া তাহারা মাথা নোয়াইবে না। এই ধরণের খুচরা অনবধানতার ফলেই মা ক্রমে নিজের অধিকার ও শক্তি হারাইতে থাকেন। বড় রকমের অবাধ্যতার চেয়েও এই খুচ্‌রা অবাধ্যতা খারাপ, কারণ এগুলা চোখে পড়ে না, প্রতিকারের চেষ্টাও হয় না। "খোকা, শুতে যাও।

"মা, আর একটুখানি প'ড়ে নিই।"

মা আপত্তি করেন না। ভুলিয়া যান যে এই এখনকার কথাটাই বড় নয়; বড় কথাটা হইতেছে, শিশুকে কথা শোনার অভ্যাস করানো। এই ধরণের আবদারে সেই শিক্ষায় বাধা পড়ে। শিশুদের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ; কোথায় ফাঁকি দেওয়া চলে, বাহিরের আকারটা বজায় রাখিয়া আসল কাজটা কি ভাবে এড়ানো যায়, সেটা তাহারা ঠিক ধরিয়া ফেলে।

"খুকু, শুনে যাও।"

"যাচ্ছি।"

কিন্তু আরও চার বার তাহাকে ডাকিতে হয়, তারপর সে আসে।

"এখন আর খেল্‌বে না। পুতুল রেখে দাও।" মেয়ে পুতুল তুলিয়া রাখে, কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। সে অনিচ্ছাটা সে গোপন করে না।

"খাবার আগে সব সময় হাত ধোবে।" খোকা সেবার হাত ধোয়। কিন্তু তারপর আর ধোয় না।

শিশুর এই রকম খামখেয়ালি, কথা শুনিতে অনিচ্ছা, ভাল নয়। মা সহজেই এইটা ঠেকাইতে পারেন, প্রথম হইতেই তাহাদেরে কথা শুনিতে বাধ্য করিয়া। জোরজার করিয়া কথা শুনাইয়া লাভ নাই; এমন ভাবে তিনি চলিবেন যেন তাহারা নিজের ইচ্ছায় এবং মনের আনন্দেই কথা শোনে। একটু বড় হইলে তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, কেন তাহার কথা শোনা দরকার। তারপর সে নিজের বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াই কথা শুনিবে; আর তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না।

শিশুকে কথা শুনাইবার প্রধান উপায় এবং মায়ের প্রথম কর্ত্তব্য, নিজেকে সংযত রাখা। তিনি সত্যই শিশুকে দিয়া যে কাজ করাইতে চান সেই কাজই তাহাদেরে করিতে বলিবেন। যেটা তাহাদের করিতেই হইবে বলিয়া মা'র নিজের মনেই ধারণা নাই, সেটা যেন তাহাদের তিনি

করিতে না বলেন। কারণ সেটার বেলায় তাহারা কথা না শুনিলেও তাঁহার বিশেষ বাধিবে না; তাহাদের সেই অনিচ্ছা তিনি সহ্য করিয়া যাইবেন, এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বভাবকে বিকৃত করিয়া তোলার সাহায্য করিবেন। শিশুরা 'দরকারী' 'অ-দরকারী' বোঝে না, একটা কথা না শুনিয়া এড়াইতে পারিলে তাহারা পরের কথাটাও এড়াইতে চায়; এবং তারপর আর মা তাহাদের বশে রাখিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় কথা, যাহা শিশুর সাধ্যে কুলায়, তাহাই যেন মা তাহাকে করিতে দেন। অসাধ্য কঠিন কাজ, বা একটার উপর একটা করিয়া কাজের রাশ কেবলই তাহার উপর চাপাইলে শিশু বাধ্য হইয়া ফাঁকি দিবে, বিদ্রোহ করিবে।

যে শিশু কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাকে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়াই সুযুক্তি। মোটামুটি কি কি করা উচিত অনুচিত তাহার খানিকটা নির্দ্দেশ দিয়া তারপর তাহাকে খুঁটিনাটি ব্যাপারে নিজের মতেই চলিতে দিন; অনাবশ্যকভাবে "কর" এবং "করিও না" এইরূপ আদেশের চাপে তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিবেন না।

৮। সত্য-কথন

সত্য কথা বলার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন যুক্তি-তর্ক অনাবশ্যক। সত্য কথা বলার অভ্যাস কি করিয়া জন্মাইতে হয়, তাহা লইয়াই একটু আলোচনা করিব।

মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দাঁড়ায় তিনটি উপায়ে ; সত্যটা কি তাহা ঠিক করিয়া জানিতে আলস্য, ঠিক সত্য কথাটাই যে বলিতে হইবে সেই চেতনার অভাব, এবং ইচ্ছা করিয়াই ঠকাইবার উদ্দেশ্য।

অভ্যাস তিনটাই খারাপ ; যে কোন প্রকার একটা মিথ্যা কথার ফলে একটা লোকের জীবনই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে। খেয়াল করিলাম না, যা-খুসি একটা কথা একজন লোকের নামে বলিয়া দিলাম, বা অন্যের মুখে যা শুনিয়াছি সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়া সেইটাই বলিয়া বেড়াইলাম—এগুলিতেও অনিষ্ট হয় ; এ-গুলিও 'মিথ্যা' কথাই।

শিশুদের বেলায় আমরা সাধারণতঃ ইহার সবটাকে সমান গুরুত্ব দিই না। ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলিলেই তাহাকে শাস্তি দিই ; অন্য দুই ক্ষেত্রে না ভাবিয়া কথা বলিলে বা না জানিয়া শোনা কথার পুনরুক্তি করিলে সেটা গ্রাহ্য করি না।

শিশু বলিল, "অনেকগুলো কুকুর দেখে এলাম ;" দেখিয়াছে মাত্র দুইটা। "সব্বাই আম কুড়োতে গিয়েছে ;" গিয়াছে মাত্র ৩টা ছেলে। "সব্বাই বল্‌ছে হারুটা চোর ;" একমাত্র চিনুকেই সে বলিতে শুনিয়াছে। এগুলা সত্য কথা নয় ; তবুও এই সব বিচ্যুতি মা আমলে আনেন না, বলেন, "ছেলেমান্‌ষি" ; অথচ এই ধরণের প্রত্যেকটি 'ছেলেমানুষি' বিচ্যুতি শিশুর মনে সত্যপ্রিয়তার চেতনাকে ভোঁতা করিয়া আনিতেছে। সে বস্তুটাকে ভোঁতা করা বড় সহজ এবং একবার ভোঁতা হইলে আবার ধারালো করিয়া তোলা বড় কঠিন।

মিথ্যা বলার প্রলোভন আসে সাধারণতঃ অত্যুক্তি করার, বা কথার উপর রং ফলাইবার প্রবৃত্তি হইতে ; দুইটাই জোরালো প্রবৃত্তি। একটু বাড়াইয়া বলা ; বলার সময় কল্পনা খাটাইয়া একটু ডালপালা জুড়িয়া দেওয়া—এই লোভ সামলানো শিশুর পক্ষে শক্ত। অথচ একবার

'মিথ্যাবাদী' বা 'গল্পবাজ' বলিয়া নাম রটিলে শিশু বা বয়স্ক কেহই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না; লোকসমাজে সে লঘু-প্রকৃতি ও উপহাসের পাত্র বলিয়া পরিচিত হইতে বাধ্য।

শিশুর কথায় অত্যুক্তির আভাস পাইলেই মা সতর্ক হইবেন। জেরা করিয়া তাহার কথায় মিথ্যাটুকু বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিবেন, তাহার মিথ্যা ধরা পড়িয়াছে। এইভাবে লজ্জা পাইলে সে ভবিষ্যতেও সাবধান হইয়া যাইবে। সব সময়ে ঠিক ছাঁকা সত্যটুকুই বলিতে হইবে। কথার উপর রং চড়ানো মিথ্যা বলারই সামিল, অতএব সেটা চলিবে না। এই বুদ্ধিটা শিশুর মাথায় যদি মা ঢুকাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার অভেদ্য বর্ম তিনি তৈরী করিয়া দিলেন, আর তাহার 'মিথ্যাবাদী' হওয়ার ভয় নাই।

৯। মেজাজ

'মেজাজ' বস্তুটাকে সাধারণতঃ 'প্রকৃতিগত' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, ওটা লইয়াই মানুষ জন্মায়। এবং যার যা মেজাজ সে তাহার দেহ-সংস্থানেরই ফল। "আহা, কি লক্ষ্মী মেয়ে, বকো ঝকো মুখে রা'টি নেই।" "বাপ্‌রে বাপ ঠিক বাপের মেজাজটি পেয়েছে ছেলে, পান থেকে চুণটি খসেছে কি রেগে একেবারে আগুন।" এই ধরণের কথা প্রায়ই শোনা যায়।

মেজাজের কিছুটা বংশগত, এমন হইতে পারে। পূর্ব্বপুরুষের খোস মেজাজ, বদ্‌মেজাজ, কৌতুকপ্রিয়তা বা গাম্ভীর্য্য কিছু পরিমাণে

লইয়া আমরা জন্মাই, ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু জন্মগত যদি মেজাজ হয়ও, শিক্ষার দ্বারা সেটাকে মোটেই শোধরানো যায় না, এমন মনে করা শক্ত। মানুষের জীবনের অনেকখানি সুখদুঃখই নির্ভর করে তাহার মেজাজের উপর—লোকের সঙ্গে সে কিরূপে ব্যবহার করিবে, কি ভাবে মিশিবে, নিজের জীবনের দুঃখকষ্ট, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার উপরে। মেজাজের দ্বারাই একজন অন্য লোকদেরে আনন্দ ও ভরসা দেয়, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে; আর একজন চারিদিকে শত্রু সৃষ্টি করে, লোকে দূর হইতে তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলে। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী, অন্তরটাও খারাপ নয়, অথচ কড়া মেজাজের কল্যাণে সংসারে কেহই তাঁহার সঙ্গে মিশিতে চায় না—এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়।

ইহারা কি সত্যই এইরূপ মেজাজ লইয়া জন্মাইয়াছিল? হয়ত তাই, কিন্তু তবু মেজাজের সেই জন্মগত কঠোরতা, রুক্ষতা বা মাধুর্য্য অভ্যাসের ফলে অশেষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চেষ্টা করিয়া হয়ত বদ্‌মেজাজ কেহ ইহাদের মধ্যে জন্মায় নাই। কিন্তু যে বদমেজাজের সূচনা লইয়া সে জন্মাইয়াছিল তাহাকে শোধরাইবার চেষ্টাও কেহ করে নাই; নির্ব্বিবাদে তাহাকে বাড়িতে দিয়াছে। বাপের মেজাজ! বাস! তবে আর কি? তাহার বদ্‌রাগী হইবার অধিকারও তাহার পিতৃপরিচয়ের মতই শাশ্বত। সেই মেজাজ বদলাইতে আছে? সর্ব্বনাশ! সেটা তাহার 'রেজিষ্টার্ড মার্ক', সে যে সত্যই তাহার পিতার পুত্র তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ-পত্র!

অথচ সেই মেজাজকে নিশ্চয়ই শোধরান যাইত এবং শোধরাইলে মানুষটা হয়ত লোকপ্রিয় হইতে পারিত। ফলকথা, শিশু অপরিবর্ত্তনীয় মেজাজ লইয়া জন্মায় না। জন্মায় সে বড়জোর মেজাজের একটা ধাত

বা সূচনা লইয়া। নির্ব্বিবাদে বাড়িতে পাইলে সেই ধাত নিজের ধারাতেই আত্মপ্রকাশ করিবে। কিন্তু সময়ে সাবধান হইলে তাহার সেই গতিকে বদলাইয়া দেওয়াও যায়। 'ধাত' অভ্যাসের বশেই 'মেজাজে' পরিণত হয়। অভ্যাসটাকে গোড়া হইতেই যদি ঠিক পথে চালাইয়া নেওয়া হয়, তবেই আর ভয় থাকে না। পিতামাতা লক্ষ্য রাখিবেন, শিশুর মধ্যে কোন বদ্-মেজাজী আচরণ আত্মপ্রকাশ করে কি না। অন্যায় মেজাজ দেখিলেই তাহাকে বাধা দিবেন। এবং বিপরীত রকমের একটা সু-আচরণ তাহাকে অভ্যাস করাইয়া দিবেন। সর্ব্বদাই একটা অসন্তোষ, একটুতেই খুঁত খুঁত করা, কথায় কথায় কড়া বা দুর্বিনীত ব্যবহার, এইগুলিকে ছোট বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। এই সামান্য ছিদ্র দিয়াই পাপ প্রবেশ করে। সেই রন্ধ্র পথে যত বিশ্রী ইচ্ছা ও চিন্তা চলিয়া চলিয়া মেজাজটাকেই ক্রমে বিকৃত করিয়া দেয়, তখন আর সারিবার সময় থাকে না।

'বড় হইয়া সারিবে', এ ভরসা মিথ্যা। 'বড় হইয়া' কু-অভ্যাস সারে না, বাড়ে। শিশুর মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পান একজন মাত্র, তিনি মা। শিশুর মনের চিন্তার উপরেই তিনি লক্ষ্য রাখিবেন, চিন্তার মোড়টাকে ভালর দিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর কুচিন্তার স্রোত মনের তলায় বহিয়া বহিয়া কু-মেজাজের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। শিশুর মধ্যে ক্রোধ বা হিংসা জাগিয়া উঠিতেছে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার মনটাকে অন্য-দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিবেন। অন্য একটা কোন দৃশ্য, ঘটনা বা কাজের মধ্যে তাহাকে নিবিষ্ট করিয়া দিবেন। যে চিন্তা একদিন করি সেই চিন্তা পরদিন সহজে আসে। একদিন যদি শিশু অভদ্রতা প্রকাশ করে, পরদিন আরও সহজে তাহা করিবে। একদিন যদি অভদ্রতার ইচ্ছা হইতে মনকে

সংযত করিয়া ফিরাইয়া নেয়, পরদিন আরও সহজে মনকে সেইভাবে সংযত করিতে পারিবে। এইভাবে আস্তে আস্তে শিশুর 'জন্মগত' মেজাজকে ভালর দিকে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু অতি সাবধানে, যেন সে নিজে টের না পায় তাহার চিকিৎসা চলিতেছে। টের পাইলেই সে সতর্ক হইবে, বাহিরে প্রকাশ না করিয়াও মনের মধ্যে গোপনে সে বদভ্যাসের দুষ্ট-সর্পকে বাঁচাইয়া রাখিবে। আর তার অলক্ষ্যে শোধরানো চলিলে অভ্যাসক্রমে ধীরে ধীরে তাহার প্রকৃতিই বদলাইয়া যাইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া কথা বলা সম্ভব নয়। শরীর ও মনের পক্ষে হিতকারী কতগুলি অভ্যাস কি ভাবে জন্মানো যায় তাহারই আলোচনা করিলাম। প্রকৃতি-গঠনের চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া এইগুলি অতি আবশ্যক বস্তু। এই রকম আরও অনেক বস্তু ছিল, যেগুলির আলোচনা করা সম্ভব হইল না। বাছিয়া বাছিয়া দুই চারিটা বিষয় লইয়া কথা বলিতে হইল। সাধারণতঃ পিতামাতার চক্ষে যেগুলি পড়ে না, প্রধানতঃ সেই সব কথারই আলোচনা করা গেল। মোটামুটি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান পিতামাতাদের চক্ষে যেটা স্বভাবতঃ নিজে হইতেই ধরা পড়ে, সেই সব কথার আলোচনা বাদ দেওয়া গেল। সে গুলি তাঁহারা নিজেরাই বুঝিবেন, এই ভরসা।

পঞ্চম ভাগ

শিক্ষার উপায় হিসাবে 'পাঠাভ্যাস'

১। পাঠের বিষয় ও পদ্ধতি

এ যুগটাই মাষ্টারির যুগ। শিশুর শিক্ষার ব্যাপার পেশাদার শিক্ষকের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত হন।

তাহারা কি পড়িবে এবং কেমন করিয়া পড়িবে সেটা শিক্ষকই স্থির করেন। অথচ পিতামাতার এতটা নির্ভরতা বা ঔদাসীন্য দেখানো অত্যন্ত অন্যায়। শিক্ষকের হাতে পড়াইবার ভারটা না হয় থাকিল, কিন্তু শিশু বড় হইয়া কি হইবে, অতএব শৈশবে কি পড়িবে না পড়িবে, সে সম্বন্ধে চিন্তাও যদি পিতামাতা না করেন তাহা হইলে চলিবে কেন? শিক্ষক হয়ত যত্ন করিয়াই শিক্ষা দেওয়ার কার্য্য চালাইয়া যান; তবু শিশুর পিতামাতা বুঝিয়া শুনিয়াই তাহার পদ্ধতি অনুমোদন করিতেছেন, এইটুকু জানিলে তাহারও উৎসাহ বাড়ে।

কিন্তু, পেশাদার শিক্ষকের পক্ষে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া ধরা-বাঁধা প্রণালী চালাইতে চাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সেখানে পিতামাতা সতর্ক না হইলে চলে না। মাহিনা-করা মাষ্টারের হাতে ছেলের সকল ভার ছাড়িয়া দিলাম; মাষ্টারের বিদ্যা ও বুদ্ধি যতটুকু ততটুকুই তিনি পড়াইলেন। তার উপরে আর শিশুর বিদ্যা অবশ্যই বাড়িতে পারিবে না। এবং ইহার ফলে সে পড়ায় কাঁচা থাকিয়া যাইবেই। ক্রমে হয়ত পড়াতেই তাহার উৎসাহ ফুরাইয়া যাইবে।

সবচেয়ে ভাল পড়া হইবার কথা বাড়ীতে; কিন্তু বাড়ীতে পড়া সব সময় সম্ভব হয় না। মায়ের আরও কাজ-কর্ম্ম আছে, তিনি সব কিছু ফেলিয়া পড়াইতে বসিতে পারেন না। সহরে যাহাদের বাস তাহারা শিশু একটু বড় হইলেই তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়া দিতে পারেন। গ্রামে যাহারা থাকেন অনেক সময় তাহাদের হাতের কাছে স্কুল থাকে না, বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইতে হয়। তখন লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন সেই মাষ্টার অযোগ্য না হয়। অর্থাৎ পিতা মাতাকে সময় করিয়া সেই মাষ্টারের মাষ্টারি করিতে হয়। "ওকে এইরকম করিয়া পড়াইবেন, যেন উচ্চারণটা ভাল হয়; ভূগোল পড়াইবার সময় ম্যাপ দেখান ত? না হইলে কিন্তু কিছুই মনে থাকিবে না।" এই ধরণের কথাবার্ত্তা এবং গল্পের মধ্য দিয়া মাষ্টারকে তাহার কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া যায়। নিত্য যদি ছেলেদের লইয়া বসিবার সময় নাও থাকে, মাসে একদিন ত মাষ্টারকে লইয়া বসা যায়? সেই একদিন, সেই আধ ঘণ্টাই যথেষ্ট। মাষ্টার যদি বুদ্ধিমান হন, তাহাকে আধ ঘণ্টা ধরিয়া বলিয়া দিলেই, ছেলেদের লইয়া একমাস বসিবার সমান কাজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু মাষ্টারের উপর যিনি মাষ্টারি করিতে যাইবেন, তাহার নিজের মনে ব্যাপারটা স্পষ্ট না থাকিলে চলে না। তাই মায়ের উচিত নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করা, এবং তাহার উত্তরও জানিয়া রাখা। প্রশ্ন তিনটি এই:— "শিশুকে লেখাপড়া শিখিতেই হইবে কেন?" "কি তাহাকে শিখিতে হইবে?" "সেটা সে শিখিবে কি রকম করিয়া?"

শিশুকে লেখাপড়া শিখিতেই হইবে কেন? ইহার উত্তর, শিশুর খাইতে হয় কেন? শরীরকে পুষ্ট করার জন্য। পড়িতেও হয় মনকে পুষ্ট করার জন্য, তাহার বুদ্ধির খোরাক দিবার জন্য। শরীরের বৃদ্ধির জন্য কাজ করার ক্ষমতা পাইবার জন্য খাদ্য ও ব্যায়াম দরকার। জ্ঞান তাহার

খাদ্য, চিন্তা তাহার ব্যায়াম। খাদ্য হজম না হইলে দেহ পুষ্ট হয় না, জ্ঞানও তাই হজম হওয়া চাই। না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে সে বিদ্যা কোন কাজে আসে না, তাই শিশুকে পড়িতে হইবে, যা পড়িল তাহা বুঝিতে হইবে, যা বুঝিল তাহা লইয়া চিন্তা করিয়া হজম করিতে হইবে এবং নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাইতে হইবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কতকগুলি বস্তু বা ব্যাপারের ধারণা (idea) জন্মায়। এই ধারণার রাশি জমিয়া জমিয়া এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার মনেরও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে। নূতন কোন ধারণা বা জ্ঞান যে-পড়ায় না হইল সে পড়া বৃথা।

মনে সঞ্চিত ধারণাগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া, ঢালিয়া সাজাইয়া আমরা চিন্তা করি ; সেই চিন্তার ফলে নূতন ধারণার উৎপত্তি হয়। হঠাৎ একটা নূতন ধারণার কথা মনে খেলিয়া যায়, তারপর চিন্তা করিয়া, অন্যের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে কথা জোড়া দিয়া সেইটাকে সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ করিয়া তুলি ; এই হইল জ্ঞানের জন্ম-কথা। জ্ঞানবৃক্ষের এই যে নূতন শাখা গজানো, এইটার জন্যই দরকার মন ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার। শিশুকাল হইতে এটার চর্চ্চা না করিলে বাড়ে না।

ধারণা যখন বাস্তব প্রমাণের জোরে সত্য হইয়া উঠে, তখন তাহার নাম জ্ঞান। সেই জ্ঞান আহরণ করিতে হয় অন্যের ভাণ্ডার হইতে পড়িয়া, কিংবা বাস্তব জীবন হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া।

শিশুকে পড়াইবার উদ্দেশ্য, তাহার মনে নূতন নূতন ধারণা ও জ্ঞান যোগাইয়া দেওয়া, যেন তাহার মন বাড়িতে পারে, বুদ্ধি বাড়িতে পারে। যে জ্ঞান এইভাবে তাহার মনের খোরাক হইবে তাহা যাহাতে পুষ্টিকর হয়, সত্যই কাজের জিনিস হয়, সেদিকে দৃষ্টি না দিলে চলে না। আর একটা কথা, শিশুর মনের আয়তন ছোট, আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা কম,

সেই কথা মনে রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাহা বোঝা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইবে না, বা যতখানি বিদ্যা একসঙ্গে সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া লাভ নাই। তাহাতে মনেরও বদহজম হয়।

মাষ্টার মহাশয়েরা অনেক সময় একটি কাণ্ড করেন। এক ছটাক জ্ঞানকে একমণ বাজে বকুনিতে গুলিয়া ছাত্রের সামনে ধরিয়া দেন। সেই বাজে কথার সমুদ্র মন্থন করিয়া তবেই তাহাকে সার বস্তুটির সন্ধান করিতে হইবে। সেটা তাহার সাধ্যের অতীত। অথচ এইটা করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। শিশুকে পরিষ্কার সহজ ভাষায় কাজের কথাটি বলিতে হইবে; অযথা বাক্যের ফেনা দিয়া তাহাকে দিশাহারা করিলে তাহার ক্ষতিই হয়। একসঙ্গে বেশী জিনিস তাহার মনে ধরে না; তাই তাহাকে যেটুকু দিবেন, সেটুকু যেন সত্যই কাজের জিনিস হয়, তাহার মন ও জ্ঞানকে বাড়াইবার সাহায্য করিতে পারে। শিশু নিজে কিন্তু সহজ কাজের কথাই পছন্দ করে, তাহাই বলে। সে যেখানে আবোলতাবোল বকে. সেখানে বুঝিতে হইবে সেই বকুনি তাহাকে কেহ শিখাইয়াছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বা তাহাকে শুনাইয়া তাহার বড়রা এই সব বাজে কথা ছড়াইয়াছে, সে শুনিয়া শিখিয়াছে। শিশুর পক্ষে এটা ক্ষতিকর। কারণ কথার কোন্‌টুকু কাজের এবং কোন্‌টুকু বাজে, তাহা বিচার করিতে সে পারে না।

আজকালকার শিশুপাঠ্য বইগুলিতে এই দোষ দেখা দিতেছে। এক সময় শিশুদের বই ছিল নীরস কাজের কথার ভর্ত্তি; তখন লোকের ধারণা ছিল, শিশুর মনে রস রহস্য বোধ নাই, তাহারা খালি খুঁটিনাটি মুখস্থ করিতেই পারে। তারপর আসিল সেই ধারণার বিপরীত প্রতিক্রিয়া; এখন শিশুদের অঙ্ক বইকেও আমরা ছবি দিয়া সরল ভাষা ও

দৃষ্টান্ত দিয়া প্রায় গল্পের বই করিয়া তুলিয়াছি। শেখার বস্তু কিন্তু সেই একই আছে, শুধু তাহার সহিত মিশিয়াছে অজস্র রঙীন বাক্য ও ছবির মেলা; সেই মেলা সরাইয়া তাহাকে আসল বস্তুর সন্ধান পাইতে হয়। ফলে শিশুর খাটুনি বাড়িয়াছে; তলার বস্তুর সন্ধান না পাইয়া ফেনার স্রোতেই তাহার ভাসিয়া বেড়াইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। গল্পের বই প্রকৃত গল্পের বইই হউক; কিন্তু অঙ্কের বই গল্পের বই না হইয়া উঠিলেই শিশুর পক্ষে ভাল।

শিশুরা কি পড়িবে এই প্রশ্নেরও উত্তর উপরের কথাতেই দেওয়া হইয়াছে। দেখা গেল, শিশুদের পাঠ্য এমন হইবে যেন তাহা তাহাদের মনের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য হয়; মনের মধ্যে যেটুকু চিন্তার ও কল্পনার শক্তি আছে তাহার ব্যায়াম করাইতে পারে; নূতন নূতন ধারণা তাহাদেরে দিতে পারে; এবং তাহা যেন এমন মূল্যবান, নির্ভুল ও চিন্তাকর্ষক বস্তু হয় যাহা তাহারা বড় হইয়াও কাজে লাগাইতে পারিবে, স্মরণ করিয়া আনন্দ পাইবে।

এই সঙ্গে, পূর্ব্বের অধ্যায়গুলিতে যাহা বলিয়াছি তাহারও পুনরাবৃত্তি করিব; কারণ এই সকল একত্রে মিলিয়াই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে।

(ক) শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান তাহাই যাহা সে খোলা জায়গায় নিজের চক্ষু কর্ণ দিয়া আহরণ করিয়াছে।

(খ) শিশুকে খেলার, ব্যায়ামের ও নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া জ্ঞান আহরণের জন্য প্রত্যহ অনেকখানি সময় দিতে হইবে; স্কুলে পড়ার চাপে এই সময়কে ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবে না।

(গ) সম্ভব হইলে তাহাকে প্রত্যহ খোলা প্রাকৃতিক দৃশ্যে—মাঠ, বিল, জঙ্গল, পাহাড়ের ধার, সমুদ্রের তীর ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া

যাইতে হইবে ; এবং স্বাভাবিক সকল বস্তুর—ফুল, গাছ, পাখী, জন্তু ও পাহাড়ের দিকে তাহার দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করিয়া দিতে হইবে, যেন তাহাদের সম্বন্ধে সে সত্যকার জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাইতে পারে।

(ঘ) প্রত্যহ তাহাকে স্বাস্থ্যকর শ্রমসাধ্য খেলা খেলিতে হইবে। শরীর ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য পড়া যতটা দরকার, খেলাও ঠিক ততটাই দরকার।

(ঙ) শিশুর উপরে দৃষ্টি রাখিবেন ঠিকই, তবু তাহাকে অনেকখানি নিজের ইচ্ছায় চলিবার, দেখিবার, শিখিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে, যেন সে আপন গতিতে আপনি বাড়িতে পারে। অভিভাবক যেন তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধে বাধা না দেন, অথবা প্রকৃতির রাজ্য হইতে জ্ঞান আহরণ করিবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করেন।

(চ) শিশুর দেহ-মন বাড়িতে পারে তখনই যখন কাজে সে আনন্দ পায়। তাহার পাঠ্য এমন হওয়া চাই যাহাতে সে আনন্দ পায় ; তাহাকে যিনি পড়াইবেন তিনিও যেন তাহার প্রিয় হন। তাহাকে দেখিয়াই যদি তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠে, তবে তাহার দেওয়া পাঠ কখনই তাহার মনে লাগিবে না।

২। কিণ্ডারগার্টেন

সাধারণ স্কুলের তুলনায় কিণ্ডারগার্টেন স্কুল শিশুদের পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী ; কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক নিজে শিক্ষা, রুচি, মনস্তত্বের জ্ঞান, শিশুদের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি নানাগুণের অধিকারী হইলে তবেই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা সম্ভব ও ফলপ্রসূ হয়। কিণ্ডারগার্টেনের

মূল নীতি হইল, শিশুকে বইয়ের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া, শিক্ষক তাহার ব্যক্তিগত সাহচর্যের দ্বারা বাস্তব বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়া তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। তাই শিক্ষক নিজে যদি প্রাণ-খোলা লোক না হন, তবে কিণ্ডারগার্টেনও একেবারেই প্রাণহীন ও ফাঁকি হইয়া দাঁড়ায়। আর, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকের মধ্যে যে গুণ ও উৎসাহ আমরা দেখিতে চাই, সেগুলি সমস্তই মায়ের মধ্যে থাকে; মা নিজে শিশুর দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে সেটা কিণ্ডারগার্টেনের চেয়েও ভাল জিনিস হয়।

কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেদের কি শিখানো হয়? নিজের বুদ্ধি দিয়া নিজে সকল জিনিষ বুঝিয়া নিতে শিখানো হয়। শিশুর যতটুকু বুঝিবার ক্ষমতা ঠিক সেই অনুপাতে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার যেটুকু ক্ষমতা তাহার বেশী বোঝা সে বহিতে পারিবে না; আবার, ক্ষমতার চেয়ে কম কাজ দিলে তাহার সমস্ত মনের খোরাক মিলিবে না; যতটা সম্ভব ছিল, ততটা বাড়িবার সে সুযোগ পাইবে না। এই জন্যই পড়া স্থির করার আগে তাহার ক্ষমতাটা মাপিয়া স্থির করা হয়। যে কাজ সে পারে, তাই সে করিবে; কিন্তু যেটা করিবে সেটা নিখুঁত হওয়া চাই। আমি একবার একটি চার বছরের শিশুকে দেখিয়াছিলাম; একটা কাগজ ভাঁজ করা তাহার ঠিক হয় নাই বলিয়া সে এমনই গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, যেন সে একটা মস্ত বড় মিথ্যা কথা বলিয়া ধরা পড়িয়াছে।

এই শিক্ষা কি বাড়ীতে আরও ভাল করিয়া দেওয়া যায় না? কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেদের উপর জুলুম জবরদস্তি করা হয় না। তাহারা খেলার ছন্দে কাজ করে, এবং তাই সমস্ত কাজের মধ্যে আনন্দ পায়। খেলার মধ্যে যে চোর হইতে চাহিল না, শিক্ষক তাহাকে বকেন না,

তবু হাত ধরিয়া তাহাকে মাঠের বাহিরে লইয়া যাইবেন। তাহার খেলায় ইচ্ছা নাই? বেশ, সে না-ই খেলিল। পরদিন আর সেই ছেলে চোর হইতে আপত্তি করে না।

মোটের উপর বলা যায়, কিণ্ডারগার্টেনে যা যা শিখানো হয় তাহার খানিকটা স্বভাবতই মায়ের কর্তব্যের অঙ্গ। বাকিটুকুও আয়ত্ত করা কঠিন নয়, যদি মা সত্যই শিশুকে মনের মত করিয়া মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান। মাহিনা-করা পেশাদার মাষ্টার ভাল লোক বা যোগ্য লোক হইতে পারেন; কিন্তু মায়ের সমান তিনি হইবেন কি করিয়া?

একটা কথা যেন আমরা না ভুলি, শিশুর মন বড় জটিল বস্তু। বাহিরে সে হাসে, খেলে— চমৎকার সরল, সুস্থ মন; কিন্তু মনের মধ্যে তাহার কি আছে সে রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন। ভেদ করিতে পারিলে দেখা যাইত, বাহিরের লঘুতা, সারল্য, তাহার বাহিরেরই রূপ। তাহার তলায় তাহার যে গভীর মন আছে, তাহা গাম্ভীর্য্যে, বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে, দৃঢ়তায়, বড়দের চেয়েও বড় বই ছোট নয়। ইহার বড় কারণ, শিশুদের মনে একটা সহজাত শুভবুদ্ধি থাকে। সত্যপ্রিয়তা ও তথ্যপ্রিয়তা থাকে। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনে পরিবর্তন আসে, তাই সেই সহজ শক্তি বড়দের মনে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

টলষ্টয় একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঠাকুরমার জন্মতিথি, খোকা সেই উপলক্ষে একটা কবিতা লিখিয়াছে। লেখার সময় স্বাভাবিক উৎসাহ বশে অনেক বড় বড় কথাই সে লিখিয়াছে; কিন্তু তারপর যখন সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে, তখন লজ্জায় তাহার মাথা নুইয়া আসে। কবিতাটি শুনিবামাত্রই ত সকলে ধরিয়া ফেলিবে, তাহার মধ্যে অত্যুক্তি ভরা। ঠাকুরমাকে সে ভালবাসে, ভক্তি করে,

ঠিকই ; তবু যতটা লিখিয়াছে ততটা ত করে না ! তবে কেন সে এমন সব কথা লিখিল ! কেন মিথ্যা কথা বলিল ! এইসব ভাবিয়া তাহার মনে গ্লানির আর অন্ত থাকে না। একটু ভাবিয়া দেখুন, মনে পড়িবে এমন ঘটনা আপনার আমার জীবনেও ঘটিয়াছে। শিশুকালে আমাদের মনে এমনই একটা সত্যের চেতনা থাকে। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা অন্তর্হিত হইতে থাকে।

শিশু তাহার মনে অনেক কিছুই ভাবে, অনেক কিছুই জানে, কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও বলে না। কলরব সকলের সঙ্গেই সে করে, তবু মন খুলিয়া সকল কথা কাহাকেও বলে না ; মাকে পর্য্যন্ত না। অথচ সত্যই তাহাকে চালাইতে হইলে, তাহার বন্ধু ও সঙ্গী হইতে হইলে, তাহার মনের রহস্য জানিতে হইবে। এবং একমাত্র মা-ই তবুও কতকটা তাহা পারেন। অন্য লোক পারিবে কেন ? মা'র কাছে যে কথা সে বলিল না, তাহা কি বলিবে মাষ্টার মহাশয়কে ?

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা ফ্রোবেল্ এই কথাটা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। ফ্রোবেল্ বুঝিয়াছিলেন শিশুকে শুধু বাহির হইতে পাঠ-পরিবেশন করিলে হইবে না ; তাহার মনের মধ্যে ঢুকিতে হইবে, যেন সে শিক্ষককে নিজের বন্ধু বলিয়া তাহার উপরে নির্ভর করিতে পারে। শিক্ষককে কিছু পরিমাণে তাহার মায়ের স্থান নিতে হইবে।

শিশুর মধ্যে একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। খালি পরের হাতে যে ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে সেই গঠন-কর্ত্তার অনেকখানি ছাপ পড়িতে বাধ্য। কিণ্ডারগার্টেনে এই বিপদ থাকে ; কারণ সেখানে সকলকে একটা বাঁধা পদ্ধতি মানিয়া চলিতে হয়। সেই পদ্ধতি সাধারণ ভাবে সকলের জন্য রচিত ;

ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অবসর রাখিয়া রচিত নয়, এবং আমার মনে হয় এই সাধারণ পদ্ধতি বজায় রাখিতে যাইয়া অনেক সময় শিশুর ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করা হয়। তাহার বুদ্ধি যতখানি তাহার উপযুক্ত খোরাক হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা হয়। শিক্ষককে একসঙ্গে অনেকের ভার লইতে হয়; কত জনকে তিনি অখণ্ড অভিনিবেশ দিয়া দেখিতে পারেন? কিন্তু মা একজনেরই মা, তাহার অভিনিবেশ বিক্ষিপ্ত করার কেহ নাই।

শিশু ছোট বলিয়াই তাহার বুদ্ধি কম এমন মনে করার কারণ নাই। একটা ঘটনা জানি—এক ভদ্রলোক এক বাড়ীতে গেলেন। বসিবার ঘরে খালি একটি খোকা আছে, তাহার বয়স তিন বছর। ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা বলিতে সুরু করিলেন। খুব হাত-পা নাড়িয়া তাহাকে ভ্যা-ভ্যা ডাকিয়া পাঁঠার বাচ্চার কথা শুনাইতেছেন। খোকা দুই ড্যাব্‌ডেবে চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "পাঁঠা বলি দেখতে নেই, বিচ্ছিরি।" পাঁঠা বলির কথা ভদ্রলোক বলেন নাই; কিন্তু তিনি গল্প সুরু করিয়াছেন; হয়ত সে কথাটাও বলিবেন, এবং বলিলে খোকার ভাল লাগিবে না, তাই খোকা আগে হইতেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল।

বালি-সুগ্রীব বা মোগল-পাঠানের যুদ্ধ শিশুরা খুব উৎসাহ সহকারে অভিনয় করে; তিন চার বছরের শিশুরা পর্য্যন্ত মহাবিক্রমে এই খেলায় যোগ দেয়। মাসের পর মাস এই খেলা তাহারা খেলিতে পারে, মহা উৎসাহে লাফায়, ঝাঁপায়, চীৎকার করে। তবু মনে মনে ইহাতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে কিনা সে কথা কে বুঝিবে? মা যদি না বোঝেন, মাষ্টার মশায়ের তা বোঝা সাধ্য নয়, আর বুঝিলেও তাঁহার উপায় নাই, তাঁহারও ত রুটিন বাঁধা! অনেকে বলেন, কেন, কিণ্ডার-

গার্টেন স্কুলে ত ছেলেরা মহা আনন্দে হৈচৈ করিয়া থাকে, দেখিতে পাই। হৈ-চৈ তাহারা করে হয়ত, কিন্তু 'মহাআনন্দ' তাহারা সত্যই পায় কিনা বলা শক্ত। শিশুরা যাহাকে পছন্দ করে তাহার খাতিরে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। হৈ-চৈটা আনন্দের প্রকাশ না হইয়া শিক্ষককে খুসী করার জন্য, প্রবোধ দেওয়ার জন্যও হইতে পারে।

শিক্ষক অনেক সময় একটা ভুল করেন। সাধারণ শিক্ষকের তুলনায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক অনেকবেশী উৎসাহী; এই উৎসাহের আতিশয্যে হয়ত তিনি বড় বড় কবিতা ও গান রচনা করিয়া শিশুদের শিখাইতে লাগিলেন; ভাল ভাল গল্প বলিয়া, ছবির পর ছবি আঁকিয়া, তাহাদের আনন্দ বাড়াইতে লাগিলেন। শিশু এক সময়ে এই আতিশয্যের চাপে হাঁপাইয়া উঠিবে; শিক্ষকই সারাক্ষণ তাহার সময় জুড়িয়া বসিয়া আছেন, তাহাকে স্বচ্ছন্দে বাড়িবার অবসর দিতেছেন না।

অবশ্য, শিশুদের উপরে শিক্ষকের 'প্রভাব' থাকা দরকার। কিন্তু এই প্রভাব অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেলে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে; শিশুর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। মোটের উপর বলা যায় কিণ্ডারগার্টেন প্রথা আবিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ ও সুবিধার সৃষ্টি করে নাই, ঘরের বাহিরেই শিশুর প্রকৃত বাড়িবার জায়গা, একথাটা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া।

৩। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির দোষ

ঘরের বাহিরেই শিশুর প্রকৃত বাড়িবার জায়গা, এই কথাটা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিটা নীতি হিসাবে খুবই ভাল কাজ করিয়াছিল; কিন্তু সেই নীতিকে কাজে খাটাইতে গিয়া অনেক ভুল হইল। ঘরের বাহিরেই যদি বড় হইতে হয়, তবে শিশু মুক্ত পৃথিবীর কোলে স্বচ্ছন্দ, অব্যাহত গতিতেই বড় হোক; সেখানেও তাহাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিতে চাহিলে হইবে কেন? সেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার ফলেই কিণ্ডারগার্টেন হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রকৃতির কোলে বিচরণ ও বাঁধা রুটিনের একটা জগাখিচুড়ী—ঘরের মধ্যের বাঁধা রুটিনকে আনিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে; ফলে, সেই শিক্ষাই পঙ্গু হইয়া পড়িতে চলিয়াছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিশু প্রকৃতির কোলে বর্দ্ধিত গাছ নয়, তাহার জন্ম ও বৃদ্ধি কৃত্রিম আলোভরা কাচের ঘরে। সে রুটিন-ধরা সময়ে গজায়; তাহার কোথাও বিশৃঙ্খল শাখা বা শিকড় নাই; বাঁধা সময়ে তাহার ফুল ধরে, ফল হয়। সে-ফল দেখিতে সুন্দর ও নিখুঁত হইতে পারে, স্বাভাবিক ফলের মধুর স্বাদ তাহাতে আশা করা বৃথা।

ছেলেকে খেলা দিতে পারেন মা। সে নিজের মনেই খেলিবে; মার মুখের প্রতিটি রেখা, আনন্দ, ক্ষোভ, দুঃখের প্রতিটি অভিব্যক্তি, নকল করিয়া শিখিবে। তারপর যেমন সে বড় হইতে থাকিবে, মা একটু একটু করিয়া নূতন জিনিষ তাহার সামনে ধরিয়া দিবেন, যেন সে শিখিতে পারে। তবু অবশ্য মায়ের এই অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার স্নায়ুর উপর একটু বেশী চাপ পড়ে। মায়ের সকল ভঙ্গি ত তাহার আয়ত্ত হইবার কথা নয়। সেই চাপ অতিরিক্ত হইয়া তাহার মনকে ক্লান্ত না করিয়া ফেলে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এবার দেখা যাক, কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে শিশুর অবস্থা কি হয়। সেখানে তাহার সঙ্গে 'বড়' কেহ নাই, যাহাকে সে অনুকরণ করিতে পারে। শিক্ষক আছেন, কিন্তু তিনি ঠিক তাহার 'খেলার সাথী' নন। খেলার সাথী তাহারই সমান সব শিশুরা।

সমান বয়সীর দল যেখানে একত্র জোটে, সেইখানে হৈচৈ কলরবের মাত্রা ঠিক থাকে না। কুড়ি বছরের তরুণরাই সময়ে থামিতে পারে না, তা ছয় সাত বছরের শিশুরা! কাজেই এই সারাক্ষণ উত্তেজনার ফলে তাহারা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সমান বয়সীর সঙ্গ আমাদের দরকার, সেই সঙ্গ পাইলে হঠাৎ আমাদের মন ও চেতনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু সারাক্ষণ শুধু সেই সঙ্গ লইয়াই থাকা যায় না। যে আমার সমকক্ষ নয়, তার সঙ্গও আমার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন মনের প্রতিযোগিতা ও তুলনার দ্বারা নিজের মনে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য। সেই বৈচিত্র্য গৃহেই পাওয়া যায়। স্কুলে শিশু সে বৈচিত্র্য পায় না। এই জন্যই দেখা যায় চিরকাল স্কুলে যে শিশু বড় হইয়াছে তাহার তুলনায়, যে শিশু বাড়ীতে বড় হইয়াছে সে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, মনের, সরসতায় অনেক বেশী দীপ্ত। স্কুলে মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বাধা পায়। শিশু নিজের ইচ্ছায় বৃদ্ধি পাইবে। অন্যের ইচ্ছামত তাহাকে গড়িতে গেলে তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিতে পারে না। সে শুধু চায় একজন অভিভাবক, যিনি তাহার পাশে থাকিবেন, প্রয়োজনমত তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবেন, কোন্‌টা কি বস্তু, কোন্‌টা দিয়া কি হয় তাহাকে বলিয়া দিবেন।

এইখানেই বিপদ বাধে। কর্ম্মব্যস্ত মা বলেন, আমার অনেক কাজ, সারাক্ষণ শিশুকে সামলাইবার, তাহার হাজার কথার জবাব দিবার, সময় কোথায় আমার? বাড়ীতে আজকাল আমি নজর দিতে পারিব না,

কুঅভ্যাস কুসঙ্গে অমানুষ হইয়া যাইবে। তার চেয়ে সে স্কুলেই থাক্‌, সেখানেই ভাল থাকিবে।

অথচ এ কথার কোন অর্থই হয় না। শিশুকে সামলাইতে সত্যই অনেকখানি সময় লাগে না। তাহাদের খেলাধূলা, তাহাদের আনন্দকর, তাহারা নিজেরাই ব্যবস্থা করিয়া নেয়। পিতামাতার পক্ষে যেটুকু নজর রাখা নিতান্ত আবশ্যক, তাহার পরিমাণ খুব বেশী নয়। আর নিজের সন্তানের ভার নিজে লইতে পারি না, অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিব, এটাই বা কেমন কথা? বস্তুত পিতামাতাকে খুব বেশী কাজ এদিকে করিতে হয় না। শিশুর মন উন্মুখ হইয়াই আছে। তাঁহারা শুধু বীজ বপন করিবেন। তারপর সেই বীজকে বাড়াইয়া ফুলফল শিশু নিজে হইতেই ধরাইবে।

একদিক হইতে বলা যায়, ধনীর তুলনায় দরিদ্রের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ বেশী পায়; কারণ তাহাদের বাধ্য হইয়াই ঘর-সংসারের অনেক কাজ শিখিতে হয়। কথাটা সত্য; তবু সবখানি সত্য নয়। ধনী পিতামাতা যতখানি সুযোগ সুবিধা শিশুর হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, দরিদ্র পিতামাতার তাহা সাধ্যের বাহিরে। অর্থাভাবে, সুযোগের অভাবে, কত তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশুর মন যে বাড়িতে পায় না, অকালে রুদ্ধগতি হইয়া শুকাইয়া যায়, তাহার হিসাব কে রাখে?

ওদিকে আবার ধনীর শিশুর অতিরিক্ত আদরে 'নন্দদুলাল' হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকে। দরিদ্রের শিশু যখন পড়িতে বসে, তখন সে পড়িতেই বসে। সে জানে তাহার না পড়িলে চলিবে না। ধনীর শিশু যখন পড়িতে বসে, তখন অনেক সময় পড়ার পরিশ্রমে সে ব্যথিত হইতেছে বলিয়া আত্মীয়েরা ব্যস্ত হইয়া উঠেন; বইএর সঙ্গে সঙ্গে 'জ্যাম্‌' ও 'চকোলেট্‌' আসিয়া তাহার হাতে পৌঁছায়। জ্যাম্‌ ও চকোলেট্‌ই

সারা হয়, বই সারা হয় না। এটা অন্যায়। শিশুর মন নিজের আগ্রহেই পড়া শিখিবে, পড়ার মধ্যেই তাহার জন্য প্রচুর আনন্দ রহিয়াছে। পড়াকে লোভনীয় করিবার জন্য জ্যামের সাহায্য লইতে হইবে কেন? ইহাতে প্রকারান্তরে শিশুকে পড়িতে নিষেধই করা হয়—সে বুঝিয়া নেয়, বইটা আসলে নীরস বস্তু, না হইলে জ্যাম্‌টা আসিত না।

বাড়ীতে কয়েকটি শিশু থাকিলে তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্যে বাড়িতে পারে; কিন্তু বাড়ীতে যদি একটি মাত্র শিশু থাকে, তবে? তাহার ত খেলার সঙ্গী কেহ নাই। তাহার পক্ষে কি বাড়ীর তুলনায় স্কুলই ভাল নয়, যেখানে সে সঙ্গী পাইবে, আনন্দে থাকিবে? স্কুলে সে হয়ত ভাল থাকিতে পারে; কিন্তু থাকিবেই যে, এমন কোন কথা নাই। সঙ্গী না থাকা খারাপ; কিন্তু অতিরিক্ত সঙ্গী থাকাও ভাল নয়। সঙ্গীর সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ার দোষ কি তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই তাহার চেয়ে যদি বাড়ীতেই তাহার একটি দুটি সঙ্গী জুটাইয়া দেওয়া যায়—প্রতিবেশীর শিশু বা অল্প বয়সী নার্স—তবে সেটাই ভাল। সঙ্গীর দরকার অবসর সময়ের জন্য। পড়া ও খেলার অনেকটাই সে একা করিতে পারে, করিতে চায়। নিজের খুসীতেই সে পড়া করুক, সেইটাই তাহার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। স্কুলে পড়া ও খেলা দুইটাই পরের ইচ্ছায় করিতে হয়।

আসল কথা নিজের দায়িত্ব নিজে লইতে, নিজের কর্ম্মপদ্ধতি নিজে স্থির করিতে আমরা সকলেই চাই। ওটা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব, শিশুরও সে-স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় না। বাড়ীতে সেই ব্যবস্থা থাকায় স্বাধীনতাও শিশুর বেশী থাকে।

৪। 'পড়া'

বইএর শিক্ষার আরম্ভ হয় পড়া দিয়া। শিশুকে পড়িতে শিখানো হইবে কি ভাবে? সে কি অতি শিশুকাল হইতেই একটু একটু করিয়া শিখিতে থাকিবে? না শৈশবের প্রথম বছর-পাঁচছয়েক বাদ দিয়া, পাঁচ ছয় বছর বয়সে একেবারেই সে পড়িতে শিখিবে?

এ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কথা বলা শক্ত। দুইটা রীতিরই স্বপক্ষে যুক্তি আছে। মায়েরা নিজেরা লক্ষ্য করিলেই বলিতে পারিবেন, কোন্‌টায় তাহারা ভাল ফল পাইতেছেন। সকল শিশু দুইটা রীতিতে এক প্রকার ফল দেখায় না।

অনেক সময় পিতামাতাও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না, শিশু ঠিক কি উপায়ে পড়িতে শিখিল। হয়ত সে খবরের কাগজ, দাদা বা দিদির বই, হ্যাণ্ডবিল বা দোকানের সাইনবোর্ড দেখিয়াই প্রথম অক্ষর চিনিয়াছে—কবে কোথায় চিনিয়াছে সে নিজেও জানে না।

অক্ষরের প্রাণ তাহার উচ্চারণ। প্রথমে উচ্চারণ জানিলে অক্ষরটাকে তাহার সহিত মিলাইয়া সহজেই মনে রাখা যায়। উচ্চারণ শিশু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শেখে। তখন একটু একটু করিয়া তাহাকে মুখে মুখে অক্ষরগুলার উচ্চারণ শিখাইয়া দিলে, পরে বড় হইয়া অক্ষরের রূপ চিনিতে আর তাহার কষ্ট হয় না। অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাটা অক্ষরের আকারের যে খেলনা পাওয়া যায় সেইগুলি খুব কাজ দেয়। শিশু এক একটা অক্ষর হাতে লইয়া তাহার সহিত একটা পরিচিত বস্তুর নাম একত্র করিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলে—অ—অজগর, আ—আনারস। ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও ছড়া মুখস্থ করার প্রবৃত্তি শিশুদের মধ্যে খুব বেশী। "অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে"—এই শ্রেণীর কবিতা

তাহারা সহজেই মুখস্থ করিতে পারে এবং অক্ষর পরিচয়ের ইহাতে সুবিধা হয়।

অক্ষর-খেল্‌না দিবার পর তাহাদের অক্ষরের আকৃতি আরও ভাল করিয়া চিনাইতে হইবে। বিভিন্ন অক্ষরের বিশেষত্ব ও সম্পর্ক দেখাইয়া দিলে সহজেই শিশু শিখিয়া নেয়। একটা তিনকোণা অক্ষর 'ব'। তাহার একটা শুঁড় গজাইলে 'ক'। শুঁড়টা কাঁধে তুলিলে 'ধ'। 'ব' এর নীচে একটা পুঁটুলি দিলে 'র'। 'ব' এর হাতে একটা লাঠি দিলে 'ঝ'। এইভাবে চিনাইয়া দিলে আর শিশু সে অক্ষর ভোলে না। অক্ষর চেনার পর তাহাকে দুই বা বেশী অক্ষর একত্র করিয়া 'কথা' বানাইতে শিখান। অক্ষরের তবু মজা কম। কিন্তু কয়েকটা অক্ষর একত্র করিলেই জল, বরফ, ঘর, হইয়া যাইতেছে; বাবা, দাদা, মা, হইয়া যাইতেছে; শিশুর পক্ষে এমন মজার খেলা আর নাই। প্রথম যে দিন সে নিজের ইচ্ছামত 'দিদি'কে শ্লেইটে লিখিয়া ফেলিতে পারে, দিদির উপর এমন 'জয়' কি আর আছে!

ইংরেজী ভাষার একটা সুবিধা, শুধু অক্ষর পর পর সাজাইয়া গেলেই কথা হয়। বাঙলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সংযোগে বানান বলার হাঙ্গামা আছে। একবার শিখিলে কিন্তু ভারতীয় ভাষার সুবিধা আছে; ইংরেজীতে একই বানানের বিভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে, ভারতীয় ভাষায় বানান চিনিলেই উচ্চারণ করা যায়।

প্রথমে অতি সহজ কথা দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। অপরিচিত কথার চেয়ে পরিচিত কথা বানাইতে শিশু বেশী আনন্দ পায়। 'চানা'র চেয়ে 'দাদা' বানাইতে, 'নিধি'র চেয়ে 'দিদি' ও 'চিনি' বানাইতে তাহার মজা লাগে বেশী। প্রথমে তাহাকে 'অ'-কার প্রধান কথা বানাইতে শিখান জ-ল, ক-ল, ন-র, ম-ল। তারপর অক্ষর বাড়ান; জল-দ, কল-ম,

নয়-ম, মল-ম। তারপর ক্রমে অন্য স্বর আসুন ; জাল, কাল, ফুল, নলিনী, কাপড়, মহিষ। ইহার পর শিখান যুক্ত ব্যঞ্জন—বাক্য, মন্দ। পড়িতে শিখাইবার পরই তাহাকে নির্ভুল বানান লক্ষ্য করিতে শিখাইবেন। বানান লক্ষ্য করিয়া যে-শিশু পড়ে, কথাটি বানাইতে পরপর কি কি অক্ষর লাগে তাহা সে দেখিয়া রাখে। তাহার উচ্চারণ ভুল হয় না। উচ্চারণে আগের অক্ষর পরে, পরের অক্ষর আগে আসে না ; কথাটা লিখিতেও তাহার ভুল হয় না। অক্ষর লক্ষ্য করিতে শেখা শক্ত নয়, শিখাইলেই সে শিখিবে।

শিক্ষক মনে রাখিবেন, অক্ষর দেখিয়া যখন শিশু পড়িতে শিখিতেছে তখন প্রধানতঃ অক্ষরের আকৃতি তাহার চক্ষে যাহা পড়িল সেই স্মৃতির উপরেই সে নির্ভর করিতেছে। সেই স্মৃতিতে বেশী ভার সয় না। তাই তাহাকে অল্প অল্প করিয়া পড়িতে শিখাইবেন। একসঙ্গে অনেক চাপ তাহার উপর চাপাইলে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তারপর সমস্ত গুলাইয়া ফেলিবে।

প্রথমে কবিতা দিয়া পড়া আরম্ভ করা ভাল। কবিতা সুর ও ধ্বনির টানে মুখস্থ হইয়া যায়। অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় না। অর্থ শেখার শিশুর সময় হয় নাই ; অক্ষর ও তাহার ধ্বনি চেনাই এখন তাহার কাজ। অর্থ না বুঝিলে গদ্য পড়া যায় না, তাই গদ্য পড়া শক্ত। প্রথমে কবিতা পড়াইয়া আরম্ভ করুন, তারপর ধীরে তাহাকে গদ্য পড়িতে দিন। সেই গদ্যেরও প্রথমে সে শুধু উচ্চারণ পড়িবে। অর্থ শিখিবে আরও পরে।

এই সময়ে একটা কাজ করা যায়। শিশু হয়ত পাঠের কুড়িটা শব্দ শিখিয়াছে ; এখন বইএর একটা পাতা—পদ্য বা গদ্য—তাহার সামনে ধরিয়া তাহাকে বলুন, তোমার জানা কথার কোনটা যদি ইহার মধ্যে থাকে, বাহির কর। সে মহা উৎসাহে খুঁজিতে আরম্ভ করিবে

এবং খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ হয়ত একটা নূতন কথা চিনিয়া ফেলিবে, 'কলম'। তৎক্ষণাৎ তাহার কৌতূহল জাগিয়া উঠিবে— "কলম! কলম কি? যা দিয়ে লেখ তুমি?" "হ্যাঁ, তাই।" খোকা আবিষ্কারের আনন্দে মত্ত হইয়া যায়। সে একটা নূতন কথা শিখিয়াছে। কেহ তাহাকে চিনাইয়া দেয় নাই, বলিয়া দেয় নাই। বইএর মধ্যে ছিল, সে নিজে বাহির করিয়াছে; সে নি—জে!! ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বানান করিতে শিখান, "কলম কি করে হয় জান?" "ক-ল-আর ম।" সে আর ভুলিবে না।

প্রথম হইতেই আর একটি বস্তুর দিকে নজর দিবেন, সেটি বিশুদ্ধ উচ্চারণ। প্রথম হইতে যা-তা করিয়া অস্পষ্ট বা ভুল উচ্চারণ করিয়া গেলে পরে শোধ্রান শক্ত হয়। ইংরেজীতে উচ্চারণের এক বিপদ আছে। কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ বানান অনুসারে হয় না। H-i-g-h 'হিঘ্' নহে, 'হাই'। "এবারে বলত S-i-g-h কি হইবে? N-i-g-h-t?" উচ্চারণ শক্ত হইলে শিশু ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। তাড়াতাড়ি জড়াইয়া পড়িয়া বা নিম্নস্বরে পড়িয়া, বা সেইটুকু বাদ দিয়া পড়িয়া এড়াইয়া যাইতে চায়। এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজন নাই। পড়া "আগাইতেছে" না বলিয়া দুঃখ নাই। শুধু দ্রুতগতির তাড়ায় ভুল শিখিয়া গেলে আসলে কিছুই শেখা হইবে না, এবং উচ্চারণের ভুল জমিয়া গেলে পরে আর সারিতে চায় না। পড়ার গতি মন্থর হউক, ক্ষতি নাই। শিশু যেটুকু শিখিবে সেটুকু যেন নির্ভুল করিয়াই শেখে।

সাধারণতঃ স্কুলের পড়া করিতে গিয়া শিশু কি করে ভাবিয়া দেখিয়াছেন? মাষ্টার একপৃষ্ঠা পড়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটা কথা সে জানে না, উচ্চারণ করিতে পারে না। ক্লাশে তাহাকে মাষ্টার

পড়িতে বলিলেন। সে চিবাইয়া চিবাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। অজানা শব্দের কাছে আসিয়া যা খুসী একটা উচ্চারণ করিয়া জায়গাটা পার হইয়া গেল। মাষ্টার হয়ত লক্ষ্য করিলেন, শুদ্ধ উচ্চারণটা বলিলেন, H-i-g-h 'হিঘ্' নয়, 'হাই'। শিশু একবার কথাটা সেইভাবে উচ্চারণ করিল, তাহার সেদিনকার কাজ হইয়া গেল। কিন্তু কথাটাকে মনে রাখিতে সে চেষ্টা করিল না। পরদিন তাহার কিছু মনে থাকিবে না, মাষ্টার-মশাই কি বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সেদিনটায় শুধু পরিশ্রমই হইয়াছে, কিন্তু নূতন শব্দটা শেখা হয় নাই; অথচ একটু লক্ষ্য করিয়া কেহ শিখাইয়া দিলে শেখাও হইত, শ্রমও হইত না। মাষ্টার-মশাই বড়জোর তাহাকে কুড়িবার সেই কথাটা বলাইয়া ছাড়িবেন, বলিতে বলিতে সেই উচ্চারণটা মুখস্থ হইয়া যাইবে, কিন্তু শুধু মুখস্থই, মনস্থ নয়। ইহার ফলে ক্লান্তি যতটা হয় জ্ঞানলাভ ততটা হয় না এবং শেষপর্য্যন্ত পড়া ব্যাপারটার উপরেই তাহার একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়, বই দেখিলেই তাহার গায়ে জ্বর আসে।

৫। অক্ষরের রূপ ও ধ্বনি

আমরা অক্ষরের ধ্বনি শুনিয়া মুখস্থ করি; তাহার রূপ দেখিয়া মুখস্থ করি। কোন একটা বিশেষ আকৃতি আঁকিলে তাহার একটা বিশেষ উচ্চারণ কেন হইবে, ইহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নাই। তিন-কোণা অক্ষরের উচ্চারণ 'ব'। ইহার শুঁড় গজাইলে সেটাকে বলিব 'ক', এবং নীচে পুঁটুলি দিলে বলিব 'র'। কেন বলিব তাহা কেহ

জানে না; অক্ষরের রূপ ও তার ধ্বনিকে একেবারেই গায়ের জোরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শব্দের আকৃতির ব্যুৎপত্তির সহিত যদি উচ্চারণের সম্পর্কও থাকে সেটার খবর শিশু জানে না, সেটা পণ্ডিতদেরই জানা থাকিবার কথা।

অক্ষরের রূপ ও উচ্চারণের সম্পর্ক বুঝিতে শিশু পারে না, তাহাকে চক্ষু বুজিয়া ওটাকে শুধু মুখস্থ করিতেই হয়। এবং এই জন্যই পড়িতে শেখাটা কঠিন কাজ। একবার চিনিয়া শিখিয়া নিলে তারপর অবশ্য কাঠিন্যটা কমিয়া আসে; ক্রমে অভ্যাসে সমস্তই সহজ হইয়া যায়।

প্রথম পড়িতে শিখিবার সময় তাহাকে এক-একটা অক্ষর ধরিয়া শিখাইতে হইবে; যে অক্ষরটা সে চিনিল, বইএর পাতা খুলিয়া সে খুঁজিয়া বাহির করুক, কোথায় কোথায় সেটা আছে। তারপর চিনুক, প্রায় এক আকৃতির অন্য যে অক্ষর আছে তাহার সহিত সেটার প্রভেদ কোথায়। 'ব' আর 'র' কোন্‌টা কি? 'ক', 'থ', আর 'ঋ'-এর তফাৎ কি?

ইহার পর সে কয়েকটি অক্ষর সাজাইয়া একটি কথা বানাইতে শিখিবে। 'গ' আর 'র' আর 'ম'—পরপর বসাইয়া হইল 'গরম'। "গরম কি?" "দুধ গরম হইলে লাফায়, গরম চেনো না?" "ও, সেই গরম, চিনিয়াছি।" "আচ্ছা, এবার দেখ—কথাটা সাজানো আছে, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর আছে। দেখা হইয়াছে?" এবার অক্ষরগুলি ওলট্-পালট্ করিয়া দিন। এখন সে আবার অক্ষরগুলি সাজাইয়া কথাটা বানাক। "ম-গ-র"—হইল না! আবার, "গ-ম-র"—উঁহু! তারপর আসিল-'গ-র-ম'; এবার হইয়াছে 'গরম', কেমন? খোকা পারিয়াছে। ইহার পর আর এক ধাপ আগে যান। 'গরম'—'গ'-টা সরাইয়া দিন বা মুছিয়া ফেলুন। কি আছে?

'গ-রম' হইতে 'গ' গেল? রহিল শুধু 'রম'। আচ্ছা, এবার কি হইলে 'নরম' হয়? "নরম, নরম, 'ন'-রম"! খোকাকে বেশী ভাবিতেও হয় না। সাহায্য প্রায় দরকারই হইবে না। একান্ত যদি হয়, একটু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। এইভাবে করিয়া চলুন—পরম, শরম, চরম। তারপর আবার গরল, গরজ, গরব। এইভাবে একটা জানা কথাকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি অজানা কথা শেখা হয়। এবারে দু'টা কথা একত্র করুন, 'গরম' আর 'জল'। কি হইল? 'গরম জল'। "কাহাকে বলে জান?" "হ্যাঁ"। আরও একটু "গরম জল খাও?" খাইবে না? তবে আচ্ছা, "গরম দুধ খাও?" খোকা রাজি আছে, এবং ইহার পর যখন বোনটি দুধ খাইতে চাহিবে না, সে মহা বিক্রম করিয়া এই কথাটা বানাইয়া তাহার সামনে ধরিবে। ঐ একটা আঁচড়ের মধ্যে তাহাকে একটা আস্ত কথাই বলা হইতেছে। বোনটি না বুঝিলে কি হয়? যে কথা বলিয়া থাকি তাহা লিখিয়া ফেলার মত আনন্দ আর আছে? সেই আনন্দের দেখা সে পাইয়াছে। আর সে শিখিতে আপত্তি করিবে কি? তখন তাহাকে থামানোই দায়!

৬। 'আবৃত্তি'

আবৃত্তি করার প্রবৃত্তি শিশুর মজ্জাগত। যাহা সে শোনে, যাহা সে দেখে, আবৃত্তি করিতে চায়। এই প্রবৃত্তিটাকে উৎসাহ দিলে ইহার মধ্য দিয়া তাহার আরও কতকগুলি ক্ষমতা বিকাশ পায়। আবৃত্তির মধ্য দিয়া শিশু কথাটার অর্থ এবং ভাবও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ফলে সেই ভাব ও অর্থ লইয়া সে নিজেও চিন্তা করিতে বাধ্য হয়, এবং কথার যথা-

বথ অভিব্যক্তি দিবার ক্ষমতাটাও তাহার জাগিয়া উঠে; উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর ত স্পষ্ট হয়ই। ওই কথাটা অনেকে স্বীকার করিতে চান না। বলেন, "অর্থ না আরও কিছু! ওরা হইল তোতাপাখী, যেমনটি শোনে মুখস্থ করিয়া রাখে।" কিন্তু তাহা হইতে দিবেন কেন? শিক্ষক তাহাকে শুধু কথাটা শিখাইবেন, আবৃত্তির ধরন শিখাইবেন না। সেটা সে নিজে বুদ্ধি করিয়া বাহির করুক। দেখিবেন, সে নিজেই অভিব্যক্তি দিবে। কথাটা সে নিজে বলিলে যে রকম বলিত, সেইভাবেই বলিবে। তখন দেখিবেন তাহার মধ্যে অনেকখানি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা লুকাইয়া ছিল। সেই ক্ষমতাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই তাহাকে আবৃত্তি শেখানো। আবৃত্তি করা এবং মুখস্থ করা এক বস্তু নয়। তবু ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আবৃত্তি করার ঝোঁকে, উচ্চারণ ও সুরের তালে, অতি সহজে বড় বড় কথা মুখস্থ হইয়া যায়—বিশেষ করিয়া কবিতা। মুখস্থ করায় স্মৃতি-শক্তিরও ব্যায়াম হয়, স্মৃতি প্রখর হয়। এইজন্যই মুখস্থের অভ্যাস করানো দরকার, এবং সেইজন্যও আবৃত্তির অভ্যাস করানো দরকার। মুখস্থ করিবার একটা সহজ উপায় আমার এক পরিচিতা মহিলার কাছে শিখিয়াছিলাম। তাঁহার একটি ভাইঝি তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। আমাকে তিনি বলিলেন, "আমি ভাইঝিকে চেষ্টা করিয়া মুখস্থ করিতে দিই না। এক সময়ে একটা কবিতা তাহাকে নিজে পড়িয়া শুনাই। পরদিন সে হয়ত পুতুলের জামা সেলাই করিতে ব্যস্ত, তাহাকে আবার সেটা পড়িয়া শুনাই। এইভাবে পাঁচ-ছয়বার শুনিবার পরই কবিতাটা তাহার মুখস্থ হইয়া যায়; সে নিজেও টের পায় না, কখন মুখস্থ হইল।" এই পন্থাটা আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ফলও পাইয়াছি। আর একটি মহিলার কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি অসুখ হইতে উঠিয়াছেন, তখনও দুর্বল, শয্যাশায়ী। এই সময়ে সময় কাটাইবার

জন্য একদিন 'Lycidas' কবিতাটা পড়িলেন। পরদিন দেখিলেন, কবিতাটার স্থানে স্থানে অনেকখানি করিয়া কথা তাঁহার মনে জাগিতেছে। তারপর তিনি কবিতাটা গোড়া হইতে মনে করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন দেখা গেল, অত বড় কথাটা তাঁহার আগাগোড়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—এই প্রকার পড়াতেই। নিজের মুখস্থ করার শক্তিটা অকস্মাৎ এইভাবে বাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। শক্তিটা সত্যই কিনা দেখিবার জন্য তিনি 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' পড়িতে বসিলেন। পড়া সারিয়া দেখিলেন, অদ্ভুত কাণ্ড। গোটা 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' খানাই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—একবার পড়িয়াই। তাহার পর তিনি আরও বই পড়িতে এবং মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন; সুযোগটার সদ্ব্যবহার করিয়া লইলেন। যতদিন তাঁহার অসুখ রহিল, তিনি চমৎকার মুখস্থ করিতে লাগিলেন। তারপর তাহার শরীর সুস্থ হইল, আবার নানা কাজ, নানা চিন্তা তাঁহার মনকে দখল করিয়া রহিল, মুখস্থ করার ক্ষমতাটাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য্য বা অলৌকিক নহে। অসুখের সময় তাহার মনে চিন্তা নাই, মন একেবারে খালি। সে তখন যাহাই পাইয়াছে তাহাই ব্যগ্র হইয়া গিলিয়াছে। আবার যখন অন্য চিন্তা, অন্য কাজ আসিয়াছে, তখন সেই অখণ্ড মনোযোগের অভাব ঘটিয়াছে। শিশুদের মন চিন্তার ভারাক্রান্ত থাকে না। তাই তাহারা অতি সহজে মুখস্থ করিতে পারে। বড় হইয়া সেই ক্ষমতাটা হারাইয়া যায়। সময় থাকিতে ভাল ভাল জিনিষ মুখস্থ করাইয়া দিলে সেগুলি সারা জীবনের সম্পদ হইয়া থাকিবে। শৈশবের মুখস্থ কথা বড় হইয়াও আমরা ভুলি না।

৭। 'বড়' ছেলেমেয়েদের পড়া

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে একটা দোষ আমরা করি। রুটিন-মাফিক পাঠ-অভ্যাস করিতে তাহাদেরে আমরা যতটা শিখাই, নিজের মনের গরজে ভাল ভাল বই পড়িতে মোটেই ততটা শিখাই না। অথচ বই পড়ার অভ্যাসটা শিশুকাল হইতেই করা দরকার। পড়িতে শিখিবার পরই তাহাকে যথাসাধ্য বই পড়িতে দিতে হইবে। গল্প, রূপকথা, ইতিহাস, যাহা ইচ্ছা তাহাকে নিজে নিজে পড়িতে হইবে। আর একজন পড়িয়া তাহাকে গল্প বলিবে, এই ভরসায় যেন সে না থাকে। যাহা তাহার জানিবার ইচ্ছা, নিজে পড়িয়া যেন শেখে। আর একটা কথা তাহার মনে রাখিতে হইবে, একবার পড়িয়াই সেই কথা অন্যকে বলা চাই। তাহা হইলেই লক্ষ্য করিয়া মন দিয়া পড়ার অভ্যাস আসিবে। যেমন তেমন করিয়া চক্ষু বুলাইয়া গেলাম, কথা প্রায় কিছুই মাথায় ঢুকিল না—এটাকে পড়া বলে না। এবং মনোযোগ না দিয়া ভাসা ভাসা পড়িবার অভ্যাস একবার করিলে পরে নিবিষ্ট মনে পড়াই শক্ত হইয়া উঠে। যাহাই পড়িবে, মন দিয়া পড়িতে হইবে—এটা যেন তাহার খেয়াল থাকে। জোরে চেঁচাইয়া পড়া—বিশেষতঃ স্কুলের পড়ার বই চেঁচাইয়া পড়ার অভ্যাস করা উচিত। ইহাতে উচ্চারণ স্পষ্ট হয় এবং অর্থ বোধের জন্য যেখানে যতটুকু জোর দেওয়ার প্রয়োজন সেটা দিতে হয়, এবং তাই বলিয়াই অর্থ-বোধ সহজ হয়। এই পড়ার মধ্যে কবিতার অংশ বেশী থাকা ভাল। তাহাতে শব্দের মাধুর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে, সুন্দর কথাটা যে সুন্দর করিয়া বলিতেও হয়, এই চেতনাটা আসিবে।

এটা একপ্রকার নেশা, এই নেশা যাহার থাকে সে কখনও ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ করিয়া পড়ে না।

শিক্ষক সাবধান হইবেন, তিনি ছাত্রকে পড়ার "সুর" দেখাইয়া দিবেন না। শিক্ষক দেখাইয়া দিলে ছাত্র আর ভালমন্দ বিচার করিবে না, সরাসরি তাহার অনুকরণ করিবে। কিন্তু তাহাকে ত অনুকরণ করিতে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে, সে কবিতাটা বা প্রবন্ধটা পড়িয়া যা বুঝিল, সেইটাই তাহার গলার সুরে ও উচ্চারণে প্রকাশ করিবে। লেখক কি বলিতে চাহিয়াছেন সেইটাই তাহাকে বুঝিতে হইবে, লেখকের যে উদ্দেশ্য তাহার মনে ধরা পড়িল, সেইটাই সে স্বরে ও উচ্চারণে প্রকাশ করিবে। ইহা করিতে হইলে, অর্থ না বুঝিয়া পড়িয়া যাওয়ার ফাঁকি আর সে দিতে পারিবে না। শিক্ষক দেখাইয়া দিলে সেই ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়। নিজের যেটা পড়িয়া ভাল লাগিল সেটা অন্যকে পড়িয়া শুনাইবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া যাহারা বয়সে ছোট, তাহাদেরে শুনাইতেই বেশী ইচ্ছা হয়, কারণ তাহাদেরে শুনাইবার মধ্যে একটা বুঝাইবার আনন্দ থাকে। এইজন্য কিশোর বয়সের ছেলে মেয়েরা তাহাদের ছোটদের বই পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসে। জিনিষটা ভাল; বুঝাইবার আগ্রহে তাহাদের নিজেদের বোঝা সম্পূর্ণ হয়, এবং এইভাবে পড়িয়া শোনানোর মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা মানসিক বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। কিন্তু তবুও এই অভ্যাস বেশী চালানো ভাল নয়। ছোটদের কেবলই পড়িয়া শোনাইলে ক্রমে তাহারা অলস হইয়া পড়িবে, হাত গুটাইয়া পরের হাতে খাইবার মত পরের মুখেই গল্প শুনিতে চাহিবে; নিজে কষ্ট করিয়া পড়িতে চাহিবে না। অথচ তাহাদের পড়িতে শেখা দরকার, দাদার আনন্দের খাতিরে ভাইটির শিক্ষা কাঁচা রাখা চলে না। অতএব দাদারা দিদিরা যদি ছোটদেরে বই পড়িয়াই শুনাইতে

চায়, সেটা সর্ব্বদা করা চলিবে না ; মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণই যেন সেটা করা হয়। পড়িবার সময় একথাটার অর্থ কি, ও-শব্দটার মানে কি, জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলে মেয়েদেরে বিরক্ত করা অন্যায়। পড়ার সময় আমাদের মন একাগ্র হইয়া দ্রুতগতিতে বইএর যুক্তি ও কাহিনীর সঙ্গে ছুটিতে থাকে। তখন ঘনঘন অকারণে দন্ত্য-ন না মূর্দ্ধন্য-ণ বলিয়া বাধা পাইলে বড়দেরই মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, পড়ার আনন্দে বাধা পড়ে, বইএর যুক্তিও মনে ঢোকে না। বড়দেরই যখন এটা হয়, শিশুদের ত হইবেই।

প্রত্যেকটা কথার অর্থ যদি সে না-ই জানে, কিছু আসে যায় না। শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহার অভিধানে মেলে না, বাক্যের মধ্যে তাহার ব্যবহার দেখিয়া জানিয়া লইতে হয়। পড়িতে পড়িতে যদি একটি অজানা শব্দ তাহার চক্ষে পড়ে, সমস্ত বাক্যের যুক্তি দেখিয়া সে-শব্দটির অর্থও শিশু নিজেই আন্দাজ করিয়া লইবে। একবারে না পারুক, তিনবারে পারিবে। তারপর যদি অভিধান দেখা দরকার মনে করে, সে নিজেই দেখিবে। যে শিশু মন দিয়া পড়ে, কথা বুঝিতে চায়, একটা অজানা শব্দকে সে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায় না ; তাহার অর্থ না জানা পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্তই হইবে না। জানিবার জন্য অভিধান ঘাঁটা বা জিজ্ঞাসা করা যা দরকার সে নিজের গরজেই করিবে, সেইজন্য বড়দের উতলা হওয়ার দরকার নাই। পড়ার পরে কি পড়িল সে গল্প তাহাকে বলিতে বলুন, তাহার নিজের ভাষাতেই বলিতে দিন। গল্পটা বলিতে বলুন, 'এটা কি হইল' 'ওটা কেন হইল' বলিয়া কাটাকাটা প্রশ্ন দিয়া তাহাকে খোঁচাইবেন না। যাহা পড়িয়াছি বা জানিয়াছি তাহা সকলকে বলিতে আমরা স্বভাবতই চাই। কিন্তু পরীক্ষা দিতে আমাদের একটা স্বভাবগত বিমুখতাও থাকে।

অবশ্য যে পর্য্যন্ত সে গল্পটি পাইয়াছে তাহার বাহিরে তাহার চিন্তাকে

চালাইবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করা যায়, "এই অবস্থায় তুমি কি করিতে?" "অমুক এইটা না করিয়া আর কি করিতে পারিত?" এরকম প্রশ্নে শিশু বিরক্ত হয় না, বরং আনন্দ পায়। ইহাতে তাহার চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়।

শিশুদের পাঠ্যপুস্তক লইয়া দু'একটা কথা বলা দরকার। বাজারে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় তাহার অনেক বই-ই পাঠ্যপুস্তক নামের অযোগ্য। শিশুরা বাজে বকুনি পছন্দ করে না, সোজা ভাষায় কাজের কথা জানিতে চায়। অথচ লেখকেরা অনেক সময় বই লেখেন, সেই বই বাজে জঞ্জালে ভর্তি, অথবা হয়ত এমনি কঠিন ভাষায় রচিত যে তাহার মধ্যে শিশু প্রবেশ করিতেই চায় না, করিতে পারে না। শিশুরা বড়দের মতই সহজে যুক্তি ও তর্ক ধরিতে পারে, কিন্তু অনাবশ্যক খুঁটিনাটিতে তাহাদের মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রথম যে বই লইয়া সে পড়িতে বসিবে, সেই বইই অনেকাংশে তাহাকে পড়ার আনন্দের সন্ধান দিবে। এই জন্যই শিশুদের প্রথম পড়ার বই খুব যত্নে বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। সে বইতে যেন সত্যকার সুন্দর ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা থাকে; সেই বই-ই যেন শিশুকে বলিয়া দেয়, জ্ঞানবস্তুটা কি রকম চিত্তাকর্ষক, পড়া ব্যাপারটাই কত বেশী মজার। বই পড়িয়া যে শিশু একবার আনন্দ পায়, সে জীবনে আর কখনো পড়ার প্রতি বিমুখ হইবে না; স্কুলে বা শিক্ষকের হাতে যথেষ্ট বাধা পাইলেও সে সমস্ত বাধাই কাটাইয়া পড়ার অভ্যাস বজায় রাখিবে।

একবার পড়িয়াই জিনিষটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত, এই কথা আগেই বলিয়াছি। ইহাতে মনোনিবেশ করিয়া পড়ার অভ্যাস জন্মে। একবার যদি অর্থবোধ না হয়, তবে আর একবার পড়ুক, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এটা তাহার অক্ষমতা। কথাটা শিশুকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে বকিবার আবশ্যক নাই। সে একবার পড়িয়া

আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়া মা দুঃখিত হইয়াছেন, এই দুঃখটা তাহার স্বচক্ষে দেখিলেই তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়া যাইবে, আর সে ফাঁকি দিবে না।

একবার পড়িয়া আয়ত্ত করিতে বেশ গভীর মনোযোগ দরকার। বই লইয়া শিশু যদি ঝিমায়, তবে বই আয়ত্ত হইবে না। এইজন্যই ঝিমানোর অভ্যাস ছাড়াইতে হইবে। তাহাকে এক সঙ্গে অনেকক্ষণ বা অনেকখানি পড়িতে দিবেন না। যতটুকু সময় তাহার মস্তিষ্ক পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে পারে, যতটুকু বস্তুই সে একবারে বিনাকষ্টে আয়ত্ত করিতে পারে; সেইটুকু করাই যথেষ্ট, তাহার উপর বোঝা চাপাইলে ফলে আসিবে ক্লান্তি। বুদ্ধি বস্তুটা ক্ষুরের মত ধারালো, কিন্তু সেটা দিয়া মাটি কোপানো যায় না।

স্পষ্ট ও পরিষ্কার উচ্চারণ যাহাতে শিশু করে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। মৃদু কণ্ঠস্বর অনেক সময়ে স্বর-যন্ত্র বা বুকের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক; নাকিস্বরে যে পড়ে, সম্ভবত তাহার নাসিকাযন্ত্রে অসুখ আছে। এ সকল ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানো দরকার; সত্যই যদি এরূপ কোন পীড়া থাকে, তবে তাহার চিকিৎসা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। তাড়াতাড়ি করিয়া যা-তা উচ্চারণে পড়িয়া গেলে চলিবে না।

আরও একটি বড় ব্যাপার, প্রাদেশিক উচ্চারণ ও জিহ্বায় প্রাদেশিক জড়তা। সকল জায়গায় প্রাদেশিক উচ্চারণ সমান নয়। এই উচ্চারণ ক্রমে স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায়; পরে আর শোধরানো যায় না। বাঙ্‌লা দেশেরই বিভিন্ন জিলার অধিবাসীর উচ্চারণ বিভিন্ন। ইঁহারা সাধুভাষা পড়িবার সময়, এমন কি ইংরেজীর মত বিদেশী ভাষা পড়িবার বা বলিবার সময়ও, প্রাদেশিক উচ্চারণ তাহার মধ্যে ঢুকিয়া কথাকে বিকৃত করিয়া তোলে। এই অভ্যাস যাহাতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা

দরকার, এবং সে দৃষ্টি দেওয়ার সময় শিশুকাল। কারণ তখনও প্রাদেশিক বিকৃত উচ্চারণ শিশুর অভ্যস্ত হয় নাই। শুদ্ধ উচ্চারণ শেখার আগ্রহ সকল শিশুরই থাকে, তাই এই সময়ে অল্প আয়াসে তাহাকে শিখানো যায়।

৮। বর্ণনা দেওয়া

যাহা দেখিল বা পড়িল তাহার বর্ণনা দিবার প্রবৃত্তি শিশুর স্বভাবগত। ইহা তাহাকে শিখাইতে হয় না, তাহার মধ্যেই শক্তি আছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে মাত্র। 'বল ত!' বলিলেই শিশু বলিতে আরম্ভ করিবে; সহজ, স্বচ্ছ ভাষায় নির্ভুল খুঁটিনাটি ও বর্ণনা দিয়া বলিয়া যাইবে, 'বাঘা' রাস্তার আর একটা কুকুরকে কি ভয়ানক রকম কামড়াইয়া হারাইয়া দিয়াছে। চমৎকার বর্ণনা দেয় শিশুরা—কিছুই তাহাদের চক্ষু এড়ায় না, কোনখানে তাহারা কথা ছাড়িয়া যায় না, পুনরুক্তিও করে না।

দু'বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে দিয়া জোর করিয়া বলাইবেন না, সে নিজের ইচ্ছাতেই বলুক। যখন সে খুবই ছোট, গুছাইয়া কথাও বলিতে পারে না, হয়ত তখনও সে এইভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করে; আমরাই বরং বুঝিতে পারি না। বড় হইয়াও সে যখন আমাদের কাছে কথা বলে, আমরা কান দিয়া শুনি কি? 'ছেলে মানুষের বকুনি' বলিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই। অথচ একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিলেই দেখা যায় সেটা অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়; এবং আমরা সেই ধৈর্য্যটুকু ধরিলে তবেই

সে উৎসাহ পায়, তাহার মধ্যেকার শক্তিটা জাগিয়া উঠে। ক্ষমতাটা যখন আছে, তখন তাহাকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। শিশুর বর্ণনা করার ক্ষমতাটাকে তাহার পড়া-শেখার কাজেই ব্যবহার করা যায়। তাহাকে গল্প বলুন, তারপর সেই গল্প সে আবার আপনাকে বলিবে। আর একটু বড় যখন হইবে—যখন পড়িতে পারে না কিন্তু পড়িয়া শোনাইলে বুঝিতে পারে—তখন তাহাকে বই পড়িয়া শোনান, তারপর তাহাকে বলুন গল্পটা বলিতে। আট-নয় বছর বয়স হইলে শুধু গল্প ছাড়া অন্য বিষয়ও সে এইভাবে ধরিতে পারিবে।

আরও বড় হইয়া যখন সে নিজে নিজে পড়িতে শিখিল, তখন তাহাকে বলুন, বই খুলিয়া নিজে পড়িবে, তারপর তাহার ছোটদেরে সেই গল্প বলিবে। দেখিবেন কি ভয়ানক উৎসাহ সহকারে সে তাহাদের গল্প শোনাইতে বসে; তাহার বর্ণনায় এতটুকু ত্রুটি হইবে না, খুঁটিনাটি একটি কথাও সে বাদ দিবে না।

যে বই তাহাকে পড়িতে দিবেন তাহা যেন তাহার যোগ্য হয়। বইয়ের ভাষা সরল ও নির্ভুল হইবে, বিষয়বস্তু মনোজ্ঞ হইবে, যুক্তি সরল হইবে; তাহা না হইলে সে খুসী হইবে না, তাহার পড়িতে ভাল লাগিবে না। পড়ায় মন না লাগার ফলে কি পড়িল তাহা মনে ঢুকিবে না।

৯। হাতের লেখা

অক্ষর পরিচয়ের শেষ কথা লেখা, লিখিতে যে পারে তাহার আর ভুল হয় না। লেখা অভ্যাস করার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন প্রতিটি রেখা নির্ভুল হয়, যেমন তেমন করিয়া হিজিবিজি লেখা যেন না হয়।

প্রথমে তাহাকে গোটা গোটা করিয়া অক্ষরগুলা লিখিতে শিখাইবেন, ছাপার হরফের মত। অনাবশ্যক বাহার-তোলা অক্ষর, বা কায়দা করিয়া আঁকা-বাঁকা অক্ষর যেন সে না লেখে। ছাপার অক্ষর পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারিলে তারপর তাহাকে একটানা লিখিতে দিবেন, আগে নয়। ইংরেজী লেখায় প্রথমে বড় হাত-এর অক্ষর, তারপর 'ছোট হাত'-এর অক্ষর শিখিবে।

কপিবুক ব্যবহার করা ভাল; কিন্তু সেই কপিবুকে যেন দোষ না থাকে, দেখিয়া বাছিয়া দিবেন। তাড়াতাড়ি করিয়া একদিনে বত্রিশ-পাতা লেখাইলে লেখা কদর্য্য হইবেই। আস্তে আস্তেই সে লিখুক, কিন্তু প্রত্যেক বারের লেখা যেন আগের বারের চেয়ে ভাল হয়। হাত ক্লান্ত হইয়া গেলে তখন আর লিখিবে না, তাহাতে লেখা খারাপ হইয়া যায়।

১০। নকল করা

একটানা লেখা অভ্যাস করার জন্য শিশুদের চিঠি লিখিতে বা শ্রুতলিপি লিখিতে অনেকে দেন। ইহাতে বিশেষ কাজ হয় না; তাহার চেয়ে বরং কোন বই হইতে খানিকটা নকল করিতে দেওয়া ভাল। হাতের লেখার জন্য তাহার সমস্ত মনোযোগ লেখার সৌন্দর্য্যের দিকে দিতে হইবে; সে সময় চিঠি-রচনার বা শুনিয়া কথা-ধরার অতিরিক্ত পরিশ্রমটা তাহার ঘাড়ে চাপাইলে তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইবে; হাতের লেখার যতটা উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব ছিল তাহা হইবে না।

নকল করার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বস্তুর অভ্যাস হইয়া যায়,

সেটি নির্ভুল বানান। শিশু বই-এর দিকে চাহিয়া দেখিবে, তারপর চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া মন হইতে বানানটা লিখিবে, এইভাবে বানান মুখস্থ হইয়া যাইবে। নকল করার কাজটাকে ভাল লাগাইবার চমৎকার উপায় শিশুকে তাহার প্রিয় কবিতা প্রভৃতি নকল করিতে দেওয়া। তাহাকে খুব সুন্দর একটি খাতা কিনিয়া দিন, তাহার মধ্যে যে সব কবিতা প্রভৃতি তাহার ভাল লাগে, তাই সে টুকিয়া রাখিবে। এই খাতাটায় একটু ময়লা, একটু কাটাকুটি থাকিলেই তাহার খুব খারাপ লাগিবে; অতএব সে প্রাণপণ যত্ন করিয়া সুন্দর করিয়া কবিতা টুকিবে। ইহাতে হাতের লেখা ভাল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বিনা আয়াসে তাহার একটি ভাল সাহিত্য-চয়নও হইয়া যাইবে। লেখার সময় কি রকম ভঙ্গিতে সে বসিল, তাহার উপর শিশুর স্বাস্থ্য ও লেখার সৌন্দর্য্য অনেকটাই নির্ভর করে।

এমনভাবে বসিতে হইবে যেন খাতাটা বেশ সুবিধামত উঁচুতে থাকে, বেশী ঝুঁকিয়া বা বেশী খাড়া হইয়া লিখিতে না হয়। খাতার উপরে আলো পড়িবে বাম দিক হইতে। খাতায় লিখিবার সময় ডান দিক হইতে আলো আসিলে লিখিবার স্থানটিতে ছায়া পড়ে। সাধারণতঃ আমরা অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কলম ধরিয়া লিখি। ইহাতে হাতে বেশী জোর পড়ে, হাতে ব্যথা ধরিয়া যায়। তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া কলম ধরিলে এটা হয় না। শিশুকে এটা অভ্যাস করাইয়া দিলে ভাল হয়। কলম থাকিবে তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে, অঙ্গুষ্ঠ দিয়া সেটাকে চাপিয়া রাখিতে হইবে। নিবের কাছাকাছি জায়গায় কলম ধরিলে হাতে কম জোর পড়ে, কিন্তু আঙ্গুলে যেন কালি না লাগে। হাতটার ভর কাগজের উপর থাকিবে। বাঁ হাত দিয়া কাগজের উপর ভর রাখা চলে, তাহাতে কাগজটাও নড়ে না। পিঠ না বাঁকাইয়া মাথা

ঝুঁকাইয়া লেখা ভাল। কলম উপুড় করিয়া লিখিতে হইবে। ছেলেরা অনেক সময়ই নিব একপাশে কাত করিয়া ধরে; ফলে লেখাও ভাল হয় না, নিব হইতে ছড়্‌ছড়্‌ করিয়া কালি ছিটিয়া খাতাখানাও যেন কাক-পদ-চিহ্নিত হইয়া যায়। লিখিবার ডেস্কের সামনের দিকটা একটু ঢালু হওয়া অনেকে পছন্দ করেন।

ছোট ছেলেদের ডেস্কে একটা ব্যবস্থা করা যায়। ডেস্কের উপরের তক্তাটা দুইখণ্ড হইবে, মাঝখানে কব্জা দিয়া আঁটা থাকিবে, তাহার তলায় বইখাতা রাখিবার একটি খোপ থাকিবে, এই খোপে শিশু তাহার বইখাতা, পেন্সিল গুছাইয়া রাখিবে। ইহাতে পড়িতে বসার সময় তাহার বইখাতা এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় টানাটানি করিতে হয় না; বইখাতাও বেশ সুন্দর গুছানো থাকে।

১১। শ্রুতলিপি ও বানান

স্কুলে ছেলেদেরে যে সব কাজ করানো হয় তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে শ্রুতলিপি লেখানো।

মাষ্টার মশাই একটা বই খুলিয়া খানিকটা পড়িয়া যান, এক একটা বাক্যাংশ তিনবার, চারবার করিয়া বলেন। ছেলেরা শুনিয়া লেখে এবং অসংখ্য বানান ভুল করে। মাষ্টার মশাই খাতা দেখেন, ভুলগুলির নীচে পেন্সিল বা লালকালির দাগ দেন; তারপর আবার ছেলেরা সেই ভুল সারিয়া নেয়। মাষ্টার মশাই বোর্ডে শুদ্ধ বানানগুলি লিখিয়া দেন; ছেলেরা তাই দেখিয়া দেখিয়া খাতায় লিখিয়া নেয়; বা হাত

বদলাইয়া, এ ওর খাতা নিয়া তাহার ভুল সারিয়া দেয়। অনেক সময় মাষ্টার মশাই ভুল কথাটার শুদ্ধ বানানটা চারবার পাঁচবার করিয়া লিখিতে দেন, যাহাতে বানানটা ছাত্রের মুখস্থ হয়। ছেলে লেখে, পরদিন আবার সেই ভুল করে, এবং মাষ্টার, "এটার মাথায় একদম গোবর পোরা", বলিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া যান। অথচ দোষ ছেলের নয়, মাষ্টার মশায়ের। পাঁচবার শুদ্ধ বানানটা লেখার পরও যে ছাত্রের মনে থাকে না, তাহার জন্য দায়ী তিনি; ভুল বানানটাকে তাহার মাথার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন তিনিই।

বানান আমরা শিখি চক্ষুর সাহায্যে। বইয়ে যে কথাটা দেখি, চক্ষু দিয়া তাহার একটা ফটোগ্রাফ তুলিয়া মাথার মধ্যে জিয়াইয়া রাখি; সেই ফটোগ্রাফ হইতে সেটাকে আবার কাগজে লিখি। শিশু একটা লেখা দেখে, সেটার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তারপর অন্যদিকে চাহিয়া বা চক্ষু বুজিয়া তাহার চেহারাটা মনে করিতে চেষ্টা করে, এবং এইভাবে তাহার রূপটা তাহার মুখস্থ হইয়া যায়।

এখন এই মুখস্থ করার মধ্যে যদি একবার কোথাও খট্‌কা লাগে, সে খটকা জীবনভোর জাগিয়া থাকে। শ্রুতলিপি লেখার সময় শিশু কি করে? একটা কথা শুনিল, তাহার চেহারা সে কখনও চোখে দেখে নাই। বুদ্ধি খাটাইয়া একটা চেহারা সে খাড়া করিল এবং সেইটা লিখিল। মাষ্টার মশাই তাহার পাশে আবার আর একটা চেহারা লিখিয়া দিলেন। এই দুইটা ছবি তাহার মনে পাশাপাশি জাগিয়া থাকে, কিছুতেই একটা আর একটাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। তাহার মনেও আজীবন খট্‌কা থাকে—ওটা 'ভুল', না 'ভূল'? 'চশ্‌মা', না 'চস্‌মা'? এই ধরণের যত বানানের খট্‌কা আমাদের মনে থাকে তাহার সকলের মূলে ঐ এক কারণ,—একটা বানানকে শুদ্ধ করিয়া

কোন দিন আর একটা বানান শিখিয়াছি ; এখন কোন্‌টা শুদ্ধ, কোন্‌টা ভুল, সেই সন্দেহই যাইতেছে না। ভুল বানানে মাথার মধ্যে যে ছবিটা আঁকা হয়, শুদ্ধ বানানটা বলিয়া দিলেই সেটা ঢাকা পড়ে না। বরং ভুলটা যদি শিশু নিজে মাথা খাটাইয়া বাহির করিয়া থাকে এবং শুদ্ধটা যদি শিশুর মাষ্টার মশাই বলিয়া দেন, তবে ভুলটাই তাহার মনে জাগিবে বেশী ; কারণ সেটার পিছনে তাহার যাহা হউক একটা যুক্তি ছিল, চেষ্টা ছিল।

কাজেই মাষ্টার মশাইএর প্রধান কাজ হইবে, ভুল বানান শিশুর চক্ষেই পড়িতে না দেওয়া ; এবং যদিই বা পড়ে, তৎক্ষণাৎ সেটা এমন-ভাবে ঢাকিয়া দেওয়া যেন তাহার দিকে সে বারবার চাহিতে না পারে। শ্রুতলিপি যদি লিখাইতেই হয় তবে এইভাবে লেখানো বরং ভাল। শিশুরা বই খুলিয়া একটা জায়গা পড়িবে, সমস্ত কথার বানান লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। তারপর মাষ্টার মশাই বইটা নিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবেন—কোন কথায় কাহারও খট্‌কা আছে কিনা। তিনি নিজেও শক্ত বানানগুলির নাম তাহাদেরে বলিয়া দিতে পারেন। সেইগুলি তিনি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। তারপর জায়গাটা একবার মাত্র পড়িবেন, তাহারা লিখিয়া যাইবে। ইহার ফলে বানান ভুল প্রায় হইবেই না। একান্তই যদি কেহ ভুল করে, সেই ভুল লেখাটার উপরে একটুকরা কাগজ দিয়া জুড়িয়া দিবেন। ডাকটিকিটের শীটের পাশে পাশে বা ষ্ট্যাম্প্‌ কাগজের পাশে যে বর্ডার থাকে সেই ফিতাগুলি এ কাজের খুব উপযোগী। এইভাবে ঢাকিয়া দিলে আর ভুলটা তাহার চোখে পড়িবে না। তারপর তাহাকে শুদ্ধ বানানটা দেখিতে দিন ; ভাল করিয়া দেখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তারপর সে সেই কাগজের টুকরাটার উপরে বানানটা লিখুক। ভুলটার তলায় পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া বা লাল

কালির দাগ দিয়া পাশে শুদ্ধ বানানটা লিখিয়া লাভ নাই। অনেক সময় ভুলটাকে শিশু পেন্সিল ঘষিয়া একেবারে ঢাকিয়া দিতে চায়—কি ভুল করিয়াছে তাহা কাহারও চোখে না পড়িবার জন্য। মাষ্টার তাহাকে বাধা দেন, "ভুল করিয়া আবার সেটাকে ঢাক, লজ্জা করে না?" অথচ সেটা ঢাকিলেই ভাল হইত। লাল কালির আঁচড়ে ভুল ঢাকা পড়ে না, বরং শিশুর আহত মনে সেইটাই বারবার করিয়া ভাসিয়া উঠে, স্মৃতিতে গাঁথিয়া যায়। মস্তিষ্কের লেখা লালকালি দিয়া কাটিয়া দেওয়া যায় না!

১২। রচনা

শিশুদেরে অকালে রচনা লিখিতে দেওয়া আর একটা কুপ্রথা। ছোট শিশুর কাজ জ্ঞান সঞ্চয় করা। জ্ঞান বিতরণ বা নতূন জ্ঞানের সৃষ্টি সে করিবে আরও বড় হইয়া। তাহার মন কচি, পৃথিবীতে সবে নূতন চক্ষু মেলিয়া সে আশ্চর্য্য সব জিনিষ দেখিতেছে, তাহাদের টুকরা টুকরা ছাপ লইয়া ভাণ্ডারে জমা করিতেছে। এই সময়ে তাহাকে নূতন কথা বলিতে বা 'অনেকখানি সংলগ্ন রচনা' লিখিতে বলিলে সে পারিবে না। ইহাদেরে রচনা লিখিতে দিলে দুই প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, এমন কাজ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে যাহা তাহার অসাধ্য। হয়ত সে লিখিতে পারিবে না মোটেই, না হয় যা হোক ছাইভস্ম খানিকটা লিখিয়া খাড়া করিবে, নিজেও মনে মনে বুঝিবে সেটা কিছু হয় নাই। ইহাতে তাহার আত্মপ্রত্যয় কমিয়া যায়। আর যদি লেখেও, বাধ্য হইয়া সে একরাশ মুখস্থ করা কথা এবং বাঁধা গৎ জোড়াতাড়া দিয়া

একত্র করিয়া রচনা খাড়া করিবে। তাহার ফাঁকি ধরা পড়ুক না পড়ুক, নিজের মনের মধ্যে সে টের পাইতে থাকিবে, পরের কথা পরের বস্তু চুরি করিয়া সে নিজের বলিয়া চালাইতেছে। ইহাতে তাহার বিবেক আহত হয়, নিজের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে এবং ক্রমে রচনা ব্যাপারটাই যে অর্থহীন এমনি একটা ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। একখানা ভাল পাঠ্যবই হইতে 'রচনা শিক্ষার' বিষয় কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দেখাইতেছি।

রচনার বিষয়—ছাতা

প্রথম পাঠ

(প্রথমে নিজে নিজে প্রশ্ন কর)

(১) তুমি কি ?

(২) তোমার নামটা কোথা হইতে আসিল ?

(৩) তোমাকে কে ব্যবহার করে ?

(৪) আগে তুমি কি ছিলে ?

(৫) তখন তোমার চেহারা কি রকম ছিল ?

(৬) তোমাকে কোথায় পাওয়া গেল ?

(৭) কি বস্তু দিয়া তুমি তৈরী ?

(৮) কি কি উপায়ে তোমাকে পাওয়া যায় ?

(৯) তোমার বিভিন্ন অংশ কি কি ?

(১০) তুমি কি আমাদের মত জন্মাও, না মানুষ তোমাকে তৈয়ার করে ?

দ্বিতীয় পাঠ

(এইবার নিজে নিজে উত্তর দাও)

(১) ছাতা।

(২) 'ছত্র' কথাটা হইতে। উহার অর্থ, "যে ঢাকিয়া রাখে।"

(৩) আমাকে সকল মানুষই ব্যবহার করে।

(৪) আগে আমি ছিলাম বাঁশ, কাপড় আর লোহার শিক।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তৃতীয় পাঠ

(এইবার 'আমি' না বলিয়া 'ছাতা' বল)

ছাতা কথাটা 'ছত্র' হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ, 'যে ঢাকিয়া রাখে।' ছাতা মানুষেরা ব্যবহার করে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আট-নয় বছরের শিশুরা এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিবে, ইহা আশা করাই কি জবরদস্তি নয়? ইংল্যাণ্ডে একবার মহা কলরব উঠিল যে, প্রাথমিক স্কুলে নীচের ক্লাশের ছেলেমেয়েদের 'রচনা' অত্যন্ত খারাপ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল রচনা যাঁহারা শিক্ষা দেন, এটা তাহাদেরই ত্রুটিতে ঘটিয়াছে। তখন কোন্ রচনা কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা লইয়া বৃহৎ বৃহৎ বই লেখা আরম্ভ হইয়া গেল। এই সব বইএর লেখকেরা এবং প্রকাশকেরা এই কথাই ভুলিয়া যান যে, বোঝা অকালে চাপাইলে ফল হয় শিশুর মনকে অকালে পিষিয়া মারা, জন্মের মত শিশুমনের সৃজন-ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

সেই সব অনিষ্টকর বিধান ও বিধি লিখিয়া ছাপাইয়া প্রচার করার অর্থই সমাজের ক্ষতি করা। শিশুর দেহে মাষ্টার বেত ছোঁয়াইলে সমস্ত

সভ্য সমাজ শিহরিয়া উঠে— সর্ব্বনাশ! শিশুর দেহ পবিত্র! আর সেই শিশুর মনের উপরে যত খুসী অন্যায় অত্যাচার করা চলে, তাহাতে পাপ হয় না, এইটাই আশ্চর্য্য।

যে বস্তু শিশুর বুদ্ধির এবং ক্ষমতার বাহিরে, তাহা সে করিবে কি করিয়া? "রচনা" তাহাকে জোর করিয়া শিখাইতে হয় না; ক্ষমতা যখন জন্মায়, তখন সে নিজেই করিতে শেখে। গল্প বলার, চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করার, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার আছে, লেখার ক্ষমতা আসিলেই সে সেই কথা মুখে যেমন বলে তেমনি লিখিয়া বলিতে চেষ্টা করিবে এবং লিখিতেও পারিবে। কিন্তু তাহার আগে ত সেই চিন্তার ক্ষমতাটা আসা চাই? সেটা জোর করিয়া আনা যায় না, নিজে হইতেই আসে। সে জন্য তাহাকে সময় দিতে হয়।

'অঙ্ক'

শিশুদেরে যতরকম বিষয় শিখানো হয় তাহার মধ্যে অঙ্কের মতন দরকারী বোধ হয় আর কিছুই নাই। শুধু হিসাব করিতে পারার জন্যই অঙ্কের দরকার নয়। অঙ্ক করিতে যে যুক্তি, তীক্ষ্ণতা, নির্ভুল হিসাব ও ক্ষিপ্রতার চর্চ্চা হয় তাহা চরিত্র গঠনের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আজকাল ভাষা-শিক্ষার দিকে যতটা, অঙ্কের দিকেও প্রায় ততটাই ঝোঁক বিশেষজ্ঞরা দিতেছেন।

অঙ্ক শিশুর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতাকে জাগাইয়া দেয়। যে অঙ্ক করা তাহার শক্তি ও বুদ্ধিতে কুলায়, তাহাই তাহাকে দিতে হইবে। মাষ্টার তাহাকে বেশ একটা বড় অঙ্ক কষিতে দিলেন—৯৫৩৭৮৩৪৬৫ ÷ ৮৭৩ কর ত?

সে আধ ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ করিল। তারপর অঙ্কও 'সারা' হইল এবং সে-ও 'সারা' হইয়া গেল; মাষ্টার শ্লেট দেখিয়া বলিলেন, ঠিক হয় নাই, ফলের শেষ দু'টা রাশি ভুল, ভাগ-শেষটাও ঠিক হয় নাই। তখন সে-অঙ্ক আর একবার কষা শিশুর সাধ্যের বাহিরে। আসলে অঙ্কটা ভুল হইয়াছে, বলাই চলে না; বলা উচিত, প্রায় ঠিক হইয়াছে; অথচ অঙ্কে 'প্রায় ঠিক' বলিয়া কোন কথা হয় না। অঙ্কটা ঠিকমত হইতে হইতে শেষদিকে হঠাৎ ভুল হইয়া গেল কেন? শিশুর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। যতক্ষণ মন শ্রান্ত হয় নাই ততক্ষণ অঙ্কও ভুল হয় নাই। অতএব সত্যই যদি ভুল কাহারও হইয়া থাকে, তবে হইয়াছে মাষ্টারমশায়ের। তাঁহার উচিত ছিল ছোট অঙ্ক দেওয়া।

এই বৃহৎ অঙ্ক কষিবার পরিশ্রম না করাইয়াও তাহাকে অঙ্ক করান যাইতে পারে। "ঘোষেদের বাড়ী থেকে ছয়শ' সাতটা কুল পাঠিয়ে দিয়েছে ইস্কুলে, আর দত্তদের বাড়ী থেকে দিয়েছে আটশো উনিশটা। মোট সাতশ' ছেলে আছে— ক'টা করে এক এক জনের ভাগে পড়বে?" খোকা হিসাব করিতে বসিল, মোট ক'টা কুল হইল তাহাই আগে দেখা হইল। তারপর সেগুলিকে সাতশোটা আলাদা আলাদা ভাগ করিতে হইবে।

কি কি প্রক্রিয়া খাটাইয়া হিসাবটা করিতে হইবে তাহা সে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে তাহার নিজের আবিষ্কৃত বুদ্ধি খাটাইয়া; অঙ্ক করিতে তাহার উৎসাহের অভাব হইবে না, চটপট সে অঙ্কটা করিয়া ফেলিবে। ভুল হয় নাই, কারণ মনোযোগ দিয়াই হিসাবটা করিয়াছে। এমন অঙ্ক শিশুকে দিবেন যেন তাহার সাধ্যে কুলায়, অথচ কষিতে তাহার মনের সবখানি শক্তির দরকার হয়। যে অঙ্কে একটু মাথা খাটাইতে না হয় তাহা কষিয়া শিশু আনন্দ পায় না, লাভও হয় না।

কাগজে কলমে অঙ্কের সংখ্যা ও রাশি লিখিয়া হিসাব করা তাহার পক্ষে কষ্টকর। তাহার চেয়ে জিনিষ দিয়া দেখাইয়া বুঝাইলে সে সহজে ধরিতে পারে। বাস্তব বস্তুর সঙ্গে যোগ না রাখিয়া খালি মুখস্থ অঙ্ক শিখাইলে, তাহার মনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় না। অঙ্ক হয়ত সে কষে এবং ভুলও হয়ত সে করে না; তবু অঙ্কশাস্ত্রের সত্যকার অর্থটারই সন্ধান সে পায় না। সে বিদ্যা তাহার ভাল লাগিবে না, মনে থাকিবে না।

শিশুকে একথলি মার্ব্বেল বা তেঁতুলবিচি বা বোতাম দিন। তাই সাজাইয়া সাজাইয়া সে যোগ, বিয়োগ ও নামতা শিখুক।

দু'য়ে আর দু'য়ে কত? সে তেতুঁলবিচি গণিয়া দেখিল; দু'টা আর দু'টা—এক, দুই, তিন, চার-- চারটা। চার সাতে? সাতবার চার গণিয়া গণিয়া সে মাটিতে সাজাইল— চারটা করিয়া তেঁতুলবিচির সাতটা স্তূপ। তারপর গণিয়া দেখ আটাশ। এই হিসাব করার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তথ্য সে আবিষ্কার করিল— গুণ জিনিষটা আসলে যোগ করাই; অনেকগুলি যোগ একত্র করা।

এইভাবে বিচি সাজাইয়া সে শিখিতে পারে :—

•• + • = ••• তিন,

•• + •• = •••• চার,

•• + ••• = ••••• পাঁচ।

ইহার পরে সে এই সারির দিকে না চাহিয়াই বলিতে পারিবে—সাত আর দু'য়ে নয়। ঘুঁটি সাজাইবার ছবিটা টেবিল বা মেঝে হইতে তাহার মনের মধ্যে গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

বিয়োগও এইভাবে শিখানো যায়। পরপর নূতন নূতন ঘুঁটি বসাইবার বদলে পুরাণো স্তূপ হইতে একটা দু'টা করিয়া সে তুলিয়া নিবে, তারপর বলিবে কয়টা রহিল।

এইবার সে সংখ্যাগুলিকে চিহ্ন ইত্যাদি দিয়া শ্লেটে লিখিতে পারে। তাহার শেখা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর সে ভাগ শিখিবে—দশের মধ্যে কটা দুই আছে? দশটা ঘুঁটি হাতে লইয়া দু'টা দু'টা করিয়া রাখিয়া গেলেই হয়—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ স্তূপ হইল।

ইহার পর সে একটু জটিল অঙ্ক কষিতে শিখিবে। একটা ছেলের হাতে দুই + দশটা কমলালেবু আছে। চারটা করিয়া স্তূপ সে কয়টা করিতে পারে? এখন সে রাশি লইয়া অঙ্কও করিতে পারিবে। ৭+৫−৩ = কত? যদি ঘুঁটি লইয়া সে হিসাব করিতে চায়, করুক; কিন্তু এখন তাহাকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিন, হাতে ধরিয়া ঘুঁটি না সাজাইয়া, মনে মনে ঘুঁটি সাজাইয়া সে হিসাবটা করুক। ইহার পর আর খালি রাশি ও সংখ্যা লইয়া হিসাব করিতে তাহার কষ্ট হইবে না।

এইবার তাহাকে অঙ্কশাস্ত্রের একটা বড় কথা শিখাইতে হইবে। কথাটা—একক, দশক ইত্যাদি গুণিতকের ঘর। ইহার অর্থ না বুঝিলে অঙ্কশাস্ত্রই শিশুর মাথায় ঢুকিবে না। অসভ্যদের গল্প সে শুনিয়াছে ত? সেই অসভ্যরা কি করে জান? তাহারা মোট পাঁচের বেশী গণিতে পারে না, অসভ্য কিনা। অনেকগুলি বুঝাইতে হইলে পাঁচ পাঁচ। "জলে পাঁচ-পাঁচটা মাছ, বনে পাঁচ-পাঁচটা জানোয়ার। আমরা ঢের বেশী গণিতে পারি, যতগুলিই হউক না কেন সংখ্যা বলিতে পারি। এমন সংখ্যা আমরা বলিতে পারি যাহা একটা একটা করিয়া গণিয়া সারিতে হইলে কয়েক বছরই লাগিবে, সারাদিন সারারাত ধরিয়া গণিলেও।

কিন্তু সংখ্যাই আমরা অনেক জানি; সংখ্যা যতগুলি আছে ততগুলি ত রাশি নাই। রাশি আছে মোটে দশটা—১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ এবং ০। এইগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া আমরা মস্তবড় সংখ্যা বানাই। কি

করিয়া? ৯ পর্য্যন্ত যখন সারা হইয়া গেল, তখন ১ এর পরে ০ টাকে বসাই। তারপর ১ টাকে ঠিক রাখিয়া শূন্যটার জায়গায় আবার ১, ২, ৩ করিয়া গণি—যে পর্য্যন্ত না দুইদশ হয়। তখন বাঁদিকে ১-এর বদলে আবার দুই লিখি—১৯-এর পর ২০। সেই ১ আর ২ কিন্তু আসলে ১ এবং ২ নয়—একদশ এবং দুইদশ। কিন্তু তাহা হইলে ত এক মুস্কিল। এক জায়গায় '৪' রাশিটা লেখা দেখিলাম। সেটা চার-এক না চার-দশ কি করিয়া বুঝিব? জাননা বুঝি? 'এক'দের একটা বাঁধা জায়গা আছে, 'দশ' দের জন্য আবার আর একটা বাঁধা জায়গা আছে। আনা আর পয়সাদের মত। 'দশ'-গুলি 'এক'-দের পিছনে অর্থাৎ বাঁয়ে বসে। তাহা হইলে দশের ঘরে একটা ৬ দেখিলেই বুঝিলাম, ওটা আসলে ৬ নয়, ছয়-দশ, অর্থাৎ ৬০। এবার বলত ৫৫ তে কত হইল? ডান দিকের পাঁচটা পাঁচ, আর বাঁদিকেরটা পাঁচ-দশ পঞ্চাশ, কাজেই সর্ব্বমোট পঞ্চান্ন।

বাঁদিকের রাশির মূল্য ডানদিকের রাশির দশগুণ, এই কথাটা যতক্ষণ শিশুর পুরাপুরি আয়ত্ত না হয় ততক্ষণ সে একক ও দশক এই দুই ঘর লইয়াই কাজ করিয়া যাক্। এই নীতিটা আয়ত্ত করার উপরেই কিন্তু অঙ্কবিদ্যার অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। তাহার জ্ঞান সত্যই হইয়াছে কিনা, পরীক্ষা করার নির্ভুল উপায়—ভুল লিখিয়া তাহাকে দেখানো। ৭ লিখিতে রাশিটা দশকের ঘরে দিন, সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িবে। জানে—না! ওটা বুঝি সাত হইল, ওটা ত হইল সত্তর। দশকের ঘরটা মাথায় ঢুকিলে আর কষ্ট নাই। এবার তাহাকে শিখাইয়া দিন, আর একঘর বাঁয়ে গেলে শতকের ঘর, আবার এক ঘর গেলে হাজারের ঘর। মোট কথা বাঁদিকে এক-একঘর করিয়া সরিবার অর্থই রাশির মূল্য দশগুণ করিয়া বাড়িয়া যাওয়া। এই তথ্যটা শেখা সম্পূর্ণ

হইবার আগেই তাহাকে তাড়াতাড়ি অঙ্ক করাইতে যাইবেন না। একটু দেরী হইলেই অস্থির হওয়ার কারণ নাই; তাড়াতাড়ি করিলে তাহাকে একসঙ্গে অনেকদিকে নজর দিতে হইবে, যা শিখিয়াছে সমস্ত গুলাইয়া যাইবে। একবারে একটা করিয়াই সে শিখুক।

'দশকে'র ব্যাপারটা আয়ত্ত হইলে তখন ছোট ছোট যোগ ও গুণ করিতে দিন। 'হাতে' যে রাশিটা থাকে তাহাকে হাতে থাকে 'এক', হাতে রইল 'তিন' করিয়া যেন সে না বলে। বলিবে, হাতে থাকে একদশ, হাতে রইল তিনদশ', ইত্যাদি। ইহাতে তাহার ঘরের ধারণা স্পষ্ট হইবে।

একক দশক শিখিবার পর শিশু অতি সহজে পয়সা আনার ব্যাপারটা শিখিয়া ফেলিবে।

শিশুর হাতে কয়েকটা 'পয়সা' দিন, ধরুন পঁচিশটা। এতগুলি পয়সা হাতে লইয়া দোকানে যাওয়া যায় না—হাতে ধরে না, পড়িয়া যায়। আচ্ছা, আর কোন ছোট রকমের পয়সা নাই? আছে,—আনি। ক'টা পয়সায় এক আনা? চার পয়সায়। চার চার পয়সা করিয়া আলাদা করিয়া রাখ ত? খোকা আলাদা করিয়া রাখিল। ছ'টা চার-পয়সার ভাগ হইল, আর একটা পয়সা বেশী হইয়াছে। তাহা হইলে পঁচিশটা পয়সায় হইল ছয় আনা এক পয়সা। এখন, এইসব পয়সা দিয়া পাঁচটা পেন্সিল কিনিলাম, পাঁচ পয়সা করিয়া এক একটা। মোট পঁচিশ পয়সার দোকানী বিল লিখিয়া দিল।

টাকা	আনা	পয়সা
	৬	১

বিলটা কি ভাবে লেখা হইয়াছে দেখ। পয়সা গুলির দাম কম, সেইগুলি একেবারে ডান দিকে। আনির দাম একটু বেশী; সেটা বাঁ দিকে। পয়সা আনার হিসাব তাহার বোঝা হইয়াছে। লেখার সময়

পয়সাটা ডানদিকে লিখিতে হয়, আনাটা বাঁ দিকে। ডানদিকের ঘরে ২ লিখিলে বুঝাইবে দুই পয়সা। বাঁ দিকের ঘরে লিখিলে বুঝাইবে আনা। এইবার তাহাকে আনা হইতে টাকায় লইয়া যান, তবেই হইল। এক-পয়সা লিখিতে হইলে যে ৩ পাই বা ৫ গণ্ডা লেখা হয়, সেই কথাটা সে পরে শিখিবে।

এখন ওজন ও দৈর্ঘ্যের পালা। শিশুকে একটা দাঁড়ি-পাল্লা ও বাটখারা কিনিয়া দিন; ইট বালি সুরকি মাপিয়া মাপিয়া সে ঠোঙ্গায় বা কাগজে জড়াইয়া মোড়ক করুক। মোড়ক করার অভ্যাস হইতে পরিচ্ছন্ন কাজের অভ্যাসও হয়।

একটা ফিতা ও একটা ইঞ্চিকাঠি (স্কেইল্) কিনিয়া দিন। এই বইটার ওজন কত হইবে ? টেবিলটা কতটা লম্বা ? দেখিয়া আন্দাজ করত ? ইহা হইতে তাহার ওজন ও দৈর্ঘ্য জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাংশের ধারণাও হইবে। তিন হাত, আর এক হাতের অর্দ্ধেক; একসের, আর এক সেরের চারভাগের একভাগ;-- এইরকম করিয়াই প্রথম ভগ্নাংশ সে বুঝিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অঙ্ক-পড়া শুধু হিসাব রাখিবার জন্য নহে, বুদ্ধি ও নির্ভুল কাজ করিবার শক্তি ইহাতে যেমন বাড়ে তেমন আর কিছুতে হয় না। শিক্ষক এই কথাটি মনে রাখিবেন—অঙ্ক কষিতে বসিয়া শিশু যেন ফাঁকি না দেয়। পরের খাতা হইতে টুকিয়া, অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া, উত্তরের পৃষ্ঠা দেখিয়া, অঙ্ক হাজির করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে বদভ্যাস হইয়া যাইবে, তাহা এ-জন্মে আর সারিবে না। অঙ্ক 'প্রায় হইয়াছে' বলিয়া যেটুকু ভুল হইয়াছে সেইটুকু সারিয়া আনিতে বলাও এই প্রকারের বদভ্যাস সৃষ্টি করে। অঙ্কের 'প্রায় শুদ্ধ' বলিয়া কিছু নাই। অঙ্ক শুদ্ধ হয়, আর না হয় ভুল হয়—ইহার মাঝামাঝি রাস্তা

নাই। 'ভুলটা' এমন কিছু ভুল নয়, আর অল্প একটু দেখিলেই সারিয়া ফেলা যাইত—এই ধারণা শিশুর মনে জন্মানো অন্যায়; ইহাতে সে মনে করিতে শিখিবে, চৌদ্দ আনা তাহার হইয়াই গিয়াছে, দু' আনা মাত্র বাকি, যা না হইলেও এমন ক্ষতি কিছু নয়। তারচেয়ে সেই ভুল অঙ্কটা বাদ দিয়া দিন, নূতন একটা অঙ্ক তাহাকে কষিতে দিন; এবার সে নিজেকে 'চৌদ্দ আনা বুদ্ধিমান' ভাবিবে না। যত্ন করিয়া অঙ্কটা করিবে এবং এবার আর ভুল করিবে না।

আগের দিনে শিশুকে একরাশ ত্রিভুজ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি কাটিয়া দেওয়া হইত; স্কুলের দেওয়াল এইগুলিতে ভর্ত্তি থাকিত। তখনকার শিক্ষাব্রতীদের ধারণা ছিল, এইগুলি দেখিতে দেখিতে তাহাদের মনে উচ্চ-অঙ্কের গণিত ও জ্যামিতির প্রতি আকর্ষণ জন্মিবে। কথাটা সত্য বা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শিশুর মন বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া কল্পনা করিতে চায় না। তিনকোণা পাহাড়ের চূড়া বা চারকোণা পুকুর সে মনে রাখিতে পারে। কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজ বা চতুষ্কোণ দেখিয়া সে আনন্দ পায় না, তাহার কাছে ঐগুলি অর্থহীন, নীরস পদার্থ। বরং সেইগুলি বাধ্য হইয়া দেখিতে হয় বলিয়া তাহার মনে বিতৃষ্ণা আসে। বিতৃষ্ণা একবার আসিলে আর তাহাকে ছাড়ানো অসম্ভব। বড়দের চেয়ে শিশুদের মনে বিতৃষ্ণা আসে সহজে এবং আসিলে আর যাইতে চায় না। "প্রয়োজন"-এর যুক্তি শিশু-মনে দাগ কাটে না, যাহা তাহার ভাল লাগে না, তাহার প্রতিই সে বিরূপ হইয়া উঠে।

তাই জ্যামিতিক গঠন ও আকৃতি যদি তাহাকে শিখাইতেই হয়, সেটা প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্য দিয়া শেখানো-ই বরং ভাল। পাহাড়ের চূড়াটা তিনকোণা, পুকুরটা চারকোণা, পিপার বেড়টা গোল, এইভাবে বস্তুর মধ্য দিয়া সে শিখিতে পারে; তাহাতে তাহার পরিশ্রম হয় না।

জ্যামিতিক আকৃতি বস্তুর আকৃতির মধ্যেই থাকে, তাহার কঙ্কালের কাজ করে। কঙ্কাল দরকারী জিনিষ, কিন্তু কঙ্কাল দেখিতে আমাদের ভাল লাগে না, তাহাকে রক্তমাংসে আবৃত মনোহর রূপেই আমরা দেখিতে চাই। শিশুও ইহার ব্যতিক্রম নয়। তাই বস্তুর বাহিরে জ্যামিতিক আকৃতির কল্পনা করাও তাহার পক্ষে শক্ত; তাহার মধ্যে রসও সে পায় না। অতি শিশুকালে এইভাবে উচ্চ গণিতের শিক্ষা আরম্ভ না করাই ভাল মনে হয়। সকল বস্তুই হজম করার একটা বয়স আছে। যখন তাহার সেই গণিত বুঝিবার বয়স ও বুদ্ধি হইবে তখন তাহা শিখাইলে সে আগ্রহের সহিত শিখিবে, শিখিয়া আনন্দ পাইবে। অকালে জোর করিয়া তাহাকে কতকগুলি অর্থহীন 'সংজ্ঞা' মুখস্থ করাইতে গেলে লাভের মধ্যে আসিবে তাহার বিতৃষ্ণা; তারপর সেই গণিতের নাম শুনিলেই তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিবে, জীবনে আর সে অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে রসের সন্ধান পাইবে না।

গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা খুবই চিত্তাকর্ষক, তাহার প্রতি একটা আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষেরই যথাসময়ে আসে। জোর-জবর করিয়া সেই আকর্ষণটাকে বাড়ানো যায় না। জোর করিলে বরং সেটা কমিয়া যায়।

'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'

শিশুর শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় প্রকৃতির কোলে, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে ; একথা লইয়া পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক।

এখানে শুধু এই কথাটিই আবার মনে করাইয়া দিব ; শিশুকাল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়, যাহা কিছু এই সময়ে শিশু দেখে তাহাই সঞ্চয় করিয়া করিয়া তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই 'দেখিবার' সুযোগ তাহাকে পূর্ণমাত্রায় দিতে হইবে।

'দেখিবার' সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে প্রশ্ন উঠিবে। "বাতাস কেন বয় ?" "নদী কেন চলে ?" "গাছের পাতা কেন সবুজ হয় ?" তাহার মনে চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতেছে, এই সব প্রশ্ন তাহারই লক্ষণ। একবারেই প্রশ্নের উত্তর তাহাকে বলিয়া দিবেন না। সে নিজেই একটু চেষ্টা করুক না, ইহার উত্তর বুঝিতে পারে কিনা। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাহাকে বলিয়া দিতেই হইবে ; কিন্তু তখন শুধু ফাঁকা কথায় উত্তরটুকু তাহাকে বলিয়া দিলে হইবে না। ফাঁকা কথার উত্তর আমরা বুঝি, কারণ তাহার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে সেটা আমাদের জানা। শিশুর সেটা জানা নাই। অতএব তাহার প্রশ্নের উত্তর যদি সত্যই দিতে চান, সেই তথ্যটুকুও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। দীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন না, বড় বড় কটমট বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করিবেন না। শাদা সহজ ভাষায়, অল্প কথায়, বিষয়টা তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন। সে ছেলেমানুষ, বুঝিবে না, মনে করার কোন কারণ নাই। সহজ করিয়া বলিলে শিশু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি খুব জটিল ব্যাপার নয় ; জটিল হয় বৈজ্ঞানিকদের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লেখা পরিভাষা-কণ্টকিত বইগুলি।

অনেকসময় শিশু নিজে হইতেই অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে উৎসাহ দিবেন ও তাহার আবিষ্কারের বাকি যেটুকু সে খুঁজিয়া পায় নাই, সেইটুকু বলিয়া দিয়া তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন। কিন্তু অযথা 'পরিভাষা' মুখস্থ করাইয়া তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিবেন না। শিশু বিড়াল-কুকুর দেখে, আবার কেঁচো-জোঁকও দেখে। সে নিজে হইতে এই কথাটা বাহির করিয়া ফেলে, ইহাদের মধ্যে একদলের গায়ে হাড় আছে, আর একদলের গায়ে হাড় নাই; অতএব ইহারা ভিন্নশ্রেণীর জীব। খুব ভাল কথা। তাহার এই আবিষ্কারটি বড় মূল্যবান। পরিভাষা সে না-ই বা জানিল। হাড়ওয়ালা এবং হাড়ছাড়া জীব বলিলেই ত তাহার কাজ চলিয়া যায়। 'মেরুদণ্ডী' ও 'অমেরুদণ্ডী' মুখস্থ করার তাহার কি দরকার? অবশ্য এইভাবে দেখিতে হইলে চক্ষু থাকা চাই। সেই চক্ষু সকলের থাকে না। 'Evenings at Home' বইয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে; 'চক্ষুষ্মান্' ও 'চক্ষুহীন' এক সঙ্গে বেড়াইতে গেল। চক্ষুহীন বাড়ী ফিরিল, ঘোরতর মানসিক অবসাদ নিয়া। সে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতেই পথ চলিয়াছে, কিন্তু 'লক্ষ্য করিবার মত' কিছু তাহার চক্ষে পড়ে নাই। অতএব বেড়াইয়া সে একটুও আনন্দ পায় নাই। আর চক্ষুষ্মানকে দেখা গেল কৌতূহলে ফাটিয়া পড়িতেছে, পথের দু'ধারে এতরকম জিনিস তাহার চক্ষে পড়িয়াছে, এতরকম কথা তাহার মনে হইয়াছে, তাহার গল্প না বলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না। অবশ্য দেখিতে-পাওয়াটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করিতেছে দেখিবার অভ্যাসের উপর, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির প্রখরতার উপর, এবং জ্ঞানের উপর। যে খানিকটা জানে সে আরও খানিকটা বোঝে, আরও খানিকটা জানার মজা বোঝে। যে কিছুই জানে না, সে জানিতে হয় কেমন করিয়া, তাই জানে না। হার্বার্ট

স্পেন্সার্ সত্যই লিখিয়াছেন—প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপরে সমান্তরাল সব রেখার দাগ। মূর্খ দেখিয়া কিছুই বুঝিল না। ভূতত্ত্ববিদের মন তাহা দেখিবামাত্র নৃত্য করিয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে একটা প্রকাণ্ড বরফস্তূপ (glacier) এই পথে ধ্বসিয়া নামিয়াছিল। পাহাড়ের গায়ে ঐ দাগগুলির মধ্যে সেই ঘটনার বৃত্তান্ত লেখা রহিয়াছে। সেই লেখা সে পড়িতে পারে, মূর্খ পারে না। বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে কোনদিন করে নাই, পৃথিবীতে চারিপাশে কত যে জ্ঞান, কত যে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার সন্ধানই সে পায় না। ছেলেবেলায় যে কখনো গাছপালা বা প্রজাপতি দেখিতে শেখে নাই, সে কি করিয়া জানিবে—গ্রামের পথে বেড়াইতে গিয়া কতরকমের সুন্দর বস্তু তাহার চক্ষে পড়িতে পারে।

প্রশ্ন উঠিবে, "কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কি শিশুর আছে? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শিশু বুঝিবে কেন?" উত্তরে বলিব, না বুঝিবার কারণটা কি আছে? বৈজ্ঞানিক সত্য জটিল বস্তু নয়; অত্যন্ত সহজ সরল পথ ধরিয়াই তাহার আনাগোনা। তাহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা শিশু বুঝিতে পারিবে না। উচ্চ অঙ্কের খুঁটিনাটি ত তাহাকে কেহ শিখিতে বলিতেছে না। মোটামুটি নীতিগুলি সে বুঝিবে, বুঝিয়া আনন্দ পাইলে আগ্রহের সহিত জানিতে চাহিবে। রেলগাড়ী কি ভাবে চলে তাহা শিশুকে বুঝাইয়া বলিলেই সে বুঝিয়া নিবে। ঠিক কতটুকু কয়লা পোড়াইলে কতটুকু ষ্টীমের চাপ হইবে, ক'খানা গাড়ী লইয়া ইঞ্জিন কত জোরে ছুটিতে পারে, এসকল তথ্য সে না-ই জানিল।

অশিক্ষিত লোকদেরে শিক্ষিত করিবার জন্ম একজন অখ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী এক চমৎকার পন্থা বাহির করিয়াছিলেন। তাহার নিজের বর্ণনা হইতেই সেই পন্থার পরিচয় দেওয়া হইল:— "এই গ্রাম্য শিশুরা

যখন বড় হইবে, তখন তাহাদের যে ধরণের জ্ঞান ও বিদ্যার দরকার হইবে, সেইগুলিই তাহাদের শিখাইতে আমি চাহিয়াছিলাম। আমি স্থির করিলাম তাহাদিগকে সাধারণ জিনিষের, প্রতিদিনের জীবনের বস্তু-গুলিরই জ্ঞান শিখাইব। প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে কত দেখিবার বস্তু থাকে তাহার দিকে আমি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দিতাম, তাহাদের চিরপরিচিত বস্তুগুলির মধ্যে যে-সকল কাণ্ড ঘটে, তাহা কেন ঘটে তাহাই বুঝাইয়া দিতাম। ....সকল কথাই শেষ পর্য্যন্ত আনিয়া কাজের কথায় শেষ করিতাম। শুধু অলস বিজ্ঞানচর্চ্চা তাহারা করিত না, তাহারা শিখিত সেই বিজ্ঞান জীবনে কোন্খানে প্রয়োজন হয়।" কি ধরণের কথা তাহাদেরে শিখাইতেন তাহারও একটা তালিকা তিনি দিয়াছিলেন :—

"বায়ুর কতকগুলি গুণ তাহাদের চিনাইলাম। বায়ুর চাপ আছে বলিয়া তাহারা পাম্পে জল তুলিতে পারে, হাওয়ার বন্দুক ছুঁড়িতে পারে, খড় বা নল দিয়া জল চুষিয়া নিতে পারে। তাহাদের শিখাইলাম কি রকম করিয়া ব্যারোমিটার তৈরী হয়, পাম্প তৈরী হয়, কামারের হাপর তৈরী হয়। গরম হইলে বায়ু আয়তনে বাড়ে, এইটা বুঝাইলাম একটা রবারের বাডারে অৰ্দ্ধেক বাতাস পুরিয়া সেটাকে আগুনের কাছে রাখিয়া দিয়া। গরমে বাতাস বাড়িল, বাডারের গায়ের খাঁজগুলি ভরিয়া পালিশ হইয়া উঠিল, আর তাহাদের বুঝিতে কষ্ট হইল না।"

কেন দূরে বন্দুক ছোঁড়া হইলে আগে তাহার আগুনের ঝিলিকটা দেখি, তারপর শব্দটা শুনি; কি করিয়া কত দূরে বাজ পড়িল মাপা যায়; শীতের সময় কেন জলের পাইপ্ ফাটিয়া যায়; বরফ কেন জলের তলায় না ডুবিয়া উপরে ভাসিতে থাকে; শীতের দিনে কেন নিশ্বাসটা

ধোঁয়ার মত চক্ষে দেখা যায় ;—ইত্যাদি কত কথা তাহাদের শিখাইতেন তাহার দীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়াছেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এই কর্ম্মবীর যে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তাহার দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রকৃত শিক্ষক ইহাকেই বলে। প্রকৃত শিক্ষক জানেন, তাঁহার চারিপাশে প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত পড়িয়া আছে ; প্রাচুর্য্যের অভাব নাই, অভাব শুধু তাহাকে আহরণ করিবার সামর্থ্য ও অবসরের।

অবশ্য একথাও সত্য, এই রকমের শিক্ষক হইতে হইলে যথেষ্ট জ্ঞানী ও উৎসাহী লোক হওয়া চাই। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কি সেরকম শিক্ষক একান্তই দুর্লভ ?

'ভূগোল'

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে ভূগোল পড়িতেই হইবে। ভূগোলের মধ্য দিয়া খানিকটা ভূতত্ত্ব ও বিজ্ঞান শিখা যায় ; কিন্তু ভূগোল পড়ার প্রয়োজন সেজন্য নয়। ভূগোল শিশুর মনকে নূতন নূতন দেশের খবর দেয়, তাহার কল্পনাকে নূতন নূতন ছবি যোগাইয়া পুষ্ট করে। এইজন্যই ভূগোল পড়ার দরকার।

স্কুলে যে-ভাবে ভূগোল পড়ান হয় তাহাতে এটা হয় না। স্কুলে কি ভাবে পড়ানো হয়, দেখা যাক। শিশুকে কতকগুলি বই পড়ানো হয় ;

ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, তাহাকে মুখস্থ করিতে হয়—ভারত-বর্ষের নদী কি কি, কোন্‌টা কত মাইল লম্বা; পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গিরিশৃঙ্গ কি কি আছে, কোন্‌টা কত গজ উঁচু; ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের রাজধানীর নাম কি; বাঙ্গলা দেশে ক'টা জিলা, ক'টা থানা, ইত্যাদি। মাষ্টার মশাই যদি উৎসাহ করিয়া শিখান তবে হয়ত মানচিত্রে নদী, পর্ব্বত, শহরগুলির অবস্থান সে একবার দেখে, অনেক সময় তাহাও দেখে না। বই খুলিয়া মুখস্থ করে, পড়া দেয়, পরীক্ষার সময় লেখে, তারপর স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যায়। এই পড়ায় যা লাভ, তার চেয়ে যদি পোকামাকড়ের চলাফেরা দেখিয়া এই সময়টা সে ব্যয় করিত, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চয়ের দিক দিয়া তাহার অনেক বেশী লাভ হইত।

দেশবিদেশের কথা জানার মধ্যে আনন্দ আছে। কিন্তু সে কি এইরকম করিয়া জানা? অতি রসালো ভ্রমণকাহিনী পড়িবার সময়ও আমরা তাহার সরস অংশটুকুই পড়ি, নীরস জায়গাগুলি ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাই। রস প্রত্যাশা করার অধিকার নাই শুধু শিশুদের—তাহাদের যথাসাধ্য শুক্‌না করিয়াই দেশবিদেশের জ্ঞান গিলিতে হইবে! অনেকে বলেন, "প্রথমদিকে ত কষ্ট করিয়াই শিখিতে হয়। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান শিশুর কাজে লাগিবে।" মোটেই না। বড় হইয়া ইহার একবর্ণও শিশুর মনে থাকে না। দায়ে পড়িয়া সে পড়া মুখস্থ করে, সেই পড়া লঘু স্মৃতিতেই ভাসিয়া থাকে, পরীক্ষা পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া দেয়। তার নীচে এই পড়া যায় না, তাহার স্থায়ী স্মৃতিপটে দাগই কাটে না। শিশুকালে মরিয়া বাঁচিয়া ভুগোলের পড়া তো আমরা সকলেই মুখস্থ করিয়াছি। মনে আছে কার কতটুকু? একটুও মনে নাই—খালি রসালো ভ্রমণবৃত্তান্ত বা উপন্যাস পড়িয়া, অথবা লোকের মুখে গল্প শুনিয়া যেটুকু চিত্র মনে গাঁথিয়া গিয়াছে সেইটুকু ছাড়া। শিশুকে যদি সত্যই

ভূগোল শিখাইতে হয়, এমন করিয়া শিখাইতে হইবে যেন সেই শেখার মধ্যে সে আনন্দ পায়, তাহার কল্পনাকে পুষ্ট, উত্তেজিত করিবার মত উজ্জ্বল ছবি পায়। এমন জিনিষই তাহাকে শিখাইতে হইবে, যাহা মনে রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব। তাহা হইলেই ভূগোল পড়ানোর অর্থ হয়।

এখন কথা হইতেছে, সেইভাবে শিখানো যায় কি করিয়া? প্রাকৃতিক জ্ঞানের মত ভূগোলেও প্রথম হাতেখড়ি হইবে স্বাভাবিক দৃশ্য ও বস্তুর মধ্য দিয়া, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। যেমন, যেখানে সত্যই নদী, পাহাড়, হ্রদ আছে, সেখানে ত সে দেখিয়াই চিনিতে পারে; যেখানে সেগুলি নাই, সেখানে সে নমুনা দেখিয়া শিখিবে। বেড়াইতে যাইবার পথে এক জায়গায় খানিকটা জল দাঁড়াইয়া আছে, একটা নালা দিয়া সেই ডোবার মধ্যে জল আসিয়া পড়িতেছে। ওটা কি? হ্রদ আর নদী। ইহার পর আর তাহার কল্পনাকে দৌড় করাইতে কষ্ট নাই; ভারতবর্ষে হ্রদ আছে কি কি? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদটার নাম কি? সেটা কোন্‌দেশে? ভারতবর্ষে বড় নদীগুলির নাম কি? নদী দিয়া কি হয়? সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পেন্সিল দিয়া, বা মাটির উপরে ছড়ির ডগা দিয়া রেখা টানিয়া তাহাকে একটা মানচিত্রের খসড়া আঁকিয়া দেখাইয়া দিন, ভারতবর্ষের কোন্‌ জায়গাতে সম্বর ও চিল্কা। এইভাবে আস্তে আস্তে তাহার মনেও কতকগুলি জানা কথা জাগিয়া উঠিবে— সম্বর হ্রদ রাজপুতানায়, রাজপুতানায় ছিল প্রতাপসিংহের বাড়ী। আরাবল্লী গিরিশ্রেণীটা কোন্‌খানে? কিসের জন্য প্রসিদ্ধ?

এইভাবে যেটুকু শিখিল তাহা আর সে কখনও ভুলিবে না। ইহার পর তাহাকে স্থানবিশেষের ভৌগোলিক তত্ত্ব খুঁটিনাটি করিয়া শিখান। গোটা ভারতের সমস্ত সহরগুলির নাম একদিনে মুখস্থ করাইয়া লাভ

নাই, সে মুখস্থবিদ্যা মনে থাকিবে না। তারচেয়ে যে-কোন একটা প্রদেশ, একটা জিলা, বা গ্রামেরই সমস্ত তথ্য সে জানুক। সেটা কেমন জায়গা, সেখানে কাহারা থাকে, তাহারা কি করিয়া খায়, কেমন তাহাদের রীতিনীতি, সেখানে কি কি গাছপালা ও শস্য হয়, কি কি জীবজন্তু পাওয়া যায়, এই সমস্তই শিখুক। পড়িতে পড়িতে সেই জায়গাটাতে যেন তাহার মনটা একবার ঘুরিয়া আসে, তাহাকে যেন সে নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পায়। এই হিসাবে 'ভূগোল' বইয়ের চেয়ে 'ভ্রমণকাহিনী' পড়াতে বেশী কাজ হয়। ভ্রমণকাহিনী পড়িতে পড়িতে শিশু অজ্ঞাতসারেই নিজেকে সেই ভ্রমণকারীর সহিত এক করিয়া ফেলে, তারপর সেই কাহিনী তাহার নিজেরই কাহিনী হইয়া উঠে। ভ্রমণকারীর দুঃখে তাহার চক্ষে জল আসে, ভ্রমণকারী বিপদে পড়িলে তাহার নিজের রক্ত গরম হইয়া উঠে।

এই রকম পড়া শিশুকে অভ্যাস করানো শক্ত নয়। সে নিজে বই পড়িতে পারে; অথবা অন্য কেহ তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে বা গল্প বলিতে পারে।

একটা গ্রামকে, একটা জিলাকে ভাল করিয়া চিনিলে তারপর অন্য গ্রাম অন্য জিলার কথা শিখিতে তাহার সময় লাগিবে না; মনে মনে পরিচিত গ্রামটার সঙ্গে তুলনা করিয়া সহজেই সেটার খুঁটিনাটি সে মুখস্থ করিতে পারে। মোটকথা তাহার যেটুকু জ্ঞান হইবে সেটুকু যেন নিখুঁত হয়। কতগুলি বস্তুর কথা সে জানিল, সেইটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হইল, যেটার সম্বন্ধে সে জানিল—সেটার সম্বন্ধে কতখানি জানিল। এই সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে 'মানচিত্রের' ব্যবহার শিখাইতে হইবে। শিক্ষক একটা খসড়া নক্সা আঁকিয়া ভ্রমণকারী কোন পথে গিয়াছিলেন সেই পথটা দেখাইবেন; পথের মধ্যে যে সকল শহর, নদী, হ্রদ প্রভৃতির

উল্লেখ আছে, সেইগুলি দেখাইবেন। এই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও খানিকটা শিক্ষা হইয়া যাইবে; আগ্নেয়গিরি, ধ্বসিয়া পড়া বরফের স্তূপ (glacier), ঘূর্ণিবায়ু, কাহাকে বলে, সেটাও শিশু শুনিয়া যাইবে। ইহার পর সেই দেশের একটা ভাল মানচিত্র তাহাকে দেখান, সেই মানচিত্রের সহিত তাহার চেনা নক্সাটা একত্রে মিলাইতে বলুন। দেখিবেন সে সহজেই মানচিত্রের উপরে ভ্রমণকারীর পথটা দেখাইয়া দিতেছে।

এইভাবে চলিলে দেখা যাইবে, ছয় হইতে নয় বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে নানা তথ্যই জানিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বই পড়ারও একটা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখন ভ্রমণকাহিনী তাহার প্রিয় বস্তু। এই শিক্ষা 'পড়া'র সময় না দিয়া খেলা ও গল্পের সময় হইলে আরো ভাল হয়। গল্পের ছলে তাহারা এগুলি শিখিবে, ইহাতে তাহাদেরও ক্লেশ কিংবা ক্লান্তি বোধ হইবে না, গল্পের বই পড়ার সময়টারও সদ্ব্যবহার হইবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির রূপ কল্পনা করিবে, বালি দিয়া পাহাড় বানাইবে, মাটিতে গর্ত্ত কাটিয়া নদী বানাইবে, এবং এইভাবে তাহার ভৌগোলিক সংজ্ঞাগুলি আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

ভূগোল পড়িতে হইলে সংজ্ঞা কিছুটা মুখস্থ করিতে হয়ই। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, বস্তু চিনিবার আগে যেন শিশু সংজ্ঞা মুখস্থ করিতে না বসে। সে জ্ঞান কাজে আসিবে না, এবং মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে। নদী বা তাহার নমুনা স্বরূপ একটা নালা সে চক্ষে দেখুক। লক্ষ্য করুক তাহাতে কি কি বিশেষত্ব আছে—কি রকম তাহার দু'টা পার আছে, পারগুলি আঁকা-বাঁকা ভাবে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জলগুলি একদিক হইতে আর একদিকে চলিয়া যাইতেছে।

তারপর নদীর সংজ্ঞা সে বই খুলিয়া মুখস্থ করুক। জিনিস না চিনিয়া তাহার নাম মুখস্থ করা বা জিনিস থাকিতেও তাহার দিকে না চাহিয়া বই পড়িয়া তাহাকে চিনিতে চেষ্টা করানোর কোন অর্থ হয় না। এইভাবে কিছুদিন চলিলে, তাহার জ্ঞান কিছুটা বাড়িলে, তখন শিক্ষকের সম্মুখে নূতন একটা প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইবে। শিশু ভূগোলের মোটামুটি সংজ্ঞাগুলি চিনিয়াছে; পাহাড়, সমুদ্র, জোয়ার-ভাঁটার রহস্য, কিছু কিছু জানিয়াছে। মাটিতে দাগ কাটিয়া হ্রদ ও নদী চেনার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আর তাহাতে তাহার মন উঠিবে না—এবার সে সত্যকার পৃথিবীকে চিনিতে চায়। ডোবায় তাহার মন উঠেনা, সে হ্রদ দেখিবে; গ্রামের ভূগোলে তাহার হয় না, সে পৃথিবীর মানচিত্র দেখিবে। তাহার কল্পনার প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে—এতদিনে তাহার দৃষ্টির সীমারেখা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সীমারেখার সহিত এক হইতে চাহিতেছে।

এইবার শিক্ষক তাহাকে সত্যকার ভূগোল পড়াইতে পারেন। মানচিত্র ছাড়া এটা পড়ানো একেবারেই অসম্ভব। সে কথাটা কিন্তু ভুলিবেন না। কোথায় ইটালী, কোথায় রাশিয়া, তাই যদি সে না জানে, ইটালী ও রাশিয়ার সম্বন্ধে তাহার তথ্য মুখস্থ করিয়া লাভ নাই। বাড়ীর বা ক্লাসের ঘরটার নক্সা সে আঁকিতে শিখিয়াছিল; সেইটার গণ্ডি বাড়াইয়া এবার সে সমস্ত দেশের, সমস্ত মহাদেশের, সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র আঁকিতে চাহিতেছে। সেই মানচিত্র তাহাকে শিখান। এখন সে সহজেই শিখিতে পারিবে, মানচিত্রের মধ্যে অক্ষরেখা দ্রাঘিমারেখা কাহাকে বলে; কি তাহার প্রয়োজন, তাহাও শিখিতে পারিবে। সমুদ্র, পর্ব্বত ও সমতলভূমি কি রকম করিয়া মানচিত্রে আঁকিতে হয়, বলিতে পারিবে।—মানচিত্রের উপরে অঙ্কিত যে কোন

একটা জায়গা অন্য জায়গা হইতে কোন্‌দিকে কতটা দূরে অবস্থিত, তাহারও ধারণা সে করিতে পারিবে।

ভূগোল ও মানচিত্রের জ্ঞান, দৃষ্টির বাহিরের পৃথিবীকে দৃষ্টির মধ্যে আনিয়া দেয়। তাই কল্পনার খোরাক যোগাইবার দিক দিয়া ভূগোল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পড়া ও খেলা। আমরা শুধু পড়াইবার পদ্ধতির দোষে তাহাকে রসহীন, আকর্ষণহীন করিয়া তুলি। সেই দোষটা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে শিশু ভূগোলের মধ্যেকার আনন্দের সন্ধান পাইবে। নিজের খুসীতেই সেই আনন্দ আহরণ করিয়া মনের ভাণ্ডার সম্পদে ভরিয়া তুলিবে।

'ইতিহাস'

ভূগোল সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি ইতিহাসের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ইতিহাস অফুরন্ত ছবি ও কাহিনীর ভাণ্ডার—শিশুর কল্পনাকে সে ভরিয়া তোলে। ইতিহাসের কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাহার মন অতি দূরের অতীতে চলিয়া যায়, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নন্দের সঙ্গে একটু যুদ্ধ করিয়া আসে, পুরুর পাশে দাঁড়াইয়া বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারকে একবার দেখিয়া নেয়। এই জন্যই শিশুকে ইতিহাস পড়াইবার প্রয়োজন।

সাধারণতঃ আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়াই তাহাতে এই কল্পনার খোরাক বেশী থাকে না। আমরা শুধু পড়াই, কে কবে জন্মিল, মরিল, কবে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিল; কিন্তু এই হিসাব ইতিহাস নয়। আরও

কথা, এই ইতিহাস কেবল তারিখের পর তারিখ দিয়া কণ্টকিত করা হয়, তাহা দেখিলেই শিশুর গায়ে জ্বর আসে। সেই তারিখের তালিকা মুখস্থ করা তাহার সাধ্যে কুলায় না, এবং পড়া নির্ভুল করিবার জন্য সবখানি শক্তি দিয়া তারিখই সে মুখস্থ করে, ইতিহাসের সত্যকার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা তাহার চক্ষে পড়ারই অবসর পায় না। এইভাবে পড়িবার ফলে ইতিহাস তাহার কাছে শুধু নীরস তারিখের তালিকা হইয়া দাঁড়ায়। সে পড়ে, "চন্দ্রগুপ্ত অমুক সন হইতে অমুক সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।" "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অমুক সন হইতে অমুক সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।" দুই চন্দ্রগুপ্তের সময় ভিন্ন ছিল, ইহা ছাড়া সে আর কি শিখিতে পারিল? এইভাবে পড়ার ফলে তাহার কাছে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, গোপালদেব, লর্ড কার্জন্ একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়; ইহাদের রাজত্বের কাল ছাড়া আর কোথাও যে ইহাদের মধ্যে তফাৎ আছে, যুগে যুগে যে মানুষের সমাজ বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাসই যে সত্যকার ইতিহাস—এই সন্ধান পর্য্যন্ত সে কোনদিন পায় না।

এই কাণ্ডের জন্য দায়ী আমাদের অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি। আমাদের ধারণা থাকে, শিশুকে আর কিছু না হোক, গোটা ইতিহাসটার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া দরকার। তাহাকে পড়িতে দেওয়া হইবে "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"—সেই পুঁথিতে বাষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া—লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর শাসনকাল পর্য্যন্ত 'সমস্ত' লেখা আছে। শিশুর বয়স নয় বৎসর। একবৎসরের মধ্যে তাহাকে চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী হইতে সুরু করিয়া শিবাজী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। চন্দ্রগুপ্ত হইতে শিবাজীতে পৌঁছিতে ভারতবর্ষের লাগিয়াছিল হাজার দুই বৎসর। তাহার বইএ সতেরোটি

পৃষ্ঠার মধ্যে সেই কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার আছে ; চৌদ্দদিনে তাহা মুখস্থ করিতে হইবে, কারণ পরীক্ষা আসন্ন।

এই পড়ার কোন অর্থ হয়? আর এইভাবে একগ্রাসে চন্দ্রগুপ্ত হইতে শিবাজী পর্য্যন্ত তাহার গলাধঃকরণ করাই চাই, এমনই বা কি কথা আছে? তাহার চেয়ে ধীরে সুস্থে এক একজন রাজার রাজত্বকালের সত্যিকার ইতিহাসই সে শিখুক না কেন। সেইভাবেই তাহাকে পড়িতে দিন। দুই-একটা বছর সে শুধু চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, পৃথ্বীরাজ, আকবর, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, গোপালদেব, লক্ষ্মণসেন, সিরাজদ্দৌলা—ইহাদের কাহিনীই পড়ুক। শুধু তাঁহাদের জন্মের ও মৃত্যুর তারিখ পড়িবে না, তাঁহারা কবে কোন্ যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন তাহার হিসাব পড়িবে না। পড়িবে তাঁহাদের সত্যকার ইতিহাস—তাঁহারা কেমন করিয়া প্রজা শাসন করিতেন, কোন্ গুণে তাহারা বড় হইয়াছিলেন ; পড়িবে, তখন প্রজারা কি রকম বেশভূষা করিত, আহার-বিহার করিত, চিন্তা করিত ; কেমন ছিল তাহাদের রীতিনীতি, কেমন ছিল তাহাদের শিল্পকলার সৃষ্টি। তবেই না তাহাদের সহিত সত্যকার পরিচয় হইবে? এইভাবে খুঁটাইয়া দুইটা যুগের বিবরণ পড়িলে তবেই না সে বলিতে পারিবে দুই যুগের মানুষদের মধ্যে কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; সভ্যতার পথে, কৃষ্টির পথে তাহারা কতটা অগ্রসর হইয়াছে বা পিছাইয়া গিয়াছে?

সে পড়ুক কোন্ জাতি কি ভাবে বড় হইয়াছিল, পড়ুক আমরা যখন এই অবস্থায় ছিলাম তখন চীনারা বা তুর্কিরা কি অবস্থায় ছিল। এই-ভাবে পড়িতে পড়িতে তাহার মনে এক একটা দেশের বড় হইবার মূল-মন্ত্রটা ধরা দিবে ; তাহার চক্ষুর সম্মুখে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, আলেক-জাণ্ডার, লিওনিডাস্, আল্‌ফ্রেড, রিচার্ড-এর ছবি ভাসিয়া উঠিবে ; সেই

ছবি সম্মুখে রাখিয়া তাহার মনে বড় হইবার স্বপ্ন জাগিবে। সেইখানেই ইতিহাস পড়ার সার্থকতা। শিশুদের জন্য আধুনিক যুগের ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীনযুগের ইতিহাস পাঠ্য হিসাবে ভাল। প্রাচীনকালের ইতিহাস ব্যক্তিত্বের ইতিহাস। আধুনিক যুগে প্রাধান্য বাড়িয়াছে কল-কৌশলের। কল-কৌশল শিশু বোঝে না, তার মধ্যে 'বীরত্ব' ততটা নাই যতটা আছে 'চক্রান্ত, কূটনীতি'। শিশু সেটা পছন্দ করে না। প্রাচীন ইতিহাস ব্যক্তিগত বীরত্বের ইতিহাস, যোগ্যতার ইতিহাস। এইজন্যই সে ইতিহাস সহজ, সরল; শিশুর মন সেই ইতিহাসের মধ্যেই আনন্দের, আদর্শের সন্ধান পায়। আজকালকার যে সেনাপতি তাঁহার কক্ষে বসিয়া ম্যাপ খুলিয়া টেলিফোনে আদেশ দিয়া সৈন্যচালনা করিতে-ছেন, তাঁহার পৃথিবী জয়ের ক্ষমতা থাকিতে পারে; কিন্তু শিশুর কাছে অনেক বড় বীরত্ব লইয়া দেখা দেন আরাবল্লীর গিরিপ্রান্তরে অশ্বারূঢ় উপবাসী রাণা প্রতাপ, মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধোন্মুখ রাজা শিবাজী। ইতিহাসের মধ্যে শিশু তারিখের হিসাব খোঁজে না, কাহিনীও খোঁজে না; সে খোঁজে তাহার আদর্শ। সেই আদর্শের সন্ধান, বাহুল্য-বর্জ্জিত বীর মানুষের সন্ধান মেলে প্রাচীন ইতিহাসে। ধারাবাহিক ইতিহাসেরও আগে একটা যুগ সকল দেশেরই ইতিবৃত্তে থাকে; সেটা 'কাহিনীর' যুগ, 'রূপকথার' যুগ। এই যুগ আর কিছুই নয়—যে যুগ দেশে বাস্তবিকই একদিন ছিল, যাহার সম্বন্ধে আমাদের অপ্রচুর জ্ঞান এবং প্রচুর কৌতূহল আছে এবং যাহাকে কল্পনার রঙ্ চড়াইয়া আমরা অপরূপ মূর্ত্তি দিয়া গড়িয়া তুলি। এই রূপকথা শিশুকে শুনাইতে হইবে। ইহার মধ্যে আজগুবি কথা আছে বলিয়া শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। দৈত্য রূপকথায় থাকিতে পারে, কিন্তু সেই দৈত্য মারিবার মত বীরও আছে। দৈত্যকে সে আদর্শ বানাইবে না, বানাইবে বীরকেই।

'রূপকথা'র মূল্য দুইরকম। রূপকথার মধ্যে কল্পনার খোরাক শিশু বেশী পায়। চন্দ্রগুপ্ত তাহার কাছে শুধুই চন্দ্রগুপ্ত, তিনি মহামানব, তিনি অতিমানব নন; কিন্তু বিক্রমাদিত্য শুধু রাজা নন, তিনি তাল-বেতালের প্রভু— তাঁহার ইতিহাসের সহিত এত অলৌকিক কাহিনী জড়াইয়া আছে যে তাল-বেতালহীন বিক্রমাদিত্যের কথা আমরা ভাবিতেও পারি না। সেই তাল-বেতাল তাঁহার জন্য অসাধ্য সাধন করে, শিশুকেও তাহারা ইচ্ছামাত্র কাঁধে তুলিয়া শতলক্ষ যোজনের পথ ঘুরাইয়া লইয়া আসে। ইতিহাসের সহিত কল্পনা মিশিয়া শিশুর মনকে রসে-রঙে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, শ্রান্তির সে আভাসও পায় না।

রূপকথার আরও একটা বড় বিশেষত্ব, রূপকথা গল্পের ছদ্মবেশে ইতিহাস। যে যুগের সন্ধান আমরা পাইয়াছি কিন্তু খুঁটিনাটি সংবাদ জানিতে পারি নাই, তাহাকে লইয়াই রূপকথা রচিত হয়। তাহার মধ্যে উদ্ভট কল্পনার বাহুল্য আছে, কিন্তু তাহার তলায় সত্যকার ইতিহাস, সত্যকার বৃত্তান্তও আছে। সেই তথ্য কে কোথায় খুঁজিয়া পাইবে কেহ বলিতে পারে না। শিশুকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখার অধিকার কাহারও নাই। কে বলিতে পারে একদিন সেই রূপকথার মধ্য হইতে দেশের লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান সেই শিশুই বাহির করিতে পারিবে কি না? রূপকথা তাহাকে জানিতে দিন, তাহার বাহিরের রূপে মুগ্ধ হইয়া সে যদি আনন্দ পায়, কাহারও কোন ক্ষতি নাই; বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার তলায় সত্যকে যদি সে টানিয়া বাহির করিতে পারে, জগতের লাভ আছে। ইতিহাস পড়িয়া সেই গল্প বলিবার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। গল্প বলার শক্তিটাকে বাড়াইয়া তুলিতে যদি সত্যই ইচ্ছা হয়, তবে ইতিহাসের মত তার আর এমন খোরাক নাই।

আর একটা প্রবৃত্তি শিশুদের মনে থাকে— ছবি আঁকা, যাহাকে ইতিহাসের কাজে লাগান যাইতে পারে। ছবি হয়ত তাহাদের ভাল হয় না, তবু মনে মনে একটা দৃশ্যের কল্পনা করিতে যাইয়া কত রকমের খুঁটিনাটিই যে তাহারা গড়িয়া তোলে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইংল্যাণ্ডে একবার কয়েকটি শিশুকে 'জুলিয়াস সীজারের' কাহিনী পড়াইয়া বলা হইয়াছিল, ইহার যেখানটা তোমার ভাল লাগে তাহা লইয়া ছবি আঁক। তাহারা ছবি আঁকিল। ছবির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল এইটাই, শিশুর মনেও কত রকমের নূতন নূতন পরিকল্পনা আসে, এবং সেই পরিকল্পনাকে ছবির মধ্যে রূপ দিয়া তাহারা বড়দের সমানই আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে। ছবিগুলি অবশ্য পাকা কাজ হয় নাই, হইবার কথাও নয়; কিন্তু অর্দ্ধ অসভ্য জাতিদের অঙ্কিত ছবিতে যে সহজ সারল্যের দেখা পাওয়া যায়, ইহাতে তাহা ছিল প্রচুর। কয়েকটি ছবির বর্ণনা দেওয়া গেল :—

সাড়ে-ন' বছরের একটি মেয়ে আঁকিল— "জুলিয়াস সীজার ব্রিটেন জয় করিতেছেন।" একটা রথে তিনি চড়িয়াছেন, রথের চাকাগুলি কাস্তের আকারের। তাঁহার পরনে নীলরঙের পরিচ্ছদ, আকাশের টুকরা টুকরা নীল রঙ তাহার সহিত তাল রাখিতেছে। দূরে একজন সৈন্য পতাকাদণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া খাড়া করিতেছে, পতাকাটায় ইংল্যাণ্ডের এন্‌সাইন চিহ্ন, তাহার উপর রোমান ঈগলের ছবি— লাল জমির উপরে কাল রঙে আঁকা! ছবির সামনের দিকে রোমান ও বৃটনরা হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের হাতে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা তরবারি।

আর একজন আঁকিল— "সীজারের মৃত্যুর পরে অ্যাণ্টনি বক্তৃতা দিতেছেন।" এই মেয়েটি বয়সে একটু বড়, সে স্থাপত্যশিল্পের নমুনা দেখাইল। প্রথমে একটি খিলান, তাহার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে

একটি পথ। সামনে অ্যাণ্টনি, কয়েক ধাপ সিঁড়ির মাথায় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। তাঁহার ভঙ্গিতে ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইতেছে। মঞ্চের নীচে রোমানদের জনতা, তাহাদের পরনে 'টোগা', তাহাদের ভাবে ভঙ্গিতে ভয় ও আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবির পিছন দিকে অ্যাণ্টনির ভৃত্য, সৈনিকের পোষাক পরিয়া তাঁহার ঘোড়াটি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অ্যাণ্টনির পিছনে মঞ্চের উপরে জুলিয়াস সীজারের মৃতদেহ, লাল চাদরে ঢাকা। এই ছবিটার বিশেষত্ব— সমস্ত কাহিনীটিই ইহার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি মেয়ে আঁকিল— "ক্যাল্‌পারনিয়া সীজারকে মিনতি করিতেছেন, তিনি যেন সেদিন সিনেটে না যান।" সীজার পরিচ্ছদে অস্ত্রে সুসজ্জিত, তাঁহার মুখে চিন্তা ও চাঞ্চল্য— কি করিবেন যেন বুঝিতে পারিতেছেন না। ক্যাল্‌পারনিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া দুইহাতে তাঁহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহার মুখ উঁচু, মুখে মিনতির রেখা। তাঁহার পরনে উজ্জল নীলরঙের ঢিলা নৈশ পরিচ্ছদ, মাথায় দীর্ঘ সোনালী চুলের রাশ খোলা, এই দু'টাতে ছবির রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়াইয়া দিয়াছে। এই মেয়েটির বয়স চৌদ্দ বছর। ছবিটিও বেশ ভাল আঁকা।

আর একজন আঁকিল— "ব্রুটাস্‌ ও পোর্শিয়া বাগানে বেড়াইতে-ছেন।" একটা লাল ইটের দেয়াল আছে, ফুলের গাছ আছে। মোটের উপর ছবিটায় বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না।

আর একজন আঁকিল— "ফোরাম'এর দৃশ্য।" সীজার বসিয়া আছেন, তাঁহার পরনে উজ্জল লালরঙের পরিচ্ছদ। ব্রুটাস্‌ তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া; আর সীজারের আসনের পিছনে দাঁড়াইয়া 'কাস্‌কা'; তাহার হাত প্রসারিত, হাতে ছোরা। কাস্‌কা বলিতেছেন, "Speak, hands,

for me!" সীজার বলিতেছেন, "Doth not Brutus bootless kneel?"

আর একজন আঁকিয়াছে—"শিবিরে জুলিয়াস ব্রুটাস্‌কে হার্প্‌ বাজাইয়া শুনাইতেছেন।" ব্রুটাস্‌ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, একটি টুলের উপরে বসিয়া, তাঁহার হাতে বই, বৃথাই পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন; জুলিয়াস তাহার সম্মুখে বসিয়া হার্প বাজাইতেছেন— সুন্দর তাঁহার আকৃতি। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুই প্রহরী, মেঝের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

আর একজন আঁকিয়াছে— "ক্লডিয়াস্‌ মেয়ে সাজিয়া মেয়েদের উৎসবে গিয়াছেন।" মেয়েদের চক্ষুগুলি খুব সুন্দর, প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া মশাল।

আরো একখানা ছবি— সীজার বিজিত গল্‌দিগকে তাঁহার রচিত ইতিহাস পড়িয়া শোনাইতেছেন, সীজারের দৃপ্ত মুর্ত্তি; গল্‌রা পাহাড়ের গায়ে সারি বাঁধিয়া ধৈর্য্য সহকারে শুনিতেছে।

এই ছবিগুলি হইতে আমরা একটা ধারণা পাই— একখানা বই পড়িতে পড়িতে তাহার বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন বর্ণনা লইয়া কতরকম কল্পনা, কতরকম ছবি শিশুদের মনে ভাসিয়া উঠে। সকলের মনে সকল কথা একরকম সাড়া তোলে না, তোলা স্বাভাবিকও নয়। তবু এতখানি যাহাদের কল্পনা চলে, তাহাদের সেই কল্পনাকে অনাহারে শুকাইয়া মারিলে চলিবে কেন? সেই কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে, বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, তাহাদেরে 'সংক্ষিপ্তসার' পড়াইলে চলিবে না; বাজে কথায় ভর্ত্তি, জলমেশানো কাহিনী শুনাইলে চলিবে না; সত্যকার ভাল বই ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে, যেন তাহারা পড়িয়া আনন্দ পায়, চিন্তার খোরাক পায়।

সেই খোরাক পাইলে শিশুর মনের যে সম্পদ বাড়ে, তাহার প্রকাশ

তাহারা নানাদিক দিয়া করে। গল্প বলে, ছবি আঁকে এবং আরো একটা কাণ্ড করে, ইতিহাসের দৃশ্য অভিনয় করে। তখন তাহারা নিজেরাই যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া প্রতাপাদিত্য বা মানসিংহ সাজিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে; অথবা একটা ছোট মঞ্চ বানাইয়া তাহাদের পুতুলগুলিকে সেইখানে দাঁড়া করাইয়া দেয়। এই পুতুলরা যে ভীম-দুর্য্যোধন বা চন্দ্রগুপ্ত-নন্দ। শিশুরা ষ্টেইজ সাজায়, সীন্ ফেলে ও তোলে এবং পুতুলদের মুখের কথাগুলি নিজেরাই বলিয়া যায়।

মনে যাহাই জমিল তাহাকে কোনপ্রকারে একটা বহিঃপ্রকাশ না দিতে পারিলে শিশু স্বস্তি পায় না। তাই এই সকল বহিঃপ্রকাশ, মনে তাহাদের কতটুকু চাঞ্চল্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই টের পাইবার নিদর্শন।

আমরা যেখানে বড় ভুল করি সেটা হইতেছে, ধরিয়া নেওয়া যে শিশুদের মনের জন্য বাহির হইতে খোরাক যোগাইবার প্রয়োজন নাই, যে খোরাক যেটুকু দরকার সে নিজে হইতেই যোগাড় করিয়া লইবে।

অতএব শিশুকে যা খুসি খানিকটা বাজে জলো গল্পের বই পড়িতে দিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। অথচ এটা অত্যন্ত রকম বাজে কথা, মিথ্যা কথা। শিশুর খোরাক দরকার হয়, খোরাক পাইলে সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে; করিয়া পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়। ইতিহাস ও গল্প বলিয়া সে যাহা পড়িবে, তাহার মধ্য দিয়াই তাহাকে সত্যকার ভাল জিনিস দিন, দেখিবেন তাহার কল্পনা কতখানি প্রখর ও উর্ব্বর হইয়া জাগিয়া উঠে। তখন দেখিবেন শিশুর মনের শক্তি কতখানি—যে ব্যাপারের একটু ইঙ্গিত বা আভাসমাত্র সে পাইল তাহাকে ফেনাইয়া কতখানি সম্পূর্ণ একটা ছবি সে খাড়া করিতে পারে। সেই কল্পনাকে অনাহারে রাখার অর্থ শিশুকেই শুকাইয়া মারা— নয় কি?

'চিত্রকলা'

শিশুদেরে চিত্রকলা শিক্ষা দিতে হইবে দুই ভাবে— তাহারা ছবি আঁকিতে শিখিবে, এবং অপরের আঁকা ছবির অর্থ ও রস গ্রহণ করিতে শিখিবে। নিজের আঁকা তো কাঁচা হইবেই; কিন্তু হাত তাহার যদি বা কাঁচা হয়, তাহার চক্ষু ও মনকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। অনেকে বলেন, শিশুরা ছবির কিছুই বোঝে না, তাহারা দেখে শুধু রঙের চকমকি আর ছবির মধ্যেকার গল্প। এই কথাটা কিন্তু সত্য নয়। শিশুই হউক আর বয়স্কই হউক, মানুষের মনের আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা অদ্ভুত। ভাল ছবি দেখিতে শিশুকে অভ্যস্ত করুন, দেখিবেন, তার অর্থ বুঝিবার মত, খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার মত, অন্তর্দৃষ্টি তাহার আছে। তবু যে শিশুরা রং-চকমকে বাজে ছবি পাইয়া খুসী হয়, তাহার কারণ—আমরা ঐ রকম ছবিই তাহাদের দিই। খারাপ খাদ্য খাইয়া খাইয়া তাহাদের চক্ষু ও মন সেই রকম খাদ্যেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। তবু সেই খারাপ ছবি সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে না; তাহার মধ্যেকার ত্রুটি ও বর্ব্বরতা তাহাকে পীড়া দেয়; ভাল ছবির সন্ধান পাইলে আর সে বাজে ছবি দেখিতে চায় না। তবুও যদি তাহাকে কেবলই বাজে ছবি দেখাইয়া তাহার রুচিকে আমরা খর্ব্ব ও বিকৃত করিয়া রাখি, সে অপরাধ কি তাহার, না আমাদের?

শিশুরা সত্যই ছবি দেখিতে জানে কিনা ইহা পরীক্ষা করা শক্ত নয়। তাহাদেরে একটা ভাল ছবি দেখিতে দিন, দিয়া জিজ্ঞাসা করুন কি দেখিল। দেখিবেন, তাহারা কত জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছে।

একবার ইংল্যাণ্ডের একটি স্কুলে কয়েকজন শিশুকে একজন ভাল শিল্পীর আঁকা কয়েকখানি ছবি দেখানো হইল। তারপর বলা হইল,

যার যেটা ভাল লাগিয়াছে তাহার বর্ণনা দাও ত! অতি চমৎকার বর্ণনা তাহারা দিল। দেখা গেল, তাহাদের চক্ষে প্রায় কিছুই এড়ায় নাই।

বছর ন'য়েকের একটি ছেলে বলিল:—"আমার ভাল লাগিয়াছে বীজবপনের ছবিখানি। একজন লোক ক্ষেতে বীজ ছড়াইতেছেন। ছবিটা প্রায় অন্ধকার, খালি ডানদিকে উপরের কোণে খানিকটা আলো। সেখানে একজন লোক জমিতে চাষ করিতেছে। সে হাল চালাইতেছে, আর আগের লোকটা বীজ ছড়াইতেছে। তাহার বাঁ হাতে একটা থলি, ডান হাতে করিয়া সে বীজ ছড়াইয়া দিতেছে। তাহার পায়ে কাঠের জুতা। সকালবেলা, বেলা ছ'টা আন্দাজ। লোকটার পায়ের চেয়ে মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। মাথার কাছে আলো পড়িয়াছে, মাটিতে পায়ের কাছে এখনও পড়ে নাই।" আলো কতটুকু পড়িল তাই দেখিয়া যে বলিতে পারিল এটা কোন্ বেলার ছবি। তবু বলিতে চান—সে ছবি দেখিতে জানে না?

সাত বছরের একটি মেয়ে বলিল:—"আমার ভাল লাগিয়াছে প্রার্থনার ছবিখানা। মাঠে লোকেরা কাজ করিতেছে—একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে; মেয়েটির পাশে একটা ঝুড়ির মধ্যে কি যেন আছে। তাহার পিছনে একটা ঠেলাগাড়ি। লোক দু'টি প্রার্থনা করিতেছে—পুরুষটি তাহার টুপিটা খুলিয়া হাতে রাখিয়াছে। ঠেলা গাড়ী আর ঝুড়িটা শস্যে ভরা দেখিলেই বোঝা যায় এটা বিকালবেলা।" এই শিশুর চক্ষু নাই? এইভাবে ছবি দেখিয়া ছবির খানিকটা কথা অন্তত তাহাদের মনে থাকে। কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। বিশেষ একটা ছবি মনে থাকুক বা না থাকুক তাহাতে আসে যায় না; ছবি দেখিবার ফলে তাহাদের দেখিবার চক্ষুটারই উন্মেষ হয়; সেইটাই বড় কথা।

সেই চক্ষু খুলিতে হইলে তাহাকে নিয়মিত ভাবে ভাল ভাল ছবি

দেখাইতে হইবে। হঠাৎ কবে, কোথায়, কখন একখানা ভাল ছবি তাহার চক্ষে পড়িবে, সেই ভরসায় বসিয়া থাকিলে চলে না। রীতিমত সময় করিয়া এক-একজন বড় শিল্পীর আঁকা ছবি পালা করিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে। দেখিবেন, প্রতি শিল্পীর কি বিশেষত্ব তাহা ধরিয়া ফেলিতে তাহার সময় লাগিবে না, এবং সেই বিশেষত্ব লক্ষ্য করার চক্ষু তাহার নিজেরই মধ্যে জাগিবে।

শিশুকে রঙীন ছবিই দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। একরঙা ছবিও তাহার ভাল লাগে। রঙের খেলা সে পৃথিবীতে চারপাশেই অহরহ দেখিতেছে, ছবির মধ্যেও রঙের বাড়াবাড়ি না দেখিলে সে ক্ষুণ্ণ হইবে না। ছবি একরঙা হোক, খালি পেন্সিল বা কালির আঁকা হোক, ক্ষতি নাই; কিন্তু ছবি যেন ভাল হয়। এক-একজন বড় শিল্পীর আঁকা ছবি তাহাকে দেখাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কিঞ্চিৎ দরকারী খবর জানাইবেন। ইঁহার ছবির বিশেষত্ব কি দেখিতেছ? জন্তু-জানোয়ারের ছবি ইনি খুব ভাল আঁকেন, না? নিজেও খুব জন্তু ভালবাসিতেন; তাই ইঁহার আঁকা কুকুরের ছবিও খুব ভাল হইত। যাহাকে ভাল না বাসা যায়, যাহাকে ভাল করিয়া দেখা বা চেনা না যায়, তাহার ছবি আঁকাও যায় না তো।

এক এক যুগের ছবির বিশেষত্ব তাহাকে দেখাইবেন। "যে সময়ের কথা ছবিতে আঁকা হইয়াছে, দেখিয়াছ, তখনকার লোকদের পোষাক কি রকম? সে দেশের লোকগুলির রঙ্ কি রকম? ঐ রকম বসিয়া তাহারা নমস্কার করিত।"

ছবি আঁকিতে শেখার আরম্ভ অনেক সময় শিশু করে রঙ্ দিয়া। তুলি দিয়া কাগজে রঙের পর রঙ্ বুলাইতে তাহার মজা লাগে। অবশ্য তাই বলিয়া রঙ্ ছাড়া ছবি যে সে আঁকিতে চাহিবে না এমন নয়। বরং রঙ্ মিশানোটা শক্ত ব্যাপার, এক-রঙা ছবি আঁকা সহজ।

কি আঁকিবে তাহা লইয়া চিন্তায় পড়া নিরর্থক। ছবির বিষয়-বস্তু পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে, আঁকিলেই হইল। রাস্কিন এই সম্বন্ধে চমৎকার একটি কথা বলিয়াছেন :—

রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিতেছি, চক্ষুটা অলসভাবে রাস্তার ধারের একটা বাঁকা ডালের উপর পড়িতেছে। গল্প সারা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম, ক'দিন পরে কি গল্প করিয়াছিলাম সে কথা, এমন কি গল্প যে সেখানে দাঁড়াইয়া করিয়াছিলাম সেই কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই ; কিন্তু একটা জিনিষ ভুলি না, সেটা সেই ডালখানা। ভবিষ্যতে বহু বছর পরেও ঐরকমের আর একখানা বাঁকা ডাল চক্ষে পড়িতেই মনটা খুসী হইয়া উঠে ; যেন পুরানো পরিচিত বন্ধুর দেখা পাইয়াছি। মনের মধ্যে এই ছবি আমরা ধরিয়া নিই, অজ্ঞাতসারেই নিই ; তারপর হাজার চেষ্টাতেও আর সে ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারি না। মনের মধ্যে ছবি আঁকিয়া নিবার এই প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। মনের মধ্যে যে ছবি অক্ষয় হইয়া আঁকা হইয়া গেল, তাহাকে কাগজে আঁকিয়া ফেলাই কি খুব শক্ত ?

শিশুদেরে আঁকিতে শিখাইবার সময় এইটাই হইবে প্রথম পাঠ। আগে তাহার মনের মধ্যে ছবি আঁকিতে শিখুক। তারপর সেই ছবি কাগজে আঁকিতে শিখিবে। অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই মনের মধ্যে ছবি তাহাকে আঁকিতে হইবে। যে কোন জিনিষ তাহার চক্ষে সুন্দর লাগিল, তাহার দিকে কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখুক ; তারপর সে তাহাকে কাগজে আঁকিতে পারিবে। ফুলপাতা, ডাল, জীবজন্তুর সুন্দর সুন্দর ছবি এইভাবে শিশুরা আঁকিয়া ফেলে। কলাজ্ঞান শিশুর মনেই থাকে, তাহাকে শুধু জাগাইয়া তুলিতে হয়। যে কোন জিনিষ—একটা কচি ডাল, একটা ফুলের কুঁড়ি, তাহার হাতে দিন ; তাহার বিশেষত্ব, তাহার

মধ্যে রঙ ও রেখার বিন্যাস, সে নিজেই লক্ষ্য করিবে। আঁকিবার সময়ও তাহাকে বেশী সাহায্য করিবেন না। তাহার রেখাপাত কোথায় হইবে তাহা সে নিজেই স্থির করুক। যাহা দিয়া আঁকিয়া সে আরাম পায় তাহা দিয়াই আঁকিতে পারে—সেটা রঙই হউক, আর কয়লাই হউক। পেন্সিল দিয়া আঁকিতে দিবেন না, পেন্সিলে আঁকা শক্ত। রং যদি তাহাকে কিনিয়া দেন, সস্তা রং-এর বাক্স তাহাকে দিবেন না। সস্তা দিয়া তাহাকে ঠকাইলে লাভের মধ্যে তাহার মন ও জ্ঞান বিকৃত হইবে। ভাল রং কয়েকটা কিনিয়া দিন, রঙের দাম শিশুর মনের দামের চেয়ে বেশী নয়। যে রঙ কাগজে ফলাইয়া শিশু নিজে মুগ্ধ না হইবে, সেই কাদামাটি রং দিয়া তাহাকে আঁকিতে বলার অর্থ তাহার উপরে শাস্তি চাপানো। আঁকার মজাই সে পাইবে না, শেষে আঁকিতেও চাহিবে না। ছবি যদি সুন্দরই না হইল তবে আঁকিতে মন উঠিবে কেন? রঙের দোষে ছবি কুৎসিত না হয়, সে দিকে তাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে যদি মাটি দিয়া পুতুল-গড়াও তাহাকে শিখানো যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। মাটি সে ছানিয়া তৈয়ারী করিবে; তাহার মধ্যে খোঁচা-কাঁকড় বা হাওয়ার বুদ্‌বুদ থাকিলে চলিবে না, সে জ্ঞান তাহার হউক। তারপর তাহার সামনে কলা, আতা, আপেল, আম দিয়া সেইরকম ফল মাটি দিয়া গড়িতে বলিবেন। কিম্ভূতকিমাকার বস্তু গড়িলে চলিবে না, প্রতিটি অংশ ঠিক হওয়া চাই। দেখিবেন, তাহার চক্ষু বেশ তীক্ষ্ণ; কলার গায়ের শীর, আতার গায়ের বুটিগুলি, আমের তলার চিবুক, সে ঠিক দেখিয়া দেখিয়া গড়িবে।

'সঙ্গীত'

এতটুকু বই-এ সকল কথা বলা অসম্ভব ; তাই, বলা উচিত ছিল এমন অনেক কথাই বলা গেল না।

সঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আরো একটি কথা আছে ; সঙ্গীত বস্তুটা পছন্দের ব্যাপার, মায়ের নিজের মনে যদি তাহার চেতনা না থাকে, তবে বলিয়াও লাভ নাই।

সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথাই এখানে বলিব। শিশুকে যদি সত্য সত্যই গান শিখাইতে চান, প্রকৃত গুণীর কাছে শিখাইবেন। তাঁহারা নিজেরা ইহার সাধনা করেন, ইহার মর্ম্ম বোঝেন, ইহাকে ভাল বাসেন। তাঁহারাই অপরকে শিখাইবার অধিকারী। সস্তা পেশাদারের হাতে গানের প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়ার মত ভুল আর নাই। তাহারা শুধু চীৎকার করাইয়াই শিশুকে ক্লান্ত করিয়া তুলিবে, তাহার কণ্ঠ ও ভঙ্গি বিকৃত করিয়া দিবে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, তাহার সঙ্গীতের রুচিকেই বিকৃত করিয়া দিবে। সঙ্গীতে আর সে রস পাইবে না। সহজে সুর আয়ত্ত করার একটি সুন্দর উপায় আছে, ইহার নাম Tonic Sol-fa পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি স্বর ও ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইঙ্গিত বা মুদ্রা শিখানো হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে শিশু তাহার স্বরলিপি ও 'হস্তলিপি' শিখিতে পারে। ইহাতে শেখা ও মনে রাখা সহজ হয়। ভারতের প্রাচীন ওস্তাদদের মধ্যেও সুরের সঙ্গে সঙ্গে হাতে মুদ্রার ব্যবহার আছে ; এই মুদ্রাই 'স্বরলিপির' কাজ করে। গান শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাতের ভঙ্গিতে সুরটা ধরিয়া নেয়, কান ও গলায় একই সঙ্গে সুরটা অভ্যাস হইয়া যায়।

এইভাবে বাদ্যযন্ত্রের জ্ঞানও সহজে জন্মানো যায়। যন্ত্র লইয়া 'সা রে গা মা' করার সার্থকতা আছে; কিন্তু শিশুর পক্ষে সেটা বিরক্তিকর কাণ্ড। তার চেয়ে শুধু শুধু যন্ত্র লইয়া বসিয়া যদি সে গানের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কানে সুর ধরিয়া যন্ত্রে সেই ধ্বনি তুলিতে শেখে, তবে সহজেই তাহার বাজনা অভ্যাস হইয়া যায়। ইহাতে কান ও হাতের কাজ একসঙ্গে অভ্যাস হয়, 'সা রে গা মা' সাধিবার ক্লান্তিকর পরিশ্রমও করিতে হয় না।

'ড্রিল' ও কারুশিল্প

আর দুইটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিব :—(১) ড্রিল্, এবং (২) হাতের কাজ বা কারুশিল্প। শিশুর শিক্ষার এই দুইটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

'ড্রিল্' অর্থে একত্রে ব্যায়াম ও চলাফেরা অভ্যাস করা। শরীরকে চট্‌পটে করার দিক দিয়া 'লিং'-এর প্রবর্ত্তিত 'সুইস্ ড্রিল্' চমৎকার জিনিষ। ইহার অনেকগুলি ন'-বছরের কম বয়সের শিশুরাও করিতে পারে। খালি ড্রিল্ জিনিষটা বিরক্তিকর লাগিতে পারে, তাহার সহিত একটু নাচ, গান বা খেলা মিশাইয়া লইলে ড্রিলটা অতি সহজেই আয়ত্ত হইয়া আসে। এইদিক দিয়া ভারতে ও বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত 'নমস্কার ব্যায়াম', স্কাউট ড্রিল ও স্কাউটদের খেলা, প্রফেসর নায়ডুর ব্যায়াম-পদ্ধতি, মণিপুরী নাচ, অথবা ব্রতচারী নৃত্য সুন্দর জিনিষ।

ন'-বছরের কম বয়স্ক শিশুরা যে-সকল কারুশিল্প অভ্যাস করিতে

পারে, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ আমি এই গুলির নাম করিব :— পাটি বুনানো, ঝুড়ি বুনানো, পর্দ্দা বানানো, কাঠ খোদাই, সেলাই, উলবোনা, ইত্যাদি।

শিশুদের শেখানোর ব্যাপারে এই ক'টি কথা মনে রাখা দরকার :—

(ক) কোন জিনিষ বানাইতে হইলে সত্য জিনিষই বানাইবে। কাগজের ফালির পাটি বুনাইয়া কাজ হয় না।

(খ) যা করিবে, ধীরে-সুস্থে এবং ভাল করিয়া করিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া আধা-খিঁচড়া কাজ করা উচিত নয়।

(গ) কাজের কোন অংশে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, কাজ সর্ব্বত্র সমান হওয়া চাই।

(ঘ) যে কাজ শিশুদের পক্ষে করা সম্ভব তাই তাহারা করিবে; অতিরিক্ত শক্ত বা সূক্ষ্ম কাজ তাহাদের ঘাড়ে চাপানো চলিবে না।

শিশুদের শিক্ষা কোন্ পথে চলা উচিত, তাহার কিছুটা আভাস দিলাম, ইহা হইতে আশা করি একটা কথা স্পষ্ট হইবে—শিশুকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে তাহার পিছনে কতখানি যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া দরকার; তাহার শিক্ষকের কতখানি শিক্ষিত, যোগ্য ও অবহিত হওয়া দরকার। শিশুর হাতে নির্ব্বিচারে যা খুসী কতকগুলি বাজে বই তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার আগে, অশিক্ষিত অলস নার্স্ বা মাষ্টারের হাতে শিশুকে গড়িয়া তুলিবার সমস্তখানি ভার, সমস্তখানি স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার আগে, মায়েরা যেন একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন, সত্যই এইভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া তাহার পক্ষে কল্যাণকর কিনা।

ষষ্ঠ ভাগ

ইচ্ছাশক্তি—বিবেক—ঈশ্বরচেতনা

১। ইচ্ছাশক্তি বা মনের বল

পৃথিবীর জীবন যিনি ভালভাবে কাটাইয়া যাইতে চান, পরকালে যিনি পূর্ণতর শান্তি চান, তাহার কাছে একটি বস্তু অপরিহার্য্য— সেটি মানুষের মনোরাজ্যের সুশাসন। প্রত্যেক শিশুই বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনের অধিকার পায়। পিতামাতার কর্ত্তব্য তাহাকে সুশিক্ষিত করা, যেন সে এটা ঠিকমত করিতে পারে। সাধারণ রাজ্য যেভাবে শাসিত হয়, চিত্তরাজ্যেও প্রায় সেইভাবেরই ব্যবস্থা। ইহাতেও তিনটি কর্ম্মবিভাগ আছে, আইন করা, আইন প্রয়োগ করা, এবং বিচার করা। এই তিনটি বিভাগের সহযোগিতায় চিত্তরাজ্য শাসিত হয়। তবে এখানে মন্ত্রী কয়েকজন নহেন, একজন মাত্র। শাসন করার ভারটা (Executive) মন বা ইচ্ছার উপরে। তাহার সৈন্যসামন্ত আছে। সে ইহাকে বলে "যাও"—সে যায়। উহাকে বলে, 'আইস"—সে আসে। আরেকজনকে বলে "এইটা কর"—সে করে। "মন" বা "ইচ্ছা" সকল ইন্দ্রিয়কে ও সকল প্রবৃত্তিকে হুকুম করিয়া চালায়। "মন" যদি সবল হয়, যদি দৃঢ়-স্বরে আদেশ করিতে পারে, তবে ইন্দ্রিয়রাও আদেশ মানে; রাজ্য সুশৃঙ্খল থাকে। আর মন যদি দুর্ব্বল হয় বা অস্থির-বুদ্ধি হয়, তবেই বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার ধাক্কায় মনোরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

"মন" বস্তুটা কি, এককথায় বলা শক্ত। এটাকে বোঝা যায়; ব্যাখ্যা করা বা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অথচ এইটাকে ঠিকমত যিনি না

বুঝিবেন, শিশুকে শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি পদে পদে ভুল করিবেন, শিশুর ক্ষতি ঘটাইয়া বসিবেন। অতএব মনের সংজ্ঞা যদি দেওয়া না-ও যায়, তাহার কাজ কি এবং তাহার শক্তির সীমা কোন্ পর্য্যন্ত, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতে পারে।

একটি কথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার, শিশুর যে বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লইয়া আমরা এতক্ষণ কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তাহার "মন" বা "ইচ্ছা" বিশেষ না-ও জাগিয়া থাকিতে পারে।

শিশু চিন্তা করে, কল্পনা করে; জ্ঞান চায়, শক্তি চায় মর্য্যাদা চায়; ভালবাসে, রাগ করে, শ্রদ্ধা করে; মনোযোগ, বাধ্যতা, কর্ম্মঠতা বা অলসতা অভ্যাস করে; কিন্তু সমস্তই করে বিনা সংকল্পে। এগুলি "করিতেই হইবে", এমন কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থির সঙ্কল্প লইয়া সে চলে নাই। সে অভ্যাস "করে" নাই, তাহার অভ্যাস "হইয়া" গিয়াছে। সমস্ত জীবন ধরিয়া বাঁচিয়া গেল অথচ কোথাও সংকল্প বা ইচ্ছা শক্তির পরিচয় দিল না, এমন মানুষও থাকে। একদিকে দেখি সাদাসিধা ভাল-মানুষের দল,—ভাগ্য ভাল তাই খাইয়া পরিয়া স্বচ্ছন্দ আরামে জীবন কাটাইয়া দিতে পারে, সংকল্প বা "ইচ্ছা" করিয়া কিছু করারই ইহাদের দরকার হয় না। আর এক দিকে আছে হতভাগ্যের দল—অদৃষ্ট ও পরিবেশ ইহাদেরে পাপ হইতে রক্ষা করে নাই, সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহারা ভাসিয়া গিয়াছে, প্রবল মনোবলের পরিচয় ইহাদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। বুদ্ধি প্রখর হইলেই যে মনের বলও বেশী হইবে এমন কোন কথা নাই। কবি কোল্‌রিজের কথা আমরা জানি—তাঁহার মনের শক্তি এত কম ছিল যে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে হইত অন্য লোকের। অত বড় কবি, অত বড় লেখক; কিন্তু না ছিল তাঁহার নিজের চিন্তার উপরে সংযম, না ছিল কাজের উপর সংযম। "ইচ্ছা" করিয়া

তিনি প্রায় কিছুই করিতেন না। লোকে ভীড় করিয়া তাঁহার কথা শুনিতে যাইত—বড় সুন্দর, ঝর্‌ঝরে, কবিত্বপূর্ণ কথা তিনি বলিতেন। কিন্তু সে কথা আর কিছুই নয়, মনের মধ্যে যে চিন্তাধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহারই অবিশ্রাম উচ্চারণ। সে-চিন্তা বুঝিয়া শুঝিয়া করা চিন্তা নয়; একটার পর একটা কথা পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িতে থাকিত, তাই তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত ছিল, তাই তাঁহার কথাগুলা সুসংবদ্ধ হইত, কিন্তু সেটা একান্তই "হইয়া যাওয়ার" ব্যাপার। কোল্‌রিজের নিজের তাহার উপর কোন হাত থাকিত না। অথচ চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তার শক্তি যদি কিছু থাকে, সেটা আসে মনের বল হইতে। এককথায় বলা যায়, "চরিত্র" জিনিষটাই গঠিত হয় 'ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাজ' দিয়া। আমরা বলি—"এই লোকটার চরিত্রবল অদ্ভুত", "ও লোকটার মোটেই চরিত্রবল নাই।" আসলে যাহা বলিতে চাই তাহা হইতেছে, "এই লোকটার মনে দুর্জ্জয় শক্তি আছে," "ও লোকটার মনে কোন শক্তি নাই।" বহুগুণে বহু-বিদ্যায় ভূষিত মানুষের জীবন শুধু বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির অভাবে নষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল, এমন দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখিতে পাই।

মনের কাজ তিনটা। প্রবৃত্তি ও উচ্ছ্বাসকে সে দমন করে, শারীরিক ক্ষুধার উপরে প্রভুত্ব করে, এবং আমাদের বাসনাকে চালনা করে। মনে রাখিবেন, প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনার সৃষ্টি মন করে না; সেগুলি দেহের সঙ্গে জীবনের সঙ্গেই জন্মায়। মন এইগুলির উপর প্রভুত্ব করে এবং সেই প্রভুত্ব করিতে গিয়াই নিজে শক্তি সঞ্চয় করে। প্রবৃত্তিকে যতটা জোর দিয়া সংযত করিতে পারিব, মনের জোরও ততই বাড়িবে। মন বস্তুটা দৈহিক নয়, তবু দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই নিয়মিত পুষ্টি, কাজ ও ব্যায়ামের ফলে ইহার শক্তি-সামর্থ্য বাড়ে। উপন্যাসে "দুর্ব্বৃত্ত" লোকের চরিত্র যে ভাবে আঁকা

হয়, সেটা দেখিবার বস্তু। "দুর্ব্বৃত্ত" লোকটার মনে প্রচণ্ড শক্তি, কিন্তু সেই শক্তিকে প্রবৃত্তির দমনে না লাগাইয়া সে বরং প্রবৃত্তির সাহায্যে লাগাইতেছে। এটা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম, তবু অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষের যে অঙ্গকে বিনা কাজে বসাইয়া রাখা হইবে সে-ই ক্রমে বলহীন হইয়া পড়িবে। মন যদি সময়ে প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে না শেখে, ক্রমে প্রবৃত্তিগুলির শক্তি ও সাহস বাড়িয়া যাইবে। তারপর রাজ্যে বিদ্রোহ হইলে যাহা হয় সেই কাণ্ডই ঘটিবে। প্রজারাই বিদ্রোহী হইয়া শাসকদেরে বন্দী করিবে, তাহাদের ইচ্ছায় চলিতে বাধ্য করিবে। শাসকদের হাতের শক্তি তখন প্রজাদের দুষ্ক্রিয়ার সহায়ক হইবে।

এই কথাটার দিকে আমি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ঔপন্যাসিক তাঁহার দুর্ব্বৃত্তের চরিত্রে যে কথাটা ধরিয়া নেন, অনেক সময়ে পিতামাতারাও সেইটা ধরিয়া নেন তাহাদের শিশুদের সম্বন্ধে। "প্রবল ইচ্ছা" মাত্রকেই তাঁহারা "সবল-মনের" পরিচয় বলিয়া মনে করেন। শিশুর "মনের জোর" থাকুক, এটা তাহারা চান; চাওয়াই উচিত। মনের জোর না থাকিলে শিশু জীবনে কখনও বড় হইতে পারিবে না। কিন্তু মনের জোর আর একগুঁয়েমি ত এক কথা নয়। বাচ্চা শিশুকে একটা পুতুল দেওয়া হয় নাই, সে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় তুলিল। মা পুলকিত হইয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ, জিদ বটে ছেলের।" তিন বছরের খোকা রাস্তার মাঝখানে খুঁটি হইয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে—সে দাইয়ের সঙ্গে যাইবে না, কিছুতেই না। কেন? "জিদ বটে ছেলের!" তাহার ইচ্ছামত আর সকলকে চলিতে হইবে, খেলিতে হইবে, বোনের পুতুলগুলা সে কাড়িয়া নিবে, এবং না পাইলে অনর্থ করিবে। ইহার পরই বাধে সংগ্রাম। বাবা মা দৃঢ়স্বরে বলেন, শিশুর মনকে বাধা দিতে নাই, অতএব ইহাকে শাসন করার কথা উঠিতেই পারে না। শিশুর সমস্ত

প্রবৃত্তি অবাধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চলিবে? "চলুক. কি করিব!" অন্যদিকে শুভ-বুদ্ধি বলে, এরূপ ক্ষেত্রে যেমন করিয়া হউক শিশুর এই জিদকে ভাঙিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সেইটা করিতে গেলেই শিশুর উপর পড়ে শাসন ও শাস্তি। অথচ এই কথাটাই কাহারও লক্ষ্য হয় না, শিশুর সত্যকার ব্যাধি যা ঘটিয়াছে সেটা ইচ্ছাশক্তির অভাবে। শিশু নিজের মনকে শাসন করিতে পারে না, প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে পারে না, তাহার প্রবাহে ভাসিয়া যায়। আমরা বলি, এটা তাঁহার একগুঁয়েমি। কথাটা ভুল; "গোঁ" বা মনের দৃঢ়তাই তাহার নাই। "গোঁ-শূন্য" বলিলে বরং প্রকৃত অবস্থাটি ঠিকভাবে বুঝান যায়। মনের দৃঢ়তা ও মনের দুর্ব্বলতার মধ্যে এই তফাৎ করিতে না পারিয়াই অনেকেই বিপদ বাধান। শিশুর মনকেও শিক্ষা দিয়া ব্যায়াম করাইয়া তবেই সবল করিয়া তুলিতে হয়। প্রবৃত্তির প্রাবল্যকে মনের জোর বলিয়া ভুল করিয়া ইঁহারা নিশ্চিন্ত হন। শিশুর মনকে উন্নত ও সবল করার দিকে দৃষ্টি দেন না। ফলে শিশুর জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা, সমস্ত আশা নষ্ট হইয়া যায়। মন ও ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের দান; ইহারই উপর ভর করিয়া মানুষের সকল শক্তি, সকল ক্ষমতা, সকল পটুতা ও সৌন্দর্য্য বিকাশলাভ করে। মনই যদি শক্তিহীন হইল তবে সেই ক্ষমতা শক্তি পাইবে কি করিয়া? এই একগুঁয়েমি বস্তুটা কি? আর কিছুই নয়, প্রবৃত্তির উদ্দাম অসংযত গতি। প্রবৃত্তি বা কামনা-রূপ অশ্বের মুখের লাগাম হইতেছে ইচ্ছাশক্তি, সে-ই তাহাদের সংযত রাখে। সেই লাগাম খুলিয়া নিন, অসংযত প্রবৃত্তি উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিবে। তাহার পিঠে চড়িয়া শিশুও তীরবেগে ছুটিয়া চলিবে সর্ব্বনাশের পিছল পথে, আর তাহার ফিরিবার উপায় থাকিবে না। একবার লাগাম আলগা করিয়া দিলে আর প্রবৃত্তিকে বশে আনা অসাধ্য ব্যাপার; তাহার শান্তি নাই, তাহার ছোটার শেষ

নাই। প্রবৃত্তির বশে এইভাবে বাধাবন্ধহীন হইয়া ছুটিয়া চলার নামই "একগামিতা বা একগুঁয়েমি"। স্নেহান্ধ পিতামাতা মনে করেন, এটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয়। আসল কথাটা ঠিক তার উল্টা। ইচ্ছাশক্তির অত্যন্ত অভাব বলিয়াই এটা ঘটিতে পারে। ইচ্ছাশক্তি থাকিলে সেই শক্তিই এই প্রবৃত্তিকে রাশ টানিয়া ফিরাইতে পারিত, চরিত্রটাকে একটা ভারসাম্য ও গুরুত্ব দিয়া খাড়া রাখিতে পারিত। ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়াই সেই চরিত্র এমন করিয়া অব্যাহত গতিতে অধঃপাতের ঢালু পথ বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইচ্ছাশক্তির কাজ দুইরকম। একটা তাহার "নৈতিক" কাজ, যেটা দিয়া আমরা সঙ্কল্প করি, ভালমন্দ বিচার করি। আরেকটা তাহার "দৈহিক" কাজ, যেটা দিয়া আমরা ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িচাড়ি, চালাই। এই দ্বিতীয় কাজটা অনেক অংশে যান্ত্রিক।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তি থাকাটাই নৈতিক বলেরও পরিচয় নয়। প্রবৃত্তি ও বাসনাকে দমন করিয়া প্রচুর মনোবলের পরিচয় দিতেছে, অথচ আসলে মোটেই নীতিজ্ঞান তাহার নাই, এমন লোক থাকিতে পারে। হয়ত বাহিরের চেহারা বজায় রাখিবার জন্যই সে আত্মশাসন করিতেছে। হয়ত অপর কাহারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে। মনের বল তাহার আছে, কিন্তু নৈতিকবল সেটাকে বলা যায় না।

তেমনি আবার সাধু-জীবন যাপন করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি যে থাকিতেই হইবে, এমন কথা নাই। তবুও সত্যকার মহৎ জীবন পাইতে হইলে মনের দৃঢ়তা না থাকিলে চলিবে না। শুধু প্রবৃত্তির পীড়নের জন্য নয়, সৎকাজের সঙ্কল্প অটুট রাখিবার জন্যই সেই বলের প্রয়োজন। মনের বল না থাকিলে কেহ গর্ডন্, ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্, সেইণ্ট্ পল হইতে পারে না; বিদ্যাসাগর অথবা মহাত্মা গান্ধী হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে

সৎপ্রবৃত্তি যদি থাকে, এবং সঙ্কল্প যদি না-ও থাকে, তবু ঈশ্বর নিজেই তাহাকে দিয়া কিছু কিছু সৎকাজ করাইয়া নেন। কিন্তু মনের বল তাহার থাকিলে তবেই সে হয় অজেয়; তখন সে দুর্নিবার শক্তিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে, তখনই সে সত্যকার মহৎ কাজ করিতে পারে।

চিত্তরাজ্যে "সঙ্কল্প" কি কি কাজ করে? নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করুন, "যেটা তুমি চাহিতেছ, নিজেকে সেটা করিতে বাধ্য করিতে পার না?" তবেই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। সবসময়ে আমরা হয়ত কিছু চাইও না। তবু সৎকাজের প্রবৃত্তিটা মনের মধ্যে থাকে। দ্বিধা, সঙ্কোচ, বাধা-বিপত্তি থাকে। সেই দ্বিধা, সেই সঙ্কোচকে জয় করিয়া নিজেকে কাজটা "করিতে বাধ্য করা" চাই। তাহাতে শক্তি লাগে। "সঙ্কল্প" সেই শক্তি। যেটা আমরা করিতে "চাই" মাত্র, সঙ্কল্প আমাদেরে ঠেলিয়া দিয়া সেটা করাইয়া ছাড়ে। সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখে। কি ভাবে সে কাজ করে? "ইহা কর", "ইহা করিও না", বলিয়া আদেশ দেয় এবং কঠোরহস্তে তাহাকে সেই আদেশ পালিতে বাধ্য করে? না। যুক্তিতর্ক দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, এটা করা কেন অন্যায় বা ন্যায়? তাহাও না। ইহার চেয়েও অনেক সহজ উপায়ে সে নিজের কাজ করিয়া যায়।

ছোট শিশু আছাড় খাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া উঠিল। মা যদি তাড়াতাড়ি সেইখানটাতে ফুঁ দিতে যান, 'আহা বাট্' বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যান, তবে সে আরও জোরে কান্না সুরু করে। বুদ্ধিমতী মা তাই সেটা করেন না। তিনি তাড়াতাড়ি তাহার মনটাকেই অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিতে চান, যেন আঘাতটা সে ভুলিয়া যায়। জানালার কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে বলেন, "ঐঃ—ঘোড়া। ঘোড়ায় কে চড়্‌বে? খোকন।" খোকন আর কাঁদে না।

আমাদের প্রবৃত্তিকে লইয়াও মন ঠিক এই কাণ্ডই করে। যখনই কুপ্রবৃত্তি জাগে, মন তখন মনোযোগটাকে সেখান হইতে ঘুরাইয়া নিয়া অন্য জিনিষটার উপর ফেলে, আমরা অনায়াসে প্রবৃত্তিকে এড়াইয়া যাই। ইচ্ছামত এইভাবে একবস্তু হইতে অন্যবস্তুতে মনোযোগ লইয়া যাইতে মনের জোর লাগে, তাই এখন শক্তির প্রয়োজন। অন্যায়ের পথে, ভুলের পথে, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি ছুটিয়া চলিয়াছে, শক্তিমান লোক সেই প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়। তাহার প্রবৃত্তি ও কামনা তাহার নিজের ইচ্ছায়, তাহার নিজের ইঙ্গিতে চলে, তাহাকে টানিয়া লইয়া চলে না। তাই সৎপথে থাকিতে, সৎপথে চলিতে, তাহার কষ্ট হয় না।

মনে মনে কথা বাড়াইয়া চলিলে সে-কথার শেষ হয় না। কাহারও উপর রাগ হইল,—"কেন সে এমন করিবে, অত্যন্ত ইতর লোক", ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া মনে মনে তাহাকে গালাগালি করিলে রাগের নিবৃত্তি হয় না। বরং ক্রমেই সে বাড়িয়া চলে। তাহার চেয়ে মনে করুন, তাহার উপর রাগ করিয়া নষ্ট করার মত সময় আমার নাই। ভাবুন, কাল যে চিঠিখানা পাইয়াছেন তাহার উত্তর কি লিখিবেন; যে বইখানা পড়িতেছেন তাহার কি বিশেষত্ব আছে; দেখিবেন, রাগ শান্ত হইয়া যাইবে। আর একবার যখন সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়িবে তখন আর আপনার মনে উত্তেজনা নাই; তখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারিবেন অপরাধ সেই লোকটার কতটুকু, আপনারই বা কতটুকু। শুধু মনের উত্তেজনা নয়, দেহের কামনা এবং উত্তেজনারও নিবৃত্তি এইভাবে করা যায়। একই কাজ বা চিন্তা সারাক্ষণ করিতে করিতে আমাদের মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে; তখন আর কিছু ভাল লাগে না, জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠে। মনে যাহার জোর আছে, তিনি এই শ্রান্তি এড়াইতে পারেন, ইচ্ছামত মনকে ঘুরাইয়া নূতন

বিষয় নূতন বস্তুর উপর স্থাপিত করিতে পারেন। তাঁহার মনের শান্তিও অটুট থাকে, কোন কাজই তাঁহার কাছে "অসাধ্য" বা কঠিন বোধ হয় না।

মন যখন শ্রান্ত হয়, কিংবা কুপ্রবৃত্তি যখন জাগে, তখন কি করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে হইবে সেই কৌশল সকলেরই জানা দরকার। শিশুকে সেই কৌশল শিখাইবেন। রাগ হইয়াছে? অন্যকথা ভাব। যেটা তোমার পাওয়া উচিত নয় তাই পাইতে ইচ্ছা করিতেছ? অন্যকথা ভাব। অন্যায় হইতে ন্যায়ের দিকে, অকল্যাণ হইতে কল্যাণের দিকে, ইচ্ছা করিলেই তুমি নিজের মনকে ফিরাইতে পারিবে। সেই শক্তি তোমার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। সংসারে বড় যাহারা হয়, বলবান যাহারা হয়, তাহাদের সাফল্যের গুপ্তমন্ত্র এইটিই,—তাহারা ইচ্ছামত যে-কোন জিনিষ ভাবিতে পারে, ইচ্ছামত যে-কোন জিনিষ না-ভাবিতে পারে। ইচ্ছাশক্তির এই প্রয়োগের মূলে থাকে মনোযোগ। যে একদিকে মনকে নিবিষ্ট করিতে না পারে, সে অন্যদিক হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিতে বা ফিরাইয়া রাখিতেও পারে না। নূতন কথা লইয়া সে ভাবিতে আরম্ভ করিল, দুই মিনিট না কাটিতেই তাহার সেই মনোযোগ টুটিয়া গেল, আবার তাহার মন পুরানো অবাঞ্ছিত কথাটার উপর গিয়া পড়িল। মনকে ফিরাইবার চেষ্টা তাহার সফল হইল না। মনের বল বাড়াইবার প্রথম কথা তাই মনোযোগ।

আরেকটা বড় জিনিস, অভ্যাস। যেটা আমরা করিতে ভাবিতে অভ্যস্ত, আমাদের দেহ ও মন সহজেই সেটা করিতে পারে, করিতে চায়। অভ্যাস ভাল হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। মনের সদিচ্ছাকে সে সাহায্যও করিতে পারে, ব্যর্থও করিতে পারে। মাতাল প্রাণপণে সঙ্কল্প করিতেছে আর মদ ছুঁইবে না, কিন্তু অভ্যাসবশেই তাহার দেহ মদ চাহিতেছে, তাহার মন মদের কথা ভাবিতেছে। সেই অভ্যাসকে

জয় করার মত শক্তি তাহার মনের নাই। তাই অভ্যাস যদি খারাপ হয়, মনের সদিচ্ছা তাহাকে সকল সময় জয় করিতে পারে না। এই জন্তই সদভ্যাসের প্রয়োজন। এতখানি প্রয়োজন যে ইচ্ছাশক্তির, তাহার ব্যায়াম ও ব্যবহার সতর্ক হইয়াই করিতে হয়। ভালকাজ "কেন করিবে", ভাল ভাল বই "কেন পড়িবে," ইহা যে না বোঝে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তিই দুর্ব্বল; জীবনে তাহার বড় হইবার ভরসা কম। শুধু তাই নয়, খুব সম্ভবতঃ সে মন্দের দিকেই ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে; কারণ, একবার একটা মন্দ অভ্যাস বা প্রবৃত্তি তাহাকে যদি পাইয়া বসে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে জিতিতে পারিবে না। যুদ্ধ করার ইচ্ছাই তাহার আদৌ হইবে কিনা সন্দেহ। "যুদ্ধ কেন করিতে হইবে," সেইটাই ত সে বোঝে না। এবং সেটা যতক্ষণ কেহ না বোঝে ততক্ষণ তাহাকে নিজের ইচ্ছায় চলিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। বয়স তাহার হইয়া থাকিতে পারে, তবু বুদ্ধিতে সে শিশু। শিশুকে নিজের বুদ্ধিতে চলিবার স্বাধীনতা পিতামাতা তখনই দিতে পারেন, যখন সেই স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করার, ভালমন্দ চিনিয়া সৎসঙ্কল্প লইয়া চলিবার শিক্ষা এবং শক্তিও তাহার হইতেছে। তাহার আগে স্বাধীনতা দিলে তাহার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু শিশুকে ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার যদি শিখাইতেই হয়, সেই ইচ্ছাশক্তি তাহার মধ্যে গড়িয়া তুলিতেও ত হইবে। সেটা কিরূপে করা যায়?

এইখানেই শিশুর বাধ্যতার প্রয়োজন। ছোট শিশু নিজে ভালমন্দ বোঝে না; সে পিতামাতার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবে। তাহার অর্থ কিন্তু নির্ব্বিচারে, প্রতি পদে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পা ফেলিয়া চলা নয়। সেটা করিতে গেলে শিশু ক্রমে পরনির্ভর হইয়া পড়ে, তাহার নিজে চলিবার ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। তাহার চেয়েও বড় কথা,

সেইভাবে চলাতে শিশু নিজে নিজে কাজ করার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। সেই আনন্দ ও স্বাধীনতা হইতে তাহাকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইতেছে। এই ক্ষোভ সে ভুলিতে পারে না এবং সুযোগ পাইলেই সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অত্যন্ত কড়াকড়ির মধ্যে যে সকল শিশু বড় হয় তাহারা যে অনেক সময়েই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, তাহার কারণ এই। অতএব শিশুকে সেভাবে হাত পা বাঁধিয়া রাখা চলিবে না। তাহাকে তাহার পথের নির্দ্দেশ দিন, দিয়া তাহার নিজের বুদ্ধিতেই সে কাজটা করিবার, সেই পথে চলিবার স্বাধীনতা দিন। সে খুসী মনে কাজ করিবে, পথের বাধাবিঘ্ন যা আসিবে নিজেই জয় করিবে, কারণ তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন ; এবং সেই জয় করিতে গিয়াই সে শক্তি সঞ্চয় করিবে। অভিভাবক নির্দ্দেশ দিয়া আর তাহাকে সাহায্য করিবেন না, শুধু লক্ষ্য রাখিবেন সে ভুল না করে। সে সফল হইলে অভিনন্দন দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিবেন। তাহার জয়ের আনন্দ যেন সে উপভোগ করিতে পারে, তাহার শক্তি সম্বন্ধে যেন সে সচেতন হইতে পারে ; তবেই তাহার আত্মপ্রত্যয় আসিবে, সত্যকার শক্তি আসিবে।

ইহার পর তাহাকে শিখান, শুধু কাজ করার শক্তিই নয়, নিজেকে চালাইবার শক্তিও তাহার আছে ; নিজের মনকে শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও তাহার আছে। তাহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই সে ভাবিতে পারে, তাহার যেটা ভাবিতে ইচ্ছা নাই সেটা সে না ভাবিয়াও পারে। তাহার প্রবৃত্তি তাহার প্রভু নয় ; তাহার প্রবৃত্তির প্রভু সে নিজে, তাহার চিন্তারও প্রভু সে নিজে। তাহাকে চালাইয়া নিতে অন্য কাহারও উপদেশ দরকার হয় না। সে নিজেই বুঝিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে, করিয়া সেই কর্ত্তব্যের পথে নিজের বুদ্ধিকে, নিজের

ইচ্ছাকে, নিজের কার্য্যকে চালাইতে পারে। এই শক্তি, এই আত্মপ্রত্যয় যদি তাহার থাকে, তবে আর তাহার জন্য পিতামাতাকে চিন্তা করিতে হইবে না। সে বড় হইয়াছে, জীবনের পথে চলার শক্তি তাহার হইয়াছে। জীবনে চলিবার জন্য বুদ্ধি দরকার, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় দরকার ইচ্ছাশক্তির। বুদ্ধি না থাকিলেও পরের বুদ্ধি লওয়া যায়। বুদ্ধিতে একটু ন্যূন হইলেও ইচ্ছাশক্তির জোরে কাজ করিয়া যাওয়া যায়। ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও কাজ হইবে না, এবং সৎপথে থাকিবার শক্তির অভাবে হয়ত সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিই মারাত্মক বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই বুদ্ধিবৃত্তির চেয়েও বেশী দরকার ইচ্ছাশক্তির অভ্যাস করা এবং মনের বলকে বাড়াইয়া তোলা।

২। বিবেক

ইচ্ছা যদি চিত্তরাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা হয়, বিবেক তাহার আইন প্রণেতা। ইচ্ছাশক্তি বাহিরের ঘরে হুকুম দিয়া কাজ করায়; বিবেক থাকেন অন্তরের মণিকোঠায়। ইচ্ছা বলেন "ইহা কর", "ইহা করিও না"। কিন্তু যা করা হইবে, সেটা ঠিক হইল কি হইল না, তাহার বিচারক বিবেক। বিবেক বলিবে, ঠিক হইয়াছে বা ঠিক হয় নাই; বলিবে, ন্যায় করিয়াছ বা অন্যায় করিয়াছ। তাহার সেই বিচারের আর আপীল নাই।

ইচ্ছা যে সঙ্কল্প করে তাহার পিছনে যদি বিবেকের নির্দ্দেশ থাকে, তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সৎকাজ করা হইল। সেইণ্ট অগাষ্টিন্ বলিতেন, "সাফল্যের সিঁড়িতে চারিটি ধাপ,—আমি আছি, আমার উচিত, আমি পারি, আমি করিব। কথাগুলার অর্থ দেখা যাক্।"

আমি আছি:—নিজেকে জানিবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

পৃথিবীতে কেন আসিয়াছি, কি আমাদের কাজ, তাহার চেতনাও আমার আছে।

আমার উচিত :—আমাদের মধ্যেই একটা সদাজাগ্রত নৈতিক বুদ্ধি আছে। সে সর্ব্বদা বলিয়া দেয় কোন্‌টা আমাদের করা উচিত বা অনুচিত ; বলিয়া দেয়, কোন্‌টা আমাদের করা দরকার বা করা নিষেধ।

আমি পারি :—যেটা করা উচিত বলিয়া স্থির হইল, সেটা করিবার শক্তি আমার আছে।

আমি করিব :— অতএব সেই শক্তিকে কাজে লাগাইবার সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিলাম ; সেই সংকল্প আমাদের অন্তরে নিহিত শুভাশুভ-বোধেরই অঙ্গবিশেষ।

সুন্দর বিশ্লেষণ। সৎপথে থাকিবার এই শক্তি ও প্রবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই আছে। তবু তাহারা কেন ভুল করে, কেন বিপথে যায়, সেইটাই আশ্চর্য্য!

পাপের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কেন আছে বা কেন থাকে তাহা লইয়া আলোচনা আমি এখানে করিব না। সেটা যে আছে তাহা সকলেই জানেন। আমি শুধু বলিব, সেই প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই মানুষকে সৎপথে থাকা অভ্যাস করিতে হয়, সেজন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। অধঃপাতে যাইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিবার ও তার চরিত্রকে বলিষ্ঠ করিবার ভার পিতামাতার উপরে। যত জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, যত মানুষ অধঃপাতের পথে নামে, তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনেরই পতনের মূলে থাকে পিতামাতার অসতর্কতা বা উদাসীনতা। শিশুর মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি তাহার শুভবুদ্ধি ও সৎশক্তিকে ছাড়াইয়া বড় না হইতে পারে, সেদিকে তাহারা যথাসময়ে যথোচিত দৃষ্টি দেন নাই। তাহাদেরই কর্ত্তব্যচ্যুতির পাপে শিশু অমানুষ হইয়াছে।

এই পিতামাতারা ভগবানের দোহাই দেন, "ঈশ্বরই ত তাহাকে

ভাল করিতে পারিতেন।” অথচ এই দোহাই দেওয়া শুধু মূর্খতা নয়, ভণ্ডামি এবং অশিষ্টতাও বটে। ঈশ্বরের দয়া মানুষের উপরে আছে। যে মানুষ নিজের কর্ত্তব্য করে তাহাকে তিনি শক্তি দেন, সাহায্য করেন। তাই বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য না করিয়া যে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, তাহার ভাগের কাজও কি তিনি নিজে করিয়া দিতে আসিবেন? শিশুকে খাইতে দিব না, তবু সে ঈশ্বরের দয়ায় হৃষ্টপুষ্ট হইবে, এটা তো আমরা আশা করি না। তেমনি, তাহার সৎপ্রবৃত্তিকে জাগরিত করিব না, তাহাকে সুশিক্ষা দিব না, তবু ঈশ্বরই তাহার শক্তি জাগাইয়া দিবেন, এইটাই আশা করি কেন? বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও মানুষ আজীবন ভগ্নস্বাস্থ্য থাকে; হয়ত শিশুকালে পিতামাতা তাহার স্বাস্থ্যের তত্ত্ব নেন নাই। তেমনি বহুলোক আছে, যাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই। পিতামাতা তাহাদের মধ্যে সে শক্তি জন্মাইয়া দেন নাই। নিজে যখন বুঝিয়াছে তখন আর সময় নাই, নিজের চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করা আর সম্ভব হয় নাই। ইহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, তবু ইহারা ভাল হইতে পারিতেছে না, এই ক্ষেত্রে অপরাধ কাহার? পিতামাতার, না ঈশ্বরের?

পিতামাতা বলেন,—কেন, শিশুর নিজের মধ্যেই তো বিবেক রহিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই পারে। যেন একটা পূর্ণপরিণত বিবেক লইয়াই মানুষ জন্মায়! কিংবা যেন বিবেক চুল-দাড়ির মতই একটা দৈহিক বস্তু, বয়স ও দেহ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই বাড়িয়া চলে; তাহাকে বাড়াইবার জন্য তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কিছু দরকার নাই। ইঁহারা ধরিয়া নেন, “বিবেক” অভ্রান্ত—তা সে শিশুর বিবেকই হউক, আর বয়স্কেরই হউক। “বিবেক”—তাহার আর ভুল হয় কি করিয়া? অথচ দিনের পর দিন চোখের সামনে

দেখা যাইতেছে, সকল সময় তথাকথিত "বিবেক" মানুষকে সংযত করিতে পারে না; তবু এই ভ্রান্তি ঘুচিতে চায় না। এই কথাটাই ইঁহারা ভুলিয়া যান যে বিবেক থাকে মনের গহন-নিভৃতে; কথায় কেন, চিন্তায়ও সে ধরা-ছোঁয়া দেয় না। আমরা যেটা টের পাই সেটা "বিবেক" নহে, চিন্তা। তাহার কতখানি সত্যই বিবেকের কথা, আর কতখানি প্রবৃত্তির তাড়না, তাহা কে স্থির করিয়া বলিবে?

আর বিবেকের কাজ যদি হয় ন্যায়-অন্যায় বিচার করা, তবে তো তাহাকেও বিচক্ষণ শিক্ষক ও বিচারক হিসাবেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিবেক জন্মায় না, বিবেকও গড়িয়া উঠে। তাহাকেও জাগাইয়া তুলিতে হয়, ক্রমশঃ সুতীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে হয়।

অবশ্য ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের একটা মোটামুটি জ্ঞান লইয়াই মানুষ জন্মায়। "বুদ্ধি" বিকশিত হইবার আগেই ন্যায়-অন্যায়ের চেতনা জাগে। দু'মাসের শিশুর দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে চাহিলে সে চক্ষু নামাইয়া নেয়, মুখ নীচু করে। তবুও সেই বিবেককে সে চেনে না; মনে করে, তাহার মনে যে কথাটা আপনা হইতে উঠিতেছে তাহাই তাহার বিবেকের কথা। "ভাল" ও "মন্দের" জ্ঞান লইয়া সে জন্মায়, আমরা বলিয়াছি। ইহার অর্থ, ভালটাকে শ্রদ্ধা করিবার ও মন্দটাকে অপছন্দ করিবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি তাহার থাকে। কিন্তু কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহার বিচার-বোধ ত সহজাত নয়। বস্তু চিনিবার আগে সেটা ভাল কি মন্দ সে কেমন করিয়া জানিবে? বস্তু চিনিবে সে বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে। ভালমন্দের বিচারও করিতে পারিবে তখনই, তাহার আগে নয়। সেই জ্ঞান যতদিন না আসিল, "সহজাত" বিবেক তাহাকে সামলাইয়া রাখিবে কি করিয়া? শিশুর বিবেক তাহার "সর্ব্বময় প্রভু" নয়, সে একটা অপরিণত শক্তি মাত্র; সেই শক্তিকে

পরিণত, সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। সেটা করিতে হয় শিক্ষা দিয়া। শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে বিবেক-বুদ্ধি কি রকম দাঁড়াইবে। কুশিক্ষার দ্বারা মানুষের বিবেককেও বিকৃত করিয়া দেওয়া যায়। সে 'কর্ত্তব্য' হিসাবেই ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের হত্যা করিয়া বেড়াইতে পারে, কিংবা "ধর্ম্মের" নামে সামান্য কারণে রক্ত-স্রোতও বহাইতে পারে। আবার সুশিক্ষার বলে এমন বিবেকশালী মানুষ তৈরী করা যায়, যিনি ঈশ্বরের নামও উচ্চারণ না করিয়া কিংবা তাহার কাছে কোন রকমের শক্তি বা সাহায্য না লইয়াও চিরকাল সৎপথে থাকিয়া, সৎকাজ করিয়া যাইতে পারেন। ক্ষমতা মানুষের মধ্যে যদি থাকেও, সাধনা দ্বারা তাহাকে জাগরিত করিয়া, উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই না সেই ক্ষমতা সত্যকার কাজে আসিবে। এইখানেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, তাহার সার্থকতা।

বিবেক-বুদ্ধি জাগে জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে। অজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি একত্র থাকিতে পারে না। অজ্ঞতা যেখানে বিচারবুদ্ধিকে ছাড়াইয়া উঠে আমরা তাহাকে বলি কুসংস্কার। সুসংস্কার আসে জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে। সৎপথে চলিয়াই তাহাকে চিনিতে হয়। প্রবৃত্তি ও বাসনারা কোলাহল করিয়া বলে, "ইহা চাই", "উহা করিব"। বিবেক সকলের উর্দ্ধে বসিয়া ধীরে সুস্থে তাহাদের সেই প্রার্থনা ও আবেদনকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিয়া দেখে। তাহার নিজের কোন মতামত নাই, পক্ষপাতিত্ব নাই; ন্যায়-অন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই সে দর ঠিক করে। করিয়া বলিয়া দেয়, এইটা করিতে পার, এইটা করিও না। "ইচ্ছা" সেই নির্দ্দেশ মানিয়া চলে। প্রবৃত্তিকে ঘাড় ধরিয়া সেই পথে লইয়া চলে। যাহার ইচ্ছার এই শক্তিটুকু আছে, সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া যাহার সকল ইচ্ছা সকল প্রচেষ্টা চলে, তিনিই যথার্থ "বিবেকী মানুষ"। তাঁহার কর্ত্তব্য পালন ও

ন্যায়-নিষ্ঠার উপরে আমরা ভরসা করিতে পারি। কিন্তু বিবেক ও ইচ্ছাকে এইভাবে সবল, সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাধনা লাগে। সেজন্য সময়ের প্রয়োজন। যতদিন সেটা না হয় ততদিন মানুষ কি করিবে? অন্য যাহার মধ্যে সেই জ্ঞান ও শক্তি আছে, তাঁহার যুক্তি ও নির্দেশ লইয়া চলিবে। এই জন্যই শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি শুধু কাছে থাকিলেও তাহার মস্ত লাভ—নিজের বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য স্থির করিতেও সে আশ্বস্ত থাকে, উপদেষ্টা পাশেই রহিয়াছেন। প্রয়োজন হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই আশ্বাস তাহার আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়; তাহাকে সবল করে। এই জন্যই শিশুকে যথাসাধ্য সুশিক্ষা দিতে হইবে। যাহা কিছু ভাল তাহাই সে অভ্যাস করিবে, এইভাবেই ধীরে ধীরে তাহার বিবেক গড়িয়া উঠিবে। সুশিক্ষায় গঠিত বিবেক প্রায়ই ভুল করে না। অবশ্য সেই বিবেক গড়িয়া উঠিতে সময় লাগে। যতদিন সেই বুদ্ধি সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ভুলভ্রান্তি তাহার হইবেই। তবুও শেষপর্য্যন্ত সে নির্ভয় হইয়া নিজের ভার নিজে লইতে পারিবে। ভাল যাহা তাহা করিব, মন্দ যাহা তাহা করিব না, এই বোধ শিশুর মনে আপনা হইতেই থাকে। শিক্ষার কাজ কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা চিনিবার মত চক্ষু জন্মাইয়া দেওয়া, এবং তারপর করার বা না-করার সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করিবার মত মনের বল জন্মাইয়া দেওয়া। এইখানেই অনেক অভিভাবক মুস্কিলে পড়েন। যে কোনও বস্তু কেন ভাল কেন মন্দ ইহা না জানিয়া শিশু নিরস্ত হইতে চায় না। হাজার রকমের সম্ভব ও অসম্ভব প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। অথচ তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবও নয়। তাহা দিতে হইলে হয়ত এমন সব কথা তাহাকে জানাইতে হয়, যাহা জানিবার বয়স তাহার হয় নাই। সে জ্ঞান তাহার এই অপরিণত মনে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ তাহারও দোষ নাই। কোন্‌টা জিজ্ঞাসা

করা বা আলোচনা করা চলে, কোন্‌টা চলে না, সে বোধ হয় বুদ্ধি থাকিলে। সে বুদ্ধি তাহার হয় নাই। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহাকে অভিভাবকের বিচার বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিতে শেখানো। বড় হইলে অবশ্য কারণটা বুঝাইয়া দিবেন; কিন্তু বড় হইলে, তার আগে নয়। ইতিমধ্যে অভিভাবকের উপরে আস্থা রাখিয়াই সে চলুক। বিশেষ কোন একটা জ্ঞান না দিয়াও কাজের কথাটা কি ভাবে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া যায় তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত "বাইবেল"। শিশু যোসেফের কাহিনী শোনে; তাহার মধ্যকার অশ্লীলতাটুকু গ্রন্থকার এমন কৌশলে বাদ দিয়া গিয়াছেন যে সেইদিকে তাহার চক্ষুই পড়ে না। অন্যায় ও ন্যায় বলিতে কি বুঝানো হইতেছে সে প্রশ্ন না তুলিয়াই সে গল্পটা বুঝিয়া যাইতে পারে। কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মন কাজ লইয়া আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে, তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে শেখে। প্রথমে সে এই বিচার করে কাজের ফল দিয়া। এই কাজটার ফল ভাল হইয়াছে, অতএব এটা ভাল কাজ; ওটার ফল ভাল হয় নাই, অতএব ওটা করাও উচিত হয় নাই। ইহার পর তাহার বিচারবুদ্ধি আরও একটু বাড়ে। তখন ফলের দিকে না চাহিয়াই সে ভালমন্দের তফাৎ করিতে শেখে; বলিতে পারে, এই কাজটা ভাল অতএব করা উচিত, ওটা মন্দ কাজ, অতএব করা উচিত নয়, তারপর ফলাফল যাই কেন হউক না। ফলের পরোয়া না করিয়া শুধু কাজের স্বরূপ দিয়াই তাহার দোষগুণ বিচার করিতে যে শিখিল, তাহার শিক্ষার আর বাকী রহিল কি? একটা ব্যাপারে কিন্তু সাবধান হইবেন। শিশুকে কোন সত্যকার মানুষের কাজের বিচার করিতে দিবেন না। কোন একটা কাজ ভাল কি মন্দ সে বিচার সে করুক এবং সেই বিচার অনুসারে চলুক। কিন্তু কোন একটা বিশেষ ব্যক্তি ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, ভাল লোক কি মন্দ লোক, এই সমালোচনা করিতে যেন সে উৎসাহ না পায়।

ইহাতে তাহার মন দম্ভে ভরিবে, সে পরচর্চ্চাশীল হইবে। তাহাকে এই কথাটা মনে রাখিতে শিখাইবেন, "অপরের ত্রুটি ধরিও না, তোমার মধ্যেও ত্রুটি আছে। অপরের দোষ ধরাটাই তোমার মধ্যে একটা দোষ।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে :—অপরের সমালোচনা শিশু না-ই করিল। কিন্তু তাহার নিজের সমালোচনা? সেটাও কি করিবে না? করিবে, কিন্তু সর্ব্বত্র নয়। তাহার কাজের তাহার কথার সমালোচনা তাহাকে শুনাইবেন। তাহার উদ্দেশ্যের সমালোচনা শুনাইবেন না। তাহার অন্যায় আচরণের 'উদ্দেশ্য' বলিয়া আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, হয়ত তাহা তাহার চেতনায়ই আসে নাই। খোঁচাখুচি করিতে গেলে তাহাকে খানিকটা বিশ্রী জিনিষ জানাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার মনকে কিছুটা বিষাইয়া তোলা হইবে মাত্র। যে মতলব ছিল না সেই মতলবের অভিযোগ কেহ করিলে মন বিষাক্ত হইবে না কেন? আসল কথাটা হইতেছে, শিশুরা অনেক কাজই না ভাবিয়া করে। আমরা তাহার কাজের মধ্যে যে মতলব ও যে দুষ্টবুদ্ধির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হই, সে বস্তু হয়ত তাহার মনেই নাই। কিছু না ভাবিয়া সে মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে; জানেই না যে এটা অন্যায় হইতেছে। কোন্‌টা করা চলে, কোন্‌টা চলে না, তাহার মধ্যকার রেখা অনেক সময় এমন সূক্ষ্ম যে, শিশু তাহা ঠাহরই পায় না। মা'র জিনিস নিলে দোষ নাই; কাকীমার জিনিস কেন নেওয়া যাইবে না? এই হইল তাহার যুক্তি। এখানে সে ভয়ঙ্কর পাপ একটা করিয়াছে বলিয়া চেঁচামেচি করিয়া তাহার মনটাতে অযথা একটা ধাক্কা লাগানো উচিত নয়। সেই ধাক্কার গ্লানি সে সহজে কাটাইতে পারে না। একটি বারো বছরের শিশুকে দেখিয়াছিলাম, স্বাস্থ্যভাঙ্গা, মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু তখনও দুশ্চিন্তা ও অনুতাপে তাহার মন ভরা। তাহার গ্লানির কারণ, সে "যে পাপের ক্ষমা নাই সেই মহাপাপ" করিয়াছে। কোথায় সে

কথাটা শিখিল জানি না। পাপটা কি ? না, প্রার্থনা করার সময় জানু পাতিয়া বসে নাই। এই গ্লানিতে, মহাপাপ করিয়াছে এই ক্ষোভে, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, প্রাণ যাইতে বসিয়াছে। অথচ ইহার জন্ত দায়ী কে ? শিশুকে বকুনি দিবার সময় আমরা ধরিয়া নিই, তাহার জ্ঞান ও বিবেক আমাদের সমানই পরিণত। (যদি সেটা আমাদের পরিণত জ্ঞানের ও বিবেকের পরিচয় হয়।) তাহাকে এমন কথা শোনাই যাহার অর্থই সে বোঝে না, যাহার ভার সে বহিতে পারে না। বকুনি দিয়া বিবেক জাগানো যায় না। জাগাইতে হয় সৎপ্রবৃত্তির অভ্যাস করাইয়া। এইরূপ একটি চমৎকার সৎপ্রবৃত্তি দয়া। শিশুকে দয়া করিতে শিখান, সাহায্য দিতে শিখান, অন্তের কষ্টে ব্যথিত হইতে শিখান। মায়ের কাছে এই শিক্ষা সে সহজেই পাইতে পারে। অভ্যাসের দ্বারা তাহার বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ভদ্র হও, সরল হও, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অপরাধীকে ক্ষমা কর, সত্যবাদী হও, এই ক'টা উপদেশ যদি সে মানিয়া চলিতে পারে তবেই তাহার বিবেকের জাগরণ অনেকখানি সম্পন্ন হইয়া যায়। সে সদ্‌গুণের আচরণ করুক, মা তাহার উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে শিখাইয়া দিন নিজের শুভবুদ্ধিকে কি করিয়া চিনিতে হয়। বিবেকের নির্দ্দেশ তাহার মনের মধ্যেই জাগিতেছে, সেই নির্দ্দেশ শুনিতে সে শিখুক। তারপর আর তাহার ভয় নাই। তাহার সেই শিক্ষিত বিবেক ভুল নির্দ্দেশ দিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এটা কি রকম কথা ? পূর্ব্বে না বলিয়া আসিলাম, বিবেক অভ্রান্ত নয়, কারণ তাহার মধ্যে প্রবৃত্তির খেলা কতটুকু তাহা বাছিয়া বাহির করা যায় না। উত্তর হইল— "শিক্ষিত বিবেক অভ্রান্ত, কারণ তাহার উপরে স্বয়ং ঈশ্বরের করুণাময় চক্ষু স্তব্ধ রহিয়াছে ; সেই বিবেকের মুখে তাঁহার আদেশই ধ্বনিত হইতেছে।"

৩। অমৃত-আত্মা ও ঈশ্বর-চেতনা

এতক্ষণ যাহা কিছু লইয়া কথা বলিলাম— অভ্যাস, অনুভূতি, যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক—ইহারাই মানুষের শেষ কথা নয়। ইহারা পরস্পরের সহিত একত্রে কাজ করিয়া চলে। কাহার দিকে, কি উদ্দেশ্যে? ইহাদেরও তলায়, ইহাদের চেয়েও নিগূঢ় একজন বসিয়া আছে,—শিশুর, মানুষের অন্তঃস্থলে তাহার বাস; সে তাহার আত্মা। আত্মা মানুষের মধ্যেকার রাজা। তাহারই জন্য মানুষের যত বাহিরের আয়োজন, উপচার। আত্মা মানুষের পুরোহিত। মানুষ ও ভগবানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে এই দুয়ের দেখা করাইয়া, মিলন ঘটাইয়া দেয়। বিবেক মনের মধ্যে থাকে। কিন্তু সেই বিবেকেরও পিছনে বসিয়া তাহাকে কথা বলায় এই আত্মা। তাহারও কামরার চাবি পিতামাতার হাতে, তাহাকেও উদ্বুদ্ধ করিতে, স্ব আসনে স্থাপিত করিতে পারেন তাঁহারাই। আমরা কথায় বলি, আত্মা চির-জীবন্ত; ধরিয়া নিই, আত্মা সকল সময়েই পূর্ণ-জাগ্রত, পূর্ণ-কায়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মা সম্বন্ধে যে সব কথা আছে তাহা তলাইয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে। এমন একজন মানুষকে যদি কল্পনা করিতে চাই যাহার আত্মা নাই, সে কল্পনা করিতেই পারিব না। আত্মা ছাড়া মানুষ হয় না। তাহার বুদ্ধি থাকিতে পারে; কল্পনাশক্তি থাকিতে পারে; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা, সকলই থাকিতে পারে; তবু সে মানুষ নয়। আত্মার কাজ যা সেইটাই তাহার মধ্যে দেখা যায় না।

আত্মার কাজ কি? যে কাজ দেখা না গেলে আত্মা আত্মাপদবাচ্য হয় না, মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না, সেই কাজটা কি? অগাষ্টিনের ভাষায় বলি, "মানুষের আত্মা ঈশ্বরকে খোঁজেন, যেমন ঈশ্বর খোঁজেন

আত্মাকে”। আত্মার সকল চেতনা, সকল চেষ্টা, ঈশ্বরের অভিমুখে ছুটিয়া চলে। তাহার একটিমাত্র কামনা ঈশ্বর, একটি মাত্র প্রাণ ঈশ্বর, একটি মাত্র ইচ্ছা ঈশ্বর, একটি মাত্র আনন্দ সেই ঈশ্বরে মিশিয়া যাওয়া। সে বলে, “সেই একখানা মুখকেই সম্মুখে দেখিতে চাই— তাঁহার হাসি, তাঁহার করুণা, কখনও ম্লান হয় না।” আত্মার সমস্ত চেতনা, সমস্ত গতি, ঈশ্বরের দিকে। তাঁহার প্রতিক্রিয়াটা শুধু মানুষের উপরে আসিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে; ঈশ্বরের দিকে ছুটিবার সময় সে মানুষকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। ঈশ্বরই আত্মার জীবন; আর কোন জীবন, কোন চেতনা তাহার নাই। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে; আত্মারও ক্ষুধা আছে, সে ঈশ্বরকে পাইতে চায়। খাদ্য-পানীয় না পাইলে দেহ শুকাইয়া যায়; খাদ্য না পাইলে আত্মাও নিষ্প্রাণ, নির্জীব হইয়া পড়ে, নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। একেবারে মরিয়া হয়ত সে যায় না, কারণ সে অমর; অমৃতময় ঈশ্বরের অংশ লইয়া সে গঠিত। আবার খাদ্য পাইবামাত্র সে পূর্ণ উৎসাহে, পূর্ণস্বাস্থ্যে দ্যুতিমান হইয়া উঠে। সেই খাদ্য ঈশ্বরের স্পর্শ, তাহার করুণাময় আলোক-ধারা। কখনও সেই জাগরণ আসে অতর্কিত বন্যার মত, যখন ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে অচেতন বুদ্ধি সহসা জ্ঞানের আলোক পাইয়া সচেতন হইয়া উঠে। কখনও বা সেই জাগরণ আসে ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, স্বাভাবিক গতিতে; পাপড়ির পর পাপড়ি মেলিয়া আত্মার শতদল অমলহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠে। সে অপরূপ সূর্য্যালোক তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছে তাহারই রশ্মি সে নিজের বক্ষে প্রতিফলিত করিয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। যে অনির্বচনীয় আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ এবং প্লাবিত হইতেছে তাহারই খানিকটা সে সৌরভের ছদ্মবেশে জগতের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। আমার এই জীবন, ইহা কি? ইহা

কি আগুনের শিখা, একটি প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপে যাইবার মত; ঈশ্বরের অঙ্গ হইতে আত্মার অঙ্গে আসে, তাহাকে উত্তাসিত করিয়া তোলে? হয়ত তাই, কিন্তু তবুও মাত্র ততটুকু নয়। জীবন তাহার চেয়েও নিগূঢ়, তাহার চেয়েও অবর্ণনীয়। "আমিই জীবন"; "আমার মধ্যে বাস কর, আমি তোমার মধ্যে বাস করিব।" এই সত্যকে ঈশ্বরের নিজের ভাষার চেয়ে আর সরল সহজ করিয়া বলা যায় না। জীবন নিজের জায়গায় নিজে একাকী থাকে না। সে যেখানে থাকে সেইটাই ঈশ্বরের মন্দির হইয়া উঠে। ঈশ্বর ও জীবন অভিন্ন। ঈশ্বরেরই অংশ লইয়া জীবন গঠিত হয়। জীবনের রূপে ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বর ও আত্মার এই-ই মহৎরূপ, ইহার সম্বন্ধে শিশুকে সচেতন করিতে হইবে। কিন্তু ক'জন পিতামাতা ইহা লইয়া চিন্তা করেন, চেষ্টা করেন? সেই চেষ্টা করিবেন কিনা সেটা স্থির করা তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। এটা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, না করিলে তাহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন। আর মানুষের জীবনের যেটা শেষ কথা সেইটাই যদি শিশুকে তাহারা না জানান, তবে তাহাকে দেহচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, বুদ্ধিচর্চ্চা করাইতে যত পরিশ্রমই করিয়া থাকুন, সমস্ত বৃথা হইবে। সত্যের আলোক না পাইলে সেই বিদ্যা ও শক্তি শিশুর কোন কাজেই আসিবে না। যদি সে অন্য কোথাও হইতে সত্যের সন্ধান পাইয়া যায়, তবে তখন সেই বিদ্যা তাহার সাহায্য করিবে, এইমাত্র। কি করিয়া শিশুকে ইহা শিখানো যায়, ভাবিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই। শিখানো অতি সহজ। ঈশ্বর নিজেই এখানে সাহায্য করিবেন। তাঁহার মহিমাটা, ক্ষমতাটা, শুধু শিশুকে জানাইয়া দিন। একটা মৌমাছি একটা বড় গাছ বানাইতে পারে, একথা কেহ বিশ্বাস করে? অথচ তাইত হয়। মৌমাছি ফুলে বসে, আবার উড়িয়া যায়; ফুলের কিছু

পরাগ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে। আবার আরেকটা ফুলে বসে, সেই পরাগ সেখানে ঝরিয়া পড়ে; পড়ে ফুলের গর্ভকেশর বা ডাঁটার আগায়। ডাঁটার গোড়ায় ফুলের গর্ভাধার; সূক্ষ্ম কেশর বাড়াইয়া সেই পরাগকে নিজের মধ্যে টানিয়া নেয়। ফুলে ফল ধরে, সেই ফল হইতে গাছ হয়। কাহিনীটা শিশুকে বুঝান; ঈশ্বরের শক্তি ও ব্যবস্থার পরিচয় পাইয়া সে মুগ্ধ হইবে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কাহিনীটা আপনি মনে রাখুন। ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের মহিমা, সেই ত পরাগ; শিশু হইল ফুল; আপনি মৌমাছি মাত্র। আপনি সেই পরাগ শিশুর কান পর্য্যন্ত, মন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন, তাহাই যথেষ্ট। সেই পরাগকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইবার মত আগ্রহের কেশর শিশুর নিজের মধ্যেই আছে। সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। নিজে হইতেই তাহাকে আয়ত্ত করিয়া সে ফলবান হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই পরাগসিঞ্চনে ভুল করিলে চলিবে না। ভুল জায়গায় ফেলিলে সেটা ব্যর্থ হইবে; ধূলাবালি মিশাইলে শিশু শুধু ব্যথিত হইবে। ঈশ্বর রক্তচক্ষু হেড্মাষ্টার নন; "ঈশ্বর শুধু নিতেই চান, দিতে চান না", একথা সত্য নয়। অথচ পিতামাতারা অনেক সময় এইরূপেই ঈশ্বরকে শিশুর কাছে চিত্রিত করেন। নার্স বলে, "দুষ্টছেলে! ঈশ্বর তোমায় ভালবাসবেন না। তোমাকে খারাপ জায়গায় পাঠিয়ে দিবেন।" চমৎকার। যেন ঈশ্বর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু। ঈশ্বর ভালবাসেন না, শুধু শাস্তিই দেন, এই ধারণা যদি আমরাই শিশুর মনে জন্মাই তবে তাঁহার স্বরূপ সে চিনিবে কোথা হইতে? তাঁহার "চিরক্ষমাশীল কোমলতা"র পরিচয় সে পাইবে কোথায়? ঈশ্বর সম্বন্ধে এই রকমের আরও অনেক বাজে কথাই বড়দের মুখে শিশুরা শোনে। এই সম্বন্ধে মা সাবধান হইবেন। যখন তখন বাজে কথার মধ্যে ঈশ্বরের নাম যেন শিশুকে শোনান না হয়। সে নাম সে মায়ের

মুখে বাবার মুখেই শুনিবে। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহার পাওয়া দরকার তাহাদের মুখেই পাইবে। যেখান সেখান হইতে তাঁহার বিকৃত পরিচয় কুড়াইয়া লইবে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা নিজেরা যতটুকু জানি শুধু সেইটুকুই যেন শিশুদের শেখাই। বুদ্ধি দিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা খাড়া করিতে পারি তাহা নয়; প্রাণের মধ্যে তাহার যে করুণাময় রূপ অনুভব করি, সেইটুকুই যেন শিশুকে চিনাইয়া দিই, তাহাই যথেষ্ট। শিশু যেটুকু বুঝিবে সেইটুকুই তাহাকে বুঝাইবেন। শিশুকে গ্রহণ করিতে হয় তাহার নিজের মন দিয়া এবং সে মন অতি কোমল ও অপরিণত, এই কথাটা যেন মনে থাকে। ঈশ্বরের কাছে শোকে সান্ত্বনা পাই, বড়দের কাছে এইটাই তাঁহার বড় পরিচয়। শিশুর কাছে এটার মূল্য নাই, কারণ শোক কি তাই সে জানে না। তার চেয়ে বরং তাহাকে বলুন, ঈশ্বর আনন্দময়। ইহা সে বুঝিবে এবং ঐ একটা কথা দিয়েই সে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে শিখিবে। আনন্দ সে বোঝে, ভালবাসে; তাই আনন্দময়কেও ভালবাসিবে। ঈশ্বরকে চিনাইবার সঙ্গে "নীতিশাস্ত্র" জড়াইয়া দিবেন না। "ভাল" আর "মন্দ" সে যা চেনার চিনিবে; ঈশ্বরকে সে উহার ঊর্ধ্বে রাখিয়াই চিনুক। ঈশ্বরের জ্ঞান ও নীতিজ্ঞান শেষে অনেকক্ষেত্রেই একত্র মিশিয়া যায়; কিন্তু শিশুর মনে যখন মেশা দরকার হইবে তখন সে নিজেই মিশাইয়া লইবে, সেজন্য আপনার তাড়াতাড়ি করার দরকার নাই। ঈশ্বর শুধুই ঈশ্বর; "ভালর পুরস্কার ও মন্দের শাস্তি" তিনি হয়ত দিতে পারেন, কিন্তু তাহা যদি তিনি না-ও হন তবুও তিনি ঈশ্বর। সত্যই তিনি সেই বিচারক কিনা, সে তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন শিশুর নাই, সে বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপাইবেন না।

শিশুকে ঈশ্বরের কথা কখন কিভাবে শোনাইতে হইবে এই লইয়া মায়েরা অনেক সময় চিন্তায় পড়েন। তাহাদের প্রতি আমার নিবেদন, যত কম এবং যত কাজের কথায় উপদেশ দিতে পারেন ততই ভাল। [illegible]

কথায় ও সারাক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলে সেটার গুরুত্ব কমিয়া যায়। একেবারেই কথা না বলিলেও ক্ষতি নাই— কাজের মধ্য দিয়াই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়াই, তাহার চেতনা জাগাইতে পারেন। ঈশ্বরের মহিমা ফুলের গন্ধের মত, আপনি আসিয়া নাকে লাগে, চিনাইয়া দিতে হয় না। নাসিকার ঘ্রাণশক্তিটুকু বাড়াইয়া দিতে হইবে। বক্তৃতা দিলে শিশু ভয় পাইবে।

জননী ও শিশু যখন একত্র থাকেন তখন মধ্যে মধ্যে উভয়েরই অনুভূত এমন এক-একটি শুভ মুহূর্ত্ত আসে যে মুহূর্ত্তটি ভগবান সম্বন্ধে শান্ত এবং গভীরভাবে অনুভূত কথা বলিবার সময়। বেশী কথা বলিবার দরকার নাই— পীড়াপীড়ি করিয়া উপদেশ ত নয়ই; শুধু প্রতীতির চকিত বিচ্ছুরণ, যখন মায়ের অন্তরাত্মা হইতে শিশুর অন্তরাত্মায় প্রত্যয়ের স্ফুরণ মাত্র সংক্রামিত করিয়া দিতে হয়। ইহাই হইল শিশুর অন্তরাত্মায় "পিতা নোঽসি" এই স্তবের স্থাপনা। সম্ভবতঃ এরপর সহস্রবার পরম পিতার প্রেমের প্রকাশে সঙ্গে মা ও শিশুর মধ্যে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়ের বেশী আর কিছু হইবে না, কিন্তু ভাবটি বাড়িতে থাকিবে এবং শিশুর আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। ইহাই সব; ইহার উপরে আধ্যাত্মিক শিক্ষার আর কোনও গতানুগতিক নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন, তাহাতে বরং অনেক সময়ে পূতজীবনের বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। কিন্তু কেবল এইরূপ অনুভূতির সাহায্যে অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বদাই হৃদয়ে আকুল আবেগ রাখিতে হয়, এবং শিশু যাহা বিশ্বাসে মহীয়ান্ হইয়া গড়িয়া উঠে তার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়া চলিতে হয়। বলা বাহুল্য মাত্র যে, "এরূপটি আসে শুধু প্রার্থনার ফলে"। মা অকুণ্ঠিতভাবে ইহা হইতে জ্ঞান লাভ করেন, এবং এ-মাত্র তিনিই এই দৈবী কার্য্যের উপযুক্ত।

সমাপ্ত